গল্পভুবন

গ ল্প ভু ব ন

আবদুর রউফ চৌধুরী

উৎস প্রকাশন ॥ ঢাকা

উৎসর্গ
শিরীণ চৌধুরী-কে

ফেব্রুয়ারি ২০১১
© বাসিত চৌধুরী, পারভীন চৌধুরী ও ড. হাসনীন চৌধুরী

প্রকাশক
মোস্তফা সেলিম
উৎস প্রকাশন
১২৭ আজিজ সুপার মার্কেট (৩য় তলা) শাহবাগ, ঢাকা ১০০০
ফোন : + ৮৮-০২-৯৬৭ ৬০২৫
email : utsopro@yahoo.com

প্রচ্ছদ
সব্যসাচী হাজরা

মুদ্রণ
সানজানা প্রিন্টার্স, নয়াপল্টন, ঢাকা

মূল্য
দুশ' টাকা ◆ সাত মার্কিন ডলার ◆ পাঁচ পাউন্ড

Galpabhuban by Abdur Rouf Choudhury
Published by Mustafa Salim
Utso Prokashan 127 Aziz Super Market 2nd flr. Shahbag Dhaka 1000
Phone : + 88›02›9676025
Price TK 200/US $ 7 ◆ £ 5

ISBN : 984-70183-0275-7

আবদুর রউফ চৌধুরী'র 'গল্পভুবন' শব্দের গাঁথনীতে কথামালা

সৃজনশীলতাকে ধারণ করেও কোনো কোনো গল্পকার মননশীলতার প্রয়োগ করেন। এরকম এক গল্পকারের নাম আবদুর রউফ চৌধুরী। প্রচলিত বা জনপ্রিয় ধারার তথাকথিত লেখক হয়তো নন, কিন্তু সাহিত্যের মূল সুর থেকে তিনি বিচ্যুত হননি। তাঁর 'গল্পভুবন' পাঠ করে আমাদের এই ধারণার জন্ম দিয়েছে।

আবদুর রউফ চৌধুরীর গল্পের ভুবনে প্রবেশ করতে গেলে প্রথমে চোখ ধাঁধিয়ে দেয় তার ভাষা। ভাষা বুনট সুন্দর কিন্তু নিশ্চিদ্র, জটিল কিন্তু বোধ্য। তাই ঢোকার পথে একটু দ্বিধা তৈরি হলেও হতে পারে কিন্তু একবার ঢুকে গেলে আর কোনো খানা-খন্দ পথ আটকাতে পারে না।

'গল্পভুবন'-এর প্রথম গল্পটির নাম 'রানী'। গল্পের প্রেক্ষাপটে রয়েছে করাচি শহর। মধ্যবিত্ত কীভাবে বদলে যায় কীভাবে বদলাতে চায়, তারই প্রতীকী বিবরণ আছে গল্পটিতে। কিন্তু গার্হস্থ্য জীবনের কথা বলার ফাঁকেই গল্পকার বলে ফেলেন তৎকালীন পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি—'এক বাঙালি ও এক পাঞ্জাবির মধ্যে মারামারি, কিলঘুষি খুব হয়েছে। দুজনই এয়ারম্যান, তবুও সিভিলিয়ান পুলিশ তাদের গ্রেফতার করে নিয়ে গেছে।' বদলে যাওয়ার সংবাদটিও গল্পকার পাঠকের কাছে গোপন করেন না—

> [...] এসব নতুন নতুন গজিয়ে উঠা সর্বগ্রাসী কংক্রিটের বাড়িঘরের জন্য এই শান্ত প্রান্তরটি দিন দিন বদলে যাচ্ছে, এরইসঙ্গে বদলে যাচ্ছে এ-অঞ্চলের অধিবাসীদের পরিচয়টুকুও। আবির্ভাব ঘটছে পাঞ্জাবি, গুজরাতি, পুস্তির। বৃদ্ধি পাচ্ছে গাড়ির, জ্যামের, দূষণের; একইসঙ্গে সুন্দরীর ও অন্যের স্বামীকে ভাগিয়ে নেওয়ার রঙ-বেরঙের পন্থাগুলোর। [রানী]

'জিন' গল্পটি অসাধারণ। দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও কুসংস্কারের শিকার সাধারণ মানুষ কীভাবে ধর্ম ব্যবসায়ীদের হাতে জিম্মি হয়ে ইজ্জত হারায়, তারই বিশ্বস্ত রূপায়ন ঘটেছে এই গল্পে। এ ধরনের গল্প বাংলাসাহিত্যে আরো আছে। এই অতি পরিচিত বক্তব্যও আবদুর রউফ চৌধুরী ভিন্ন আঙ্গিকে, ভিন্ন প্রেক্ষাপটে চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছেন। জিন তাড়ানোর নামে নারী ধর্ষণের অপকৌশল লেখক উদ্‌ঘাটন করেছেন সংস্কারমুক্ত হৃদয় দিয়ে। ধর্মকে আঘাত না করেই লেখক ধর্মের ধ্বজাকারী মোল্লাজির বিরুদ্ধে বলেছেন। জিন তাড়ানোর গোটা দৃশ্য এত সূক্ষ্মভাবে উপস্থাপন করেছেন যে, পাঠকের অনুভূতিকে নাড়া না দিয়ে পারে না। ধর্ষণপূর্ব আয়োজন কিংবা ধর্ষণের দৃশ্যের বর্ণনাও দিতে লেখক কুণ্ঠিত হননি। তবে তৎসমবহুল শব্দের কারণে তেমন অশ্লীল মনে হয়নি। যে ভাষার জন্য আবদুর রউফ চৌধুরীর গল্পকে দুর্বোধ্য বলে মনে হতে পারে, সেই ভাষাই তাকে রক্ষা করেছে। তবে ভণ্ড মোল্লার চরিত্র অংকনে গল্পকারের মুন্সিয়ানা অস্বীকার করার উপায় নেই। 'জিনে ভর-করা'

আমেনাকে ধর্ষণ করে বিছানায় ফেলে রাখার পর আমেনার স্বামী সিদ্দিক আলীকে সান্ত্বনা দেয়—

> আর ভাবনা নাহি। অনেক কষ্ট করিয়া জিনটাকে বিদায় করিয়াছি। [জিন]

'উপোসী' গল্পের সৌন্দর্য ভাষার আঞ্চলিকতায় ও সংলাপে। সুন্দরী স্ত্রীর প্রতি প্রভাবশালী টাকাওয়ালা পুরুষের নজর পড়লে কী প্রতিক্রীয়া হয় তারই বিবরণ এই গল্পে। মোহ একসময় ভেঙে গেলে আবার স্বামীর কাছেই ফিরে আসে। আর গল্পের নায়ক তরমুজের উপলব্ধি সম্পর্কে লেখকের ভাষ্য—

> এই অন্ধকারে, তরমুজ তার স্ত্রীর দেহের প্রত্যেকটি ভাঁজ আবারও চিনে নিচ্ছে। শরীর দিয়েই তো মানুষ মানুষকে জানে। শরীরই হচ্ছে আদি ভালোবাসার উৎস। মানুষের শরীর না-থাকলে জীবনে আর কীই-বা থাকতে পারে! [উপোসী]

'স্নান' গল্পটির স্বাদও বিচিত্র, প্রেক্ষাপটও ভিন্ন। লন্ডনের ব্রিকলেনের এক স্নানাগারের কাহিনী এটি। এই গল্পে ভিন্ন দেশে ভিন্ন সংস্কৃতিতে এসে নায়ক অমল তার বৌদির প্রতি গোপন আকর্ষণের কথা স্মরণ করে।

'সৃষ্টিতত্ত্ব' গল্পটি অসাধারণ। বাইবেল-কোরান ঘেঁটে তিনি সৃষ্টিতত্ত্বের সন্ধান করেছেন। পক্ষান্তরে লেখক এখানে বিজ্ঞানের যুক্তিবাদের প্রতিষ্ঠা দিতে চাইছেন। ধর্মীয় কূপমণ্ডুকতার বিরুদ্ধে লেখকের বক্তব্য স্পষ্ট। প্রয়োজনে তিনি দীর্ঘ উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন। ধর্মব্যবসায়ীদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার এটি ভালো উপায়। কিন্তু ধর্মের বর্ণনার উল্লেখ করেই তিনি ধর্মান্ধতার জবাব দিয়েছেন। আর অবশেষে লেখকের আক্ষেপ—

> হায়-রে ধর্ম! তোমার কাছে শাশ্বত বিজ্ঞানও ম্লান হয়ে যায়। [সৃষ্টিতত্ত্ব]

'অপেক্ষা' গল্পটি করাচিগামী রেলগাড়ির যাত্রী নাসিম আহমেদের স্মৃতিচারণায় ভারতবর্ষের রাজনীতির বয়ান চমৎকার ভাবে ফুটে উঠেছে। 'পিতা' গল্পে মুক্তিযুদ্ধের এক অন্য ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। 'নেশা', 'আত্মব্রত' ও 'নীলা' গল্পগুলোও আবদুর রউফ চৌধুরীর অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞার স্মারক।

বাংলাদেশের সিলেট অঞ্চলে জন্ম নিলেও পৃথিবীর বহু দেশ, বহু শহর ঘোরার অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ লেখকের জীবন। প্রতিটি গল্পই শিল্পবিচারে উত্তরণের দাবিদার। নতুন প্রজন্মের পাঠকের কাছে তাঁর নামটি হয়তো বেশি পরিচিত নয়। এই গ্রন্থের গল্পগুলো পাঠ করলে অপরিচয়ের ধাঁধা ঘুচে যাবে। আমরা পাব শব্দের গাঁথুনীতে সমৃদ্ধ কথামালার এক মহান গল্পকারকে আবিষ্কারের আনন্দ।

ড. তপন বাগচী

ঢাকা

সূ চি প ত্র

রানী	১১
জিন	২৬
উপোসী	৩৭
স্নান	৫৫
সৃষ্টিতত্ত্ব	৬৬
অপেক্ষা	৭৮
পিতা	৯৪
নেশা	১০২
আত্মব্রত	১১৫
নীলা	১২৭
সংযোজন	১৩৪

রা নী

১.

ড্রিগরোড স্টেশনের সিনেমা হল থেকে বেরিয়ে কায়সার দেখল, ভিড় ঠেলে এগিয়ে যাচ্ছে তার বন্ধু আফসার আহমদ। কোলে একটি শিশু আর তার বাহুলগ্ন প্রেম-অপরিবর্তন হরিণাক্ষী একটি নারী, সে এক শিশুর স্নিগ্ধপ্রজ্ঞাসম্পন্না জননী, যার অপরূপ সৌন্দর্য যেন পঞ্চমহাভূত প্রকৃতির গর্ভজাত সৃষ্টি, জ্যোতিষ্কমণ্ডলের প্রথম সূর্যের স্বতঃস্ফূর্ত শিশিরসিক্ত আলো, তৃষিত পৃথিবীর একপশলা বারিসিক্ত বৃষ্টি, রাত শেষে উদিত নক্ষত্রকুলের সুন্দরতম ধ্রুবতারা, ঊষালগ্নের স্থির উজ্জ্বল জ্যোতির দ্যোতিত, শাশ্বত অন্তবিরামহীন পূর্ণিমার চাঁদ, অপরূপ ও সৌন্দর্য সুষমামণ্ডিত একটি মূর্তি, তবে ভীতু মূর্তপ্রতীক যেন। নারীটি ডানে-বাঁয়ে তাকাচ্ছে; তার নাকের পাতলা গড়ন, ঠোঁটের নিখুঁত বক্রতা, গায়ের নারিকেল-ভাঙা গন্ধ কায়সারকে দমিয়ে দিল; নতুন কারো সঙ্গে পরিচিতি হওয়ার সম্ভাবনা কায়সারকে অস্বাভাবিকভাবেই ঘাবড়িয়ে দেয়, যেন নিজেকে অপরাধী অপরাধী মনে হয়, ছেলেবেলায় মায়ের আঁচল ধরে বড়ো হওয়ার অভিজ্ঞতা কি এজন্য দায়ী? আফসার কী যেন ভেবে পেছন ফিরে তাকাতেই তার আঁখি-ক্যামেরায় ধরা পড়ল কায়সারের ঝাপসা মূর্তিটি। বুঝি স্বপ্ন! না, স্বপ্ন নয়। চারদিকে বিমানবাহিনীর প্রান্তর আর দিগন্ত; এরই মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে বিক্ষুব্ধপ্রকৃতির প্রতিশোধাত্মকরোষের একটি চিহ্ন—প্রকৃতির বিরুদ্ধে প্রতারণা ও ছলনামূলক সর্বগ্রাসী কংক্রিটের তৈরি রেলস্টেশনটি। কংক্রিট-দানবটি ও স্টাফকোয়ার্টার্স ছাড়া বাকি দিগন্ত জুড়ে বিশাল প্রান্তরের সঙ্গে রাতের আকাশের মিতালি চলছে, যেন একজন নারী, দীর্ঘদিন দাম্পত্যযাপনের পর, তার অনন্তকুমারীব্রত ঘুচে না-যাওয়ার মোহে আপ্লুত। হেমন্তের নবীন সূর্যের কোমল উত্তাপ নিয়ে যেন প্রকৃতির ওপর দিয়ে একটি প্রেমনির্ঝর বাতাস বইতে শুরু করেছে। আফসার ভিড় ঠেলে রাস্তার একপাশে এসে দাঁড়াল, বন্ধুর অপেক্ষায়। ধীরে, আস্তে, দুলে, ঝুলে একটু একটু করে কায়সার আবির্ভূত হল তার বন্ধুর সজ্জিব, ঘনকালো, সজল, অবিচলিত দৃঢ়শান্ত দুটো চোখের সামনে। বন্ধুটি কাছে আসতেই নিরীহ হাসি হেসে আফসার বলল, 'কি-রে এত দিন কোথায় ছিলি?' আফসারের স্ত্রী তার খসে-পড়া ঘোমটা মাথায় তুলে স্বামীর আড়ালে আশ্রয় খুঁজে নিতে চাইছে, কিন্তু আফসারের আহ্বানে আস্ত মানুষটি, তার আগ্রহ ও উত্তেজনা সংযত রেখে, সামনে এগিয়ে আসতে বাধ্য হল। আফসার তার স্ত্রী ও নিজের মাঝখানে কায়সারকে দাঁড় করিয়ে একসঙ্গে অনেকগুলো প্রশ্ন করতে

লাগল, 'কবে এলি'; 'কোথায় উঠলি'; 'খবর দিলি না কেন?' ইত্যাদি, ইত্যাদি। প্রশ্নমালার দু-একটির উত্তর দিয়ে বন্ধুর বাচ্চাটিকে কোলে তুলে নিতেই বাকিসব উত্তর অবান্তর হয়ে গেল, শিশুর হাসির শব্দে আফসার খুশি হয়ে গেল, তাই তার প্রশ্নগুলোর উত্তর পেল কী না সেদিকে আর খেয়াল রইল না, বরং তার স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু, এরকম মানুষের সঙ্গে পরিচয় থাকলে উপকৃত না-হয়ে উপায় নেই।' কায়সার নিশ্চুপ, মৃত-মানুষের নির্নিমেষ চাউনি যেন, রক্ত যেন হিম হয়ে আসছে, তবে মনে তার শ্রান্তির আভাস। আফসারের কথাগুলো করাচির শীতলগরম আবহাওয়ায় মাধুর্যবাষ্প হয়ে উড়ে গেল, তার মন্তব্যের বাহারে কায়সারের মগজ যেন শীতলজলের শরবতে জুড়িয়ে যাচ্ছে, তাই মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া উপায় কী! বন্ধুর দিকে দৃষ্টি স্থাপন করে আফসার বলল, 'আমার স্ত্রী রানী। মা-বাবা তাদের একমাত্র সন্তানের নাম রাখতে কার্পণ্য করেননি। কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন আর কী!' স্ত্রীকে উৎফুল্ল করে তোলার চেষ্টা করল আফসার, রানী কিছুটা খুশি হলেও তার অন্তরে নিঃশব্দে পাথর নিঙড়ানো শান্ত-অশ্রুবিন্দু ঝরছে, তাই পালটা উত্তর দিতে পারল না। রানীর কাঁচুমাচু ভাব দেখে কায়সার বলল, 'ভাবী আমার সত্যি সুন্দরী, হুরীও হেরে যাবে সৌন্দর্যের প্রতিযোগিতায়।' কিছুক্ষণের জন্য কায়সারের দৃষ্টি থমকে দাঁড়াল, রানীর নীরব ক্রীড়াভঙ্গির প্রকাশই তার দৃষ্টি আকর্ষণের কারণ। সে সত্যিই বিশুদ্ধ আনন্দ লাভ করছে। রানীর দেহভঙ্গি ও মুগ্ধদৃষ্টি যে-কোনও পুরুষের ভালোবাসা লুটে নেওয়ার যোগ্য, তাই হয়তো কায়সারের অন্তরে ভেসে উঠল—আমিও তোমাকে জীবন্তপ্রাণীর মুগ্ধ-অতৃপ্ত নয়নে অবলোকন করছি, ত্রিজগতের মধ্যে হয়তো তোমার মতো কোনও সুন্দরী নেই, প্রকৃতির অনুপম সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ তোমার দেহ। ট্রেন চলে-যাওয়ার শব্দ ছাড়া আর কোনও কিছুই শুনতে পাচ্ছে না কায়সার। এই শব্দের মাঝেই আফসার বলল, 'তোর সঙ্গে আমার ঢের ঝগড়া আছে। বাইরে দাঁড়িয়ে আর প্রশংসা নয়। তোর ভাবীর প্রশংসা করতে হলে চল আমার বাসায়, সেই হবে উপযুক্ত স্থান।' কায়সার চমকে বলল, 'কেন?' রানী পলকহীন চোখে তাকাল, মুখ দেখে বুঝতে অসুবিধা হয় না—এক ধরনের কৌতূহলের মাঝেও একটি বেদনার আভাস ফুটে উঠেছে। আফসার একটু হেসে বলল, 'এখানে দাঁড়িয়ে তোর ভাবীর প্রশংসা করলে টাংগাওয়ালার ঘোড়া যদি শুনতে পায় তা হলে সেও, হায়-রে বাবা, হেসে উঠবে।' রাস্তার দু-পাশে কাৎ হয়ে শোয়ে-থাকা বিদেশি বনোঘাস, বিদ্যুতের জাদুতে সোনালি রঙে রাঙিয়ে উঠেছে ফণিমনসার ঝোপ, বিস্তীর্ণ মাঠও; সেদিকে তাকিয়ে কায়সার কিছুক্ষণ নীরব থেকে বলল,

'আজ নয়, অন্যদিন।' কায়সারের মন যেন ক্ষীণধারা, অতিকষ্টে টিকে-থাকা মরুনদীর মতো শুকনো প্রায়, উৎসাহহীন, তবুও নিয়ম অনুসরণে চলতে হয় তাই চলা। আফসার এগুতে গিয়ে হোঁচট খেল, জুতোর ফিতে সাপের মতো প্যাঁচিয়ে রয়েছে তার ডান-পা জুড়ে, পথের পাশের কংক্রিটের রেলিংয়ের সঙ্গে হেলান দিয়ে বাঁ-হাঁটু ভেঙে ডান-পা উঁচিয়ে জুতোর ফিতে লাগানোর চেষ্টা করল, কিন্তু ভুল প্রান্ত ধরে টান দিতেই ফিতের গিঁট বিষগেরোতে পরিণত হতে সময় নিল না, গিঁটজট খোলার জন্য টানাটানি করতে করতে বলল, 'আজ নয় কেন? আগামীকাল তো রোববার, একটু দেরি করে শোলে তোর কোনও অসুবিধা হবে না।' কায়সার তার হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, 'বারোটার সময় গেট বন্ধ হয়ে যায়।' কিছুক্ষণ ফিতে ধরে টানাটানি করেও ফিতের বিষজট খুলতে না-পেরে রাস্তার ওপর হাঁটু-গেড়ে বসে নখ দিয়ে গেরোটি খুলে ঠিকমতো ফিতে বেঁধে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, 'ক্যাম্পের ভেতর যে কতগুলো নতুন কোয়ার্টারস তৈরি করা হয়েছে তারই একটিতে আমাদের বাস, কাজেই গেট বন্ধ হওয়া নিয়ে কোনও দুশ্চিন্তা নেই।' কায়সার আর কী করবে! বিমানবাহিনীর কোয়ার্টারসের বিস্তীর্ণ মাঠে শিশির-ভেজা, ঝিমে-থাকা ফুল-বাগানের ভেতর দিয়ে হেঁটে চলল তিনটি প্রাণী, সঙ্গে কোলে ধরে-রাখা বাচ্চাটিও। সিন্ধুনদের কুয়াশাভেজা শীতের সোনালি রঙের বিদ্যুৎ-বাতির আলো ঈষৎ টেউ খেলছে রানীর শাড়ির সঙ্গে, আর তার মুখে প্রকাশ পাচ্ছে ঘনায়মান বিষণ্নতার একটি গভীর ছায়া; তার হৃদয় যেন স্বদেশ-বিচ্ছেদের বেদনায় ভারাক্রান্ত—স্বদেশ, মা-বাবা, ভাই-ভাবী, বোন-ভগ্নিপতি, তাদের ছেলেমেয়েকে ছেড়ে চলে আসার ব্যথাই হয়তো-বা। সিন্ধুপাড়ে সুখের নীড় বাঁধলেও কী গঙ্গা-পদ্মা-ব্রহ্মপুত্রের কথা ভোলা যায়! হয়তো-বা তাও নয়, হয়তো বিষাদ ফুটে উঠেছে অন্য কারণে—স্বামীর সঙ্গে একা একা সন্ধ্যাটি কাটিয়ে দেওয়ার আনন্দের শিরশিরানি, অন্তরে জেগে-থাকা বাসনাটি অকারণে অস্ত গেছে বলে, কোথা থেকে এক বন্ধু এসে সুসময়টুকু নষ্ট করে দিল। কায়সারের ইচ্ছে হচ্ছে একবার তাকে থামিয়ে বলবে, 'শুনি, কী হয়েছে! এত ম্লান কেন তুমি?' কিন্তু সে তা করতে পারল না, বরং মাথা চুলকোতে চুলকোতে, ঘাড় সামান্য কাৎ করে, কোনও কিছু না-বলে এগুতে লাগল, কোয়ার্টারসের প্রাঙ্গণ ঘেঁষে, মাথাভাঙা-রাস্তা দিয়ে; উভয় পাশেই ফুলের মেলা, সিন্ধি গোলাপের সুগন্ধময় বাতাসে পরিবেশ মোহিত। কী মিষ্টি, কী স্নিগ্ধ! আকাশে চাঁদ উঠেছে, আলোও ছড়াচ্ছে, কিন্তু মাটির কাছাকাছি এসে যেন বিদ্যুৎ-বাতির আলোর কাছে হার মেনেছে, তবুও চাঁদস্নিগ্ধ আলো আপন মনেই পরিবেশকে মায়াময় করে তোলার ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বাড়ির

প্রাঙ্গণে প্রবেশ করতেই কায়সারের নাকে একটি গন্ধ এসে ধাক্কা খেল, রাস্তার পাশের ফুলের ঘ্রাণের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন। বাসগৃহের সামনেই খালি জায়গাতে ছোট একটি বাগান করা যেত বা যত্ন করে একটি ছোটখাটো বুনোগাছ লাগানো যেত বা বিদেশি ঘাস, লতাপাতা-ঝোপঝাড় ফুলে ফেঁপে ওঠা সুপরিকল্পিত বন্দোবস্ত করা যেত বা বারান্দার পাশ ঘিরে, দৃষ্টি আড়াল করে রাখার জন্য, নাম-না-জানা কোনও ঝাঁকড়াগাছ লাগানো যেত, যার ঝাঁকড়ামাথা এতদিনে ছাদ স্পর্শ করত, আর মাটির দিকে নুয়ে-পড়া পাতাগুলো হিল্লোলিত হতো বাতাসের দুলনে; তা না-করে এদিকের ওদিকের আবর্জনা, ঘর ঝাড় দেওয়া ময়লা, মাছের কাঁটা, মুরগির হাড় স্তূপিত করা হয়েছে। ওষুধভর্তি দুটো বোতলও নোংরা স্তূপের উপর ভিড় জমিয়েছে। সমস্ত বিমানবাহিনীর সেনানিবাসের মুগ্ধকর পরিবেশ এখানে এসে যেন আত্মহত্যা করেছে। সুন্দরী এক নারী এমন অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে নিজেকে গুটিয়ে নিতে পারে তা চোখে না-দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। কায়সার বসারঘরে প্রবেশ করতেই দেখতে পেল দেওয়ালে ঠেস দেওয়া এক-সেট আরাম চেয়ার, তারই উপরে কালো চিহ্নগুলো যেন স্বামী-স্ত্রীর বিষণ্ন-বিরস প্রহরগুলোর অনবরত ইতিহাস রচনা করে চলেছে, আর পেরেকের গর্তগুলোর মাঝে আত্মপ্রকাশ করছে দুঃখ-বিষাদ-গ্লানিই শুধু নয়, শ্রান্তিও। চুনরঙের চওড়া আস্তরণ, মেঝে থেকে একহাত পর্যন্ত উঁচু, শুকিয়ে বিরহ-ধরা আবরণে পরিণত হয়েছে। চারদিকের অতিরিক্ত অপরিচ্ছন্ন ভাবটি সগৌরবে আত্মপ্রকাশ করছে। 'চা আনি'—বলে পর্দা সরিয়ে রানী চলে গেল রান্নাঘরে, আর তার পিছনে দুলতে লাগল পর্দার প্রতিটি ভাঁজ; সেখানে ইস্ত্রির কোনও নিটোল চিহ্ন নেই, সেলাইয়ের পরতে পরতে শুধু জমে আছে ধুলোর তারকাঁটা, সুতোর মাঝে মাঝে যেন দুর্বোধ্য ও দুঃস্বপ্নের ভগ্নস্তূপের উপর জমে ওঠা বেদনার একরকম রহস্যময়ী জীবনগাঁথা সগর্বে আত্মপ্রকাশ করছে। রানী চা এনে দিলে, কাপে পূর্বকার চা পানকারীর চুমুকের দাগ বাঁচিয়ে চুমুক দেওয়ার জায়গা খুঁজে পেল না কায়সার, বিমর্ষভাবে হাসলেও তার অন্তর ঘিনঘিন করতে লাগল। নিঃশব্দের প্রতীকের মতো কায়সার দেখতে লাগল ঘরের চারপাশ এবং এককোণে জড়ো করে রাখা ছেলের প্রস্রাবে ভেজা কাপড়গুলো। সে দেখতে পেল, এসবের মাঝে যেন অনুত্তেজিত বঞ্চিত অন্তরের যন্ত্রণাই স্তিমিত হতাশার মতো আনাগোনা করছে।

২.

আফসারের সন্ধান নেই, তার পাত্তা লাগাতে এসে রানীকে প্রশ্ন করে বিব্রত করতে লাগল কায়সার, এরইসঙ্গে আবিষ্কার করল—রানী তার দূর-সম্পর্কের এক সূত্রে

আত্মীয় হয়; এরকম সম্পর্ক সাধারণত বিস্মৃতির আড়ালে বিলুপ্ত হয়ে যায়, কিন্তু রানী এ-সূত্র ধরে কায়সারের সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হতে চায়। রানীর এরকম ব্যবহার খুবই অপ্রত্যাশিত। কায়সার নিজেই জানে না এর মানে কী। তবুও সে মনে মনে খুশিই হল, পরমুহূর্তে কষ্টও পেল বটে, যাকে বলে অকাল মৃত্যু—কি করে সে একজন সুন্দরীর সঙ্গে দূর-সম্পর্কীয় সম্পর্কে আবদ্ধ হবে? সে ভেবে পাচ্ছে না, হঠাৎ মানুষ কীভাবে মায়া জাগিয়ে কেঁদে উঠতে পারে! একথা রানীকে বলা যায় না, সে বুঝবেও না। কায়সার থেমে গেল। কিছুক্ষণ নিষ্পলক তাকিয়ে রইল রানীর আচমকা অপ্রস্তুত প্রস্তাবে, 'এখন থেকে আপনি আমাকে বোন বলে গ্রহণ করবেন।' কায়সারের বুকের ভেতর শিরশির করে উঠল, এই সম্পর্ক সে প্রাণপণ অস্বীকার করতে চায়, ঠেলে দিতে চায় মাথা থেকে, তারপর নিজেকে সংযত করে বলল, 'না মানলে কি করবে?' কায়সার সম্পর্কটিকে না-মানলে রানীর মনের অব্যক্ত কথাগুলো উচ্ছ্বসিত জলাশয়ের মতো ঢেউয়ের পর ঢেউ তুলে হৃৎপিণ্ডের গভীরে হারিয়ে যাবে; যেখানে বনমোরগের ডাক চলছে—অনিয়মিত, বর্ণশূন্য, রুক্ষ; ঘরের বাতাসের মতো অনিশ্চিত; অনিশ্চিত ঘাসহীন, কাদাহীন রোদভেজা মরুবালুর মতো, অনিশ্চিত সিন্ধুনদের উপর বয়ে চলা লবণাক্ত লু-হাওয়ার মতো—কখনও হিম, কখনও শীতল, কখনও বরফঠাণ্ডা, আবার কখনও রঙচটা নিষ্প্রাণ বস্তুর মতো ফ্যাকাশে। কায়সার জানে, অব্যক্ত হৃদয়ের কথাগুলো কঠিন জটলায় ডুবে গেলে সেখানে জন্ম নেবে লাল-নীল রক্তের জটিল মোহনা, আস্তেধীরে ক্ষতস্থানটি শুকিয়ে উঠলেও বিবর্ণ মরা হৃদয়ের অব্যক্ত কথাগুলো বঞ্চিত ঘটঘটে হতে হতে একসময় বিলীন হয়ে যাবে, সঙ্গে হৃদয়ের শেষ আকাঙ্ক্ষাটিও; কিন্তু অব্যক্ত কথাগুলো ব্যক্ত করতে পারলে হৃদয়াঘাতপ্রাপ্ত জায়গাটি ছেঁড়া কাগজের মতো শুকোবে, জীবনবৃক্ষে সজীবতা লাভ করবে, শরীর প্রেমকামের তৈলাক্ত রসে ঋজু হবে। রানীর অবোধ দুটো চোখে অশ্রুচ্ছায়ার ক্ষীণরেখা ফুটে উঠেছে, কায়সার ঠিকই টের পেল, সংসারে না-পাওয়ার অভাবগুলো রানীর দৃষ্টিতে চকচক করছে, এ-যেন বঞ্চিত মনের একটি অতৃপ্ত পুঞ্জীভূত ছায়া। রানী জানে, একজন বিবাহিত স্ত্রীর পক্ষে আরেকজন পুরুষের কাছে মনের কথা প্রকাশ করা ভীষণ অন্যায়, তবুও চাপা গলায় বলল, 'আমি সবকিছু খুলে বলতে পারব না।' সমস্ত মহিমা, জীবনের সব ষোলকটির ছক তার বাদামি উজ্জ্বল মুখকে প্রকাশ পাচ্ছে, চোখ-দুটোও বেঁকে উঠেছে ধনুকের মতো, মনের অব্যক্ত কথাগুলো যেন সগর্বে উঁকি দিচ্ছে তেতুল বিচির মতো, ব্লাউজের বোতামে ঝকঝকে রূপালি বেদনার নুয়ে-পড়া শাদা শাপলার ঝিলিকটিও; ভারি নিশ্বাস বুকের মধ্যে সজোরে তরঙ্গ

তুলছে—আকাশ, প্রান্তর, বদ্ধঘরের পরিবেশও যেন উলটে-পালটে যাচ্ছে; হৃদয় ডুবে যাচ্ছে গভীর বিষাদের অতলে, ঈর্ষান্বিত সৎমায়ের ঠোঁটের নিশ্চিত হাসির মতো। কায়সার ভেবে চলেছে—তুমি নারী: রূপওয়ালিনী, ছলনাময়ী, মনোমোহিনী, বিচিত্ররূপিণী; তুমি হেলেন: ট্রয় ধ্বংস করেছ; তুমি দ্রৌপদী, আঠারো যোদ্ধাকে বধ করেছ; তুমি সীতা: লঙ্কাপুরী জ্বলেপুড়ে খাক করে দিয়েছ; তুমি জয়নাব: কারবালা প্রান্তরে ইমাম বংশকে খুন করেছ। নারী পারে না কী! আর প্রকাশ্যে একগাল হেসে বলল, 'আমি রাজি।' নীলফিতে বাঁধা বেণিটি আঁচলে ঢেকে রানী নিশ্চুপ। চোখ-দুটো একটির চেয়ে অন্যটি নীরব, ছাদে ধাবিত; গভীর অপরূপ দৃষ্টি; কায়সার মুগ্ধ না-হয়ে পারে না, অন্যমনস্ক হয়ে বলল, 'আমাকে এক কাপ চা দেবে?' রানীর মুখে বাঁকা হাসি ফুটে উঠল, তবে তার দুটো চোখে যেন জলে-ঢাকা আগুন, মাঝেমধ্যে বিদ্যুতের ঝলকও, অদ্ভুত! সে বলল, 'এই গরমে চায়ের কী প্রয়োজন!' কায়সারের আদেশে নয়, তৃষিত অতিথির সেবাবৃত্তি রানীর মনে জেগে ওঠায় সে রান্নাঘরে চলে গেল, তবুও বুকের গোপন ব্যথাটি তাকে কঠিনভাবে পীড়া দিতে লাগল। তার অন্তরে ধরে-রাখা হতাশা-বেদনা আজ সত্যি সত্যিই ফেনিল হয়ে উঠেছে; চেনা-পরিচিত-জানা-একান্তকাম্য মানুষটি হঠাৎ কেমন যেন অচেনা-অপরিচিত-অজানা হয়ে উঠেছে, অকারণে বিস্ময়কর অন্যায় করে বসছে সে। রানী এসবের কোনও সঙ্গত কারণ আবিষ্কার করতে পারছে না, সমস্যার মীমাংসা করা যাবে কী না সে এ-বিষয়েও অনিশ্চিত। নিঃসঙ্গ জীবনে, বিশেষ করে পরদেশে পরবাসী হয়ে, কীভাবে সে এর সন্ধান করবে! রান্নাঘর থেকে ফিরে-আসা রানীর বাঁ-হাত এসে ঠেকাল কায়সারের কাঁধে, সামনে এক পেয়ালা শরবত। রানী বলল, 'সবটুকু খেতে হবে।' শরবতে চুমুক দিয়ে চোখ তুলে তাকাল কায়সার, আর তখনই তার চোখে ধরা পড়ল রানীর চোখের কোণে চিকচিক করে ওঠা ঝিলিকটি। সে ঝিলিকটি কী আফসার, না কায়সার! কায়সার ভেতরে ভেতরে দুর্বল হয়ে পড়েছে। বরফঠাণ্ডা শরবতে আরেকবার গভীর চুমুক দিয়ে মুখ বিকৃত করল, জিভ বোধ হয় বরফ হয়ে গেছে। সিনেমা হলের সামনে পরিচিত হওয়া ও ওদের বাসায় প্রথমবারের মতো চা খাওয়ার পর এই হচ্ছে তার দ্বিতীয় সাক্ষাৎ, প্রয়োজনীয় দু-চারটে কথাবার্তা, খুবই মামুলী—আর তো কিছুই নয়। রানী আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন করে, খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে, আজ একটি বিপত্তিকর ঘটনা ঘটাবে নাকি! এতে কোনও সন্দেহ নেই। শরবতের পেয়ালায় ঘনঘন চুমুক দিয়ে কায়সার এসব কথাই ভেবে চলেছে, আর তার মনের অতল গহবরে রানীকে নিয়ে মন্থন করছে; স্বপ্নকাতর প্রাণ, সৌন্দর্যহর্ষে উদ্বেলিত সরল মেয়েটি সত্যিই রহস্যময়ী। দূর

আকাশে, সাঁঝের মাঝে রূপালি মেঘের বিচিত্র চিত্রকল্প ভেসে চলেছে, আর এরই মাঝে উড়ে বেড়াচ্ছে ঝাঁকে ঝাঁকে মায়াবিনী শঙ্খচিল আর তার স্তর ফুঁড়ে তীব্র কণ্ঠে যেন জেগে উঠেছে সৈনিক-নগরের ব্যস্ততা। ঠিক তখনই আফসার দ্বারপ্রান্তে এসে থমকে দাঁড়াল, কায়সারের নজর এতক্ষণ দরজার উপরই ছিল। কায়সার নীরব, আফসার স্থিরদৃষ্টিতে দেবমূর্তি, কিন্তু তার চোখ কপাল স্পর্শ করেছে, অনেক অকর্তব্যের দায়ই প্রকাশ পাচ্ছে যেন, কুঞ্চিত ভ্রু-দুটো তার তীক্ষ্ণ, কিন্তু যুবকোচিত উজ্জ্বল মুখে উজ্জ্বলতার ম্লানঘন ছায়া, কণ্ঠ দিয়ে শুধু একটি অর্ধস্ফুট শব্দ বেরিয়ে এল, কিছুই বোঝা গেল না, আর্তনাদের মতোই শোনাল, সঙ্গে সঙ্গে রানীর গোলাপি মুখটি লজ্জায় লাল হয়ে গেল, বুকে দুরুদুরু শব্দের ছক্কাপাঞ্জা চলছে, শুধু চোখ-দুটো নিঃশব্দে আফসারের দিকে লুকোচুরি খেলছে যেন। একমুহূর্তে সম্পূর্ণ পরিবেশ বদলে গেল। রানীর অন্তরের অসহ্য বেদনা প্রকাশের জন্য একটি মানুষের প্রয়োজন ছিল, যেমনি ভেন্টিলেশন শূন্য ঘরের বায়ু দূষিত হয়ে ওঠে তেমনি বঞ্চিত মানব অন্তরে সঞ্চিত ব্যথা প্রকাশের সুযোগ না-দিলে দাম্পত্যজীবন অসহনীয় হয়ে ওঠে; এছাড়া উপায় কী! এরকম যন্ত্রণামূলক পরিবেশ বা অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনায় রানীর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল, কিছুক্ষণের জন্য, কিন্তু এখন, আফসারের আগমনে সব যেন থেমে গেল, কানের দুলগুলোও এপাশ ওপাশ দুলতে দুলতে অর্থহীন অসহায়ভাবে একসময় স্থির হল। আশ্চর্য, রানীর টলন্ত দেহ নিজের অজান্তেই চেয়ারে নেতিয়ে পড়েছে, কিন্তু বাতাসে তার হাড়গুলো খটখট শব্দে নড়তে লাগল, আর রক্তাভ মুখে অনেকগুলো অত্যন্ত অদ্ভুত পাঠাবলির নকশা ফুটে উঠেছে, যাকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হতে লাগল স্বপ্ন আর জাগরণ।

৩.

রানীর মুখে একটি বিষণ্ন কিন্তু মহৎ ও আকর্ষণীয় ক্ষমাসুন্দর নিরুত্তাপ ভাব ফুটে উঠেছে। সে নিশ্চলভাবে, একান্তই অর্থহীন দৃষ্টিতে শূন্যপানে তাকিয়ে শুনছে কায়সারের ঘনঘন নিশ্বাস ও দ্রুততর পায়ের অসম পদধ্বনি। সহসা রানীর মুখের পেশি ও রেখাগুলো কাঁপতে লাগল। কাঁপন বেড়েই চলেছে। সুন্দর মুখটি একদিকে একটু বেঁকে গেছে আর সেই বিকৃত মুখের ভেতর থেকে কয়েকটি অস্পষ্ট কর্কশ শব্দ বেরিয়ে এল। রানী তার দাম্পত্যজীবনের—শুকনো শাখায় পিঁপড়ের জীর্ণ বাসার—ইতিবৃত্ত খুলে বলতে গিয়েও বলতে পারছে না, ইতস্তত করছে—স্পষ্ট, অস্পষ্টভাবে সে মনের গোপন কথাটি প্রকাশ করার চেষ্টা করছে। ভেতরে ভেতরে তার অবুঝ সত্তাটিও কাঁপছে, সন্তর্পণে একটি আলপিন

ফুটিয়ে অব্যক্ত কথাটি প্রকাশ করতে চাইছে, এ লক্ষ্য করে কায়সার বলল, 'দেখো রানী, সবকিছু খুলে না বললে আমি তোমার জন্য কিছুই করতে পারব না। রোগের বিস্তারিত বিবরণ না-জেনে ডাক্তার কি পারে রোগীর জন্য সুব্যবস্থা গ্রহণ করতে?' রানীর দুর্বল মুখে একটি করুণ হাসি খেলে উঠল, যা তার গভীরগম্ভীর মুখে বেমানান মনে হচ্ছে, তবুও এরই মধ্যে যেন ফুটে উঠেছে তার অসহায় অবস্থার রঙ-বেরঙের সেলাইগুলো। চোখও ঝাপসা হয়ে উঠেছে। রানীর দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে কায়সারের অন্তর অপ্রত্যাশিতভাবে কেঁপে উঠল। মা-নানীর উপদেশ—বুক ভেঙে যাক, তবুও মুখ খুলবে না—ধন্বন্তরি বলে মান্য করে বাঙালি মেয়েরা, রানীকে তবুও সব খুলে বলতে হবে—সে তা বুঝে। বিদেশ-বিভুঁইয়ে আর কে আছে তার আপন? যে তার অতি আপন সে-ই তো পর হতে চলেছে। তাকে ফিরিয়ে আনতে হবে। সে বুঝছে—কায়সারের মতো মানুষ জগতে পাওয়া কঠিন, মনে হয় ত্রাণকর্তারূপেই যেন তার আবির্ভাব ঘটেছে। বজ্রপাতের শব্দে উত্তেজিতভাবে যেমনি ঘুম ভেঙে যায় তেমনি ব্যাকুলভাবে রানী বলল, 'সি-ব্লকের সাত নম্বর বাসার খানকিটা যে কয়েকটি মেয়ের কপাল ভেঙেছে, আমিও তাদের একজন।' যে-কোনও কারণেই হোক আফসার যে রানীকে এভাবে ঠকাচ্ছে তা কায়সার ভাবতেই পারেনি। রানীর জীবনে প্রেম আছে, কিন্তু তা অনুপযুক্ত, ক্ষয়পূর্ণ হৃদয়ে অর্থহীন; আফসারের উল্লাসে ভাটা পড়েছে, রানী তা টেরও পাচ্ছে, স্ত্রীর আহ্বানে স্বামী আগের মতো আর সাড়া দিচ্ছে না, দিলেও দুর্বল, মনরক্ষা সাড়া যেন, কৃত্রিমতায় ভরপুর। স্ত্রীর জীর্ণাবিশিষ্ট যৌবনের সবকিছু ব্যয় করছে স্বামীকে জয় করার জন্য, কিন্তু ফল হচ্ছে শূন্য। আফসার তার স্ত্রীর প্রেমের খোরাক দিতে পারছে না, শুধু পারছে তার স্ত্রীর অশান্তি-উদ্বেগ-সন্দেহ-ঈর্ষা-পীড়া সমস্ত অনুভূতিগুলোকে বাড়িয়ে দিতে, তাই হয়তো রানীর হৃদয় ভরে উঠেছে এক নিদারুণ কঠিন অব্যক্ত ব্যথায়। চা পানের অপেক্ষা না-করে উঠে পড়ল কায়সার। সাত নম্বর বাসার দরজায় নক করতেই একটি মেয়ে দরজা খুলে সামনে এসে দাঁড়াল। দরজার ফাঁকে কায়সার দেখতে পেল দেওয়ালে কাশ্মিরি কার্পেট ও জানালায় রাজস্তানি দর্পণের কারুকাজে সজ্জিত বিভিন্ন রকম পর্দা ঝুলছে, যেন স্বর্গীয় আমেজ সৃষ্টি করা হয়েছে। অন্যদিকে মেহগনির আলমারির ভেতর বিভিন্ন আঁকারের মূর্তিগুলো জ্বলন্ত মোমবাতির উজ্জ্বল শিখার মৃদু আলোয় লাল হয়ে জ্বলছে। কায়সার দরজা ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করে, নরম কার্পেট মাড়িয়ে, একটি ঘরের দিকে অগ্রসর হল। ঘরের ভেতর থেকে একটি খেয়ালের সুর ভেসে আসছে। ভেজানো দরজা একটু ফাঁক করতেই চোখে পড়ল, ছোট একটি

গোলটেবিলে ফল ও ঠাণ্ডা-খাবারের এলোমেলো সমাবেশ। পা টিপে কায়সার জলসাঘরে ঢুকল। ঝকঝকে সিল্কি চাদরের উপর বসা এক রমণী খেয়াল গাইছে। সঙ্গীত কী বিষম বস্তু! রাগ-রাগিণীর কী অসাধারণ ক্ষমতা! সঙ্গীতস্রষ্টা খসরুর মতো কে পেরেছে—ইমন, ভৈরবী, পুরিয়া, ভূপালী, বিলাবল, বিহাগ, কল্যাণ, ঝিঝেট, বসন্ত, পূরবী, গৌরী, সরস্বতী, তড়ি—বিভিন্ন রকমের রাগরাগিণীর বিপুল বিস্তর সমুদ্রে ডুব দিয়ে খেলা করতে। রমণীর একপাশে বালিশ, আর তার তিনপাশে জ্বলন্ত মোমবাতি ঘেরা পরিবেশে বসা পুরুষগুলো নীরবে মগ্ন, খেয়াল শুনছে। আধোমুখে দাঁড়িয়ে রইল কায়সার। রমণীটি কুটিল, স্থির ও জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে কায়সারের দিকে তাকাতেই ভীরু চোখে বন্ধুর মুখে দৃষ্টি স্থাপন করল আফসার, তারপর বলল, 'ও আমার বন্ধু।' রমণীটি সুন্দর আস্তরণমোড়া মুখে অভ্যর্থনা জানাল, কিন্তু খেয়াল বন্ধ করল না। মদ ও মোমবাতি পোড়ার গন্ধ কায়সারকে যেন চারদিক থেকে ঘিরে ধরেছে। গান শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এক ভক্ত গুনে গুনে এক-একটি করে চার-চারটি আঙ্গুর রূপবতীর মুখে ঢুকিয়ে দিল, রমণীটি একটি কথাও বলল না, শুধু ঠোঁট ইশারায় নাড়ল, যেন আঙ্গুরের রস অপচয় না হয়, কিন্তু হাসিটি ঠিকই স্থির হয়ে রইল আঁখিপাতে। যখন আফসারের হাত আঙ্গুরসহ সাবধানে এগিয়ে এল তখন তার চওড়া-হাড় ও মাংসল-হাতের ওপর রমণীটি ঠোঁট চেপে ধরল, কিন্তু তার দেহ একটুও কাঁপল না। ভালোবাসা ছাড়াই পুরুষকে বশীভূত করার বিদ্যা সে জানে। সত্যিই বীরভাগ্যা! সে হয়তো কোনও দিনই আফসারের বীরত্ব চায়নি, চেয়েছে একজন বঞ্চিত পুরুষের উষ্ণ হৃদয়ের ছোঁয়া, যা তার আত্মত্যাগের উপরই দাঁড়িয়ে রয়েছে। রমণীটি বলল, 'এ হবে আজকের আসরের শেষ গান।' ভক্তবৃন্দের করধ্বনির মধ্য দিয়ে গানটি একসময় শেষ হল। পুরুষগুলোর গায়ে শুধু কামরূপিণীর নিশ্বাসের আঁচ লেগে আছে। আলো-অন্ধকারে আচ্ছন্ন ঘরটিতে নেমে এসেছে অভুক্ত প্রেমিকদের কেয়ামত; বুকের মধ্যে শুরু হয়েছে শাদা বকের ডানা ঝাপটা, মন্থর গতিতে ডানা মেলার পাতলা ছায়াও, এরইসঙ্গে কয়েকটি ভক্তের কুচকুচে কালো ঝাঁকড়া চুলে ঢেউ উঠল, অচেনা বিলে মাঝির মাছ-ধরার ফন্দির মতো; আর দেওয়ালে লেপটে রইল রমণীর গানের অন্যরকম ধ্বনিপ্রতিধ্বনির নকশাগুলো। আর তখনই নাটকের যে-দৃশ্য শুরু হল সেজন্যে কায়সার একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। একে একে প্রত্যেক পুরুষগুলো ওষ্ঠাধরে ধারণ করল কড়কড়ে এক-একটি মোটা টাকার নোট। রমণী উপস্থিত মর্দজোয়ান সকলকে কামবাণে বিদ্ধ করে সবচেয়ে কাছের ভেড়াটির কোলে ঢলে পড়ল, স্রোতস্বিনীর মতো। হাত দিয়ে মুখ থেকে টাকার নোটটি আলতোভাবে

সরিয়ে নিয়ে অকস্মাৎ ভেড়াটির ঠোঁটে নিজের ঠোঁট দাবিয়ে দিল; দারুণ চুম্বনশক্তিতে চুষে নিল ওষ্ঠাধরের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত। রমণীটির ঠোঁটের ফাঁকে আটকা পড়ল লালাসিক্ত ভক্তের জিভের ডগা। রমণী তার দুই রম্ভোরুর সাহায্যে ভক্তের বক্ষে প্রবল চাপ দিল, কামপ্রিয় অতৃপ্ত পুরুষটিকে রোমাঞ্চকর উন্মাদনায় মাতিয়ে তোলার সুফল চেষ্টা যেন। দুর্বল মনের মানুষের পক্ষে অনেক কিছুই সহ্য করা শক্ত, তবুও রমণীটির সঙ্গসুখ আশ্চর্যভাবে ভক্তের মনকে ক্ষণিকের জন্য হলেও আনন্দ লুটতে সাহায্য করল। রমণীর আলিঙ্গন তাকে তার দুঃখময়, অতৃপ্তময় জীবন থেকে কিছুক্ষণের জন্যে হলেও রেহাই দিল। অন্য ভক্তরা নিজের স্ত্রীর সঙ্গে মিলনখেলায় অপূর্ণ-বঞ্চিত হৃদয় নিয়ে পাথরের মতো স্থির হয়ে বসে রইল, পরস্ত্রীর সমস্ত দেহ উত্তেজিতভাবে ভক্ষণ করার আশায়। চোখ বুঁজে পুরুষগুলো যেন অনুভব করতে চাইল সুন্দরীর গভীরে অনুপ্রবেশ করে বীর্যস্খলনের আনন্দ, আর যখন তারা একে একে চোখ খুলল তখন দেখা গেল রমণীর সর্বস্ব লুটে খাওয়ার আকাঙ্ক্ষা তাদের চোখে ঝিলিক মারছে শুধু। কায়সারের এসব ব্যাপারে অভিজ্ঞতা না-থাকায় সে ভক্তবৃন্দকে সমর্থন করতে পারল না, এমনকি পারল না রমণীর মহত্তর, মধুরতর, শ্রেয়তর ভালোবাসার সম্মান দিতে, শুধু তার মনে হল, এতগুলো পুরুষের চোখ আকৃষ্ট করা রোমান্টিক প্রেমময়ী, মহৎ হৃদয়ের অধিকারী নারীটির অন্তরে যে অনুভূতি জেগে উঠেছে তার তুলনা কী! রমণীটি তার সামনে বসা ভক্তের গালে চারটি সফেদমসৃণ দাঁত দিয়ে ষোলকটির দাগ কেটে পরবর্তী ভক্তের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল, অভুক্ত ভক্তকে কৃতার্থ করতে; ভক্তরা যেন দরিদ্রতম ভিক্ষুকের চেয়েও দরিদ্রতর। এমনিভাবে সে তাকে ঘিরে-বসা দশটি পুরুষের অন্তর জয় করতে করতে জয়ী মিষ্টিমধুর হাসি হাসল। যে-পুরুষগুলো একটু আগে একটি নারীর অর্চনায় আনন্দোপভোগ করছিল তারা বিজয়িনীর হাসির রেণু কুঁড়িয়ে নিয়ে, 'নারী হৃদয় কে বুঝে'—আফসোস ধ্বনিটি সযত্নে বুকে ধারণ করে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল; তারপর টাকার ছোট থলেটি পকেটে রেখে, রঙ-বেরঙ ও নানা রেখায় চিত্রিত কাঁধের ব্যাগটি হাতে তুলে আস্তেধীরে দরজাভিমুখে যাত্রা করল। পুরুষগুলোর পেছনে দরজাটি, সময়মতো, সশব্দে বন্ধ হল; আর তখনই বর্ষাবিস্ফারিত নদীর জল যেভাবে গ্রামগঞ্জকে উচ্ছ্বলিত স্রোতরাশিতে ভাসিয়ে নেয় সেভাবে তাদের অতৃপ্ত অন্তর ছলছল করতে লাগল। তাদের হৃদয়ে একরকম বেদনা জেগে উঠল। অনুভব করল, স্বগৃহে রেখে আসা বিয়ে-করা অবহেলিত স্ত্রীকে তর্জনগর্জন করবে কী না! তবে তাদের চোখে স্থান করে নিয়েছে তাদের স্তব্ধ, বঞ্চিত, মর্মাহত স্ত্রীদের করুণ মুখগুলো; তাই হয়তো তারা

তাড়াতাড়ি সিঁড়ি ভাঙতে শুরু করল, পায়ে যেন অসীম শক্তি, খরতর বেগে সে শক্তি বয়ে চলেছে তাদের রক্তে ও পেশিতে; আর তাদের মনের মধ্যে জীবন্ত হয়ে ভাসছে নগরের শেষ সীমানায় অবস্থিত শ্মশান-ঘাটের ছবিটি, যার জলপ্রবাহে আত্মগোপন করে আছে শুধুই মানুষপোড়ার গন্ধ। জলসাঘরে তখনও ভেসে বেড়াচ্ছে আগরের গন্ধ, এই গন্ধঘেরা পরিবেশে আফসারকে উদ্দেশ্য করে রমণীটি বলল, 'আগামী সন্ধ্যায় আপনার বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে আরেকবার আসবেন, কেমন?'

'অবশ্যই।' তবে জলসাঘরের বাইরে এসে আফসার বলল, 'দেখলে তো তোকে সুন্দরীর কেমন মনে ধরেছে!'

'তোর ঈর্ষা হচ্ছে বুঝি!'

'তা হবে কেন?'

'আমি তোকে নিয়ে সবসময় গর্ব করি। যাক, এখন বাসায় চল?'

'না, এখন না। আগামীকাল ছুটির দিন। ব্রেকফাস্ট শেষে তোর বাসায় আসব।'

'আমি তোর অপেক্ষায় থাকব।'

'আমার জন্য অপেক্ষা করতে হবে না। তোর যেখানে প্রয়োজন চলে যাস্। রানীর জন্যও তোকে ভাবতে হবে না।'

'কেন?'

'ইতোমধ্যে আমাদের মধ্যে একটি স্প্যাশিয়েল সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। ভাইবোনের সম্পর্ক বলতে পারিস।'

'খুশির কথা। তা না-হলেও আমার কোনও সমস্যা নেই। তোর প্রতি আমার অগাধ আস্থা আছে।'

'আমার প্রতি তোর আস্থা অগাধ থাকা ভালো, খুব খুশির কথা; তবে বন্ধু, সে সঙ্গে আরেকটি কথাও অস্পষ্ট থাকে না।'

'কি কথা?'

'রানীর প্রতি তোর আকর্ষণ যে হ্রাস পাচ্ছে, সে কথা।'

'সেজন্যে কী আমি একাই দায়ী!'

'আমি তোকে বা রানীকে দায়ী করছি না, কেবল সত্য কথাটি বললাম।'

'এতে লাভ?'

'সত্যকে যদি আমরা উপলব্ধি করি, তা হলে অসত্যকে বর্জন করতে সক্ষম হব।'

৪.

তীক্ষ্ণ ও ধাতব শব্দটি অনেকক্ষণ ধরে রানীর কানে এসে ধাক্কা খাচ্ছে। একটু সময়ের জন্য থামলেও আবার শুরু হতে সময় নেয়নি; কিন্তু কীসের শব্দ, ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না সে। একটানা বয়ে চলা শব্দটি যেন সবকিছুকে আড়াল করে দিচ্ছে। দূরপথে আসা-যাওয়া মোটরযানের বিকট হর্ণ বা বিমানবাহিনীর সৈন্যনিবাসের অন্য কোনও যান্ত্রিক বিরক্তিকর আওয়াজও পারছে না শব্দটিকে হার মানাতে। শব্দটিকে কানে-মগজে ধারণ করে, দেওয়াল ঘড়ির কাঁটার দিকে তাকিয়ে রানী ভাবছে, অনেকক্ষণ ধরে তো চলছে, এর অবসান কখনই-বা ঘটবে। সে ঠিক আন্দাজ করতে পারছে না এ অত্যাচার কতক্ষণ ধরে চলছে! মনে হয় আফসার বাজারে যাওয়ার আগেই শুরু হয়েছিল। ঘড়ির কাঁটাও ঠিক সন্ধান দিতে পারছে না। কাঁটাগুলো এগিয়ে চলেছে নিজ মনে। এতক্ষণ ধরে তো আমি একটি নির্দিষ্ট চিন্তা নিয়ে ভেবে চলেছি, তাই ঘড়ির কাঁটার দিকে চোখ পড়েনি। ভাবনার সমস্ত জমি জুড়েই তো আমার স্বামী, তার বন্ধু, আর আমার ফেলে আসা অস্পষ্ট স্মৃতির ওপর নির্ভর করা জীবনটি। তিনটি বিন্দুকে কেন্দ্র করে সংযোজকরেখা টানলে যে ত্রিভুজ সৃষ্টি হয় তার মধ্যমণি তো আমিই। আফসারের বাজার যাওয়া আর বাজার থেকে ফিরে আসার সকালের এই সময়টুকুই আমি নিজের মতো করে ব্যয় করতে পারি। আফসার বাজার থেকে ফিরে এলে, অনিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও, আমার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে রান্নাবান্না। আমার চিন্তা রান্নাবান্না নিয়ে নয়। আমার সমস্যা খুব অপরিচিতও নয়। এর আগে এরকম সমস্যা হয়তো কেউ কেউ পেরিয়ে এসেছে। সে পর্দার ফাঁকে বাইরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তার সমস্যার সন্ধান করতে লাগল। বাইরটা একরকম ফাঁকা, যাদের বাজারে যাওয়ার কথা ছিল তারা চলে গেছে, গিন্নীরা হয়তো ইচ্ছে মতো নিজেদের কাজ গুছিয়ে নিচ্ছে, কিন্তু আকাশের দিকে তাকিয়ে রানী নিজেকে নিঃসঙ্গ ভাবছে; অন্যদিন এমনটি হয় না, পরিবেশ এত ফাঁকা থাকে না, ছেলেও অসময়ে ঘুমোয় না। এই নিঃসঙ্গ পরিবেশে রানীর অন্তরে একটি কথাই বারবার আঘাত করছে, কায়সারকে কেন সেদিন স্বামী সম্বন্ধে এত কথা

বলতে গেল, যা একেবারেই তার উচিত হয়নি। খবরটি মুখরোচক, আর এ অবস্থায় যা হয়, নিজের জানা ঘটনাটি অন্যের সঙ্গে ভাগ করে নিতে না-পারলে স্বস্তি পাওয়া যায় না। তবে অজানাকে জানার কৌতূহল যেমনি তীব্র তেমনি ঘটনাকে রটনা করার প্রবণতা পুরুষদের বেলায়ও থাকে, হোক-না তা বন্ধুকে ঘিরে। আবির্ভূত এই চিন্তা রানীকে উত্তেজিত করছে। বাস্তবে আফসার তার কাছে সমস্যা নয়, কায়সারই যেন। কায়সারকে নিয়ে রানী যখন ভাবছে তখনই সকালের নাস্তা শেষ করে কায়সার এসে হাজির হল। রানী চমকে উঠল। চিন্তাকে মাটি-চাপা দিয়ে তাড়াতাড়ি বলল, 'আপনার বন্ধু বাজারে গেছে। এখনই ফিরবে বোধ হয়!' কায়সারের মনে হল আফসার ইচ্ছে করেই বাজার থেকে ফিরতে দেরি করছে। রানীর সঙ্গে তার একান্ত কিছু কথা আছে, সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে সে কার্পণ্য করল না, বলল, 'গত সন্ধ্যায় আমি দেখলাম, সাত নম্বরের নারীটি বিনা কষ্টে দশটি পুরুষকে সেবাদাসে পরিণত করতে। তুমি তো তার চেয়ে অনেক সুন্দরী! একজন পুরুষকে বশে রাখতে পারছো না, এ কেমন কথা। তোমাকে আত্মবিশ্বাসে বলবতী হয়ে, দুর্বলতা দূর করে স্বামীকে জয় করতেই হবে।'

রানীর মিনতি ভরা কণ্ঠ, 'কীভাবে কী করতে হবে তা আমাকে বলে দিন।'

'তোমাকে এখন থেকে সৌন্দর্যের চর্চা করতে হবে। নিজেকে সৌন্দর্যচর্চায় সুন্দর করে বিদ্যুচ্চমকাতে হবে।'

'সন্তানের মা হয়ে সেজেগুজে থাকলে লোকে কী বলবে!'

'লোকে কি বলে তাতে তোমার কী। কেউ যদি কিছু বলে তো বলবে—মেয়েটি বড্ড সুন্দরী।'

'আমি এতশত বুঝি না। আমাকে কী করতে হবে তা সহজ ভাষায় বলে দিন!'

'ঠিক আছে। শোন, আফসার বাড়ি ফিরে আসার আগেই তোমাকে ভালো শাড়ি পরে নিতে হবে। সুগন্ধি আতর মাখতে হবে। ভালোভাবে চুল আঁচড়াতে হবে। মুখে পাউডার মাখতে হবে। তারপর অলঙ্কার পরে তার অপেক্ষায় থাকবে। তোমার জন্য এসব করা অসম্ভব নয়, কল্পনাও নয়। সত্য ও স্পষ্ট বাস্তবতার প্রমাণ পাবে তখনই যখন সে বাড়ি ফিরে তোমাকে হাসিমুখে গ্রহণ করবে।'

'সে করবে? ও তো আমার দিকে ফিরেই তাকায় না।'

‘কে বলেছে তাকায় না! তুমি একজন সুন্দরী নারী, একথা তোমার শত্রুও অস্বীকার করতে পারে না। করাচি জুড়ে তোমার মতো আকর্ষণীয় কয়টি বাঙালি নারী আছে? শোনো, তোমার পরাজিত মনোভাব অবিলম্বে ত্যাগ করতে হবে। তুমি সুশ্রী হয়েও কী এমন বুদ্ধিহীনা হবে যে অন্য-একটি নারীর কাছে হেরে যাবে! আমি তা হতে দিতে পারি না। তোমার সমস্ত বিদ্যাবুদ্ধি কাজে লাগাতে হবে। জয়ী হওয়ার জন্য উপযুক্ত সাজসজ্জায় তুমি যদি কোনও সুফি-সন্ন্যাসীর সামনে এসে দাঁড়াও তাহলে তার ধ্যানও ভেঙে যাবে। এমন কোনও পুরুষ নেই যে, তোমার চলনভঙ্গি দেখার জন্য পিছন ফিরে না-তাকিয়ে থাকতে পারে, আফসার তো কোন ছার!’

আফসার ফিরে আসায় তাদের কথা আর এগুতে পারল না। সে কায়সারকে দেখে জিজ্ঞেস করল, ‘কতক্ষণ হয়েছে এসেছিস?’

স্মিত মুখে জবাব দিল কায়সার, ‘এই তো।’

‘তাহলে চা খাওয়া হয়নি। চল চা খাওয়া যাক।’ কথাগুলো সজোরে উচ্চারিত হল যাতে রানী শুনতে পায়, সেমুহূর্তে রানী তার স্বামীর হাত থেকে বাজারের ব্যাগটি নিয়ে রান্নাঘরের দিকে চলে গিয়েছে।

কিছুক্ষণ পর রানী জানাল, ‘চিনি নেই।’

‘বাজারে যাওয়ার সময় বলোনি কেন?’ বিরক্তসিক্ত কথা, তবুও বন্ধুর খাতিরে চিনির জন্য বেরিয়ে পড়ল আফসার।

কায়সার তার বন্ধু বেরিয়ে যাওয়ার পর রানীকে বলল, ‘দেখো, আমি জানি তুমি তোমার স্বামীকে ভালোবাসো, কিন্তু তোমাকে এও স্মরণ রাখতে হবে যে, অন্তরের ভালোবাসাকে তোমার প্রতিটি কথায়, ব্যবহারে ও কাজে প্রকাশ করতে হবে। প্রীতি অর্জন করার জন্য অন্তরের গোপন বাসনা ফুটিয়ে তুলতে হবে, যার অভাবে তোমাদের দাম্পত্যকলহের মূল কারণ বলে আমার বিশ্বাস। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কলহ, মানাভিমান তো হতেই পারে, যা মিলনখেলার অঙ্গ, কিন্তু মিছে তর্ক করে লাভ নেই, বরং অনুচিতই। তারচেয়ে নিজের ব্যবহার সুন্দর করে তোলো।’

‘কীভাবে?’

‘যেমন বাজারের ব্যাগটি আফসারের হাত থেকে নিতে নিতে তার চোখে চোখ

রেখে মুচকি হাসতে পারতে। ব্যাগের ভেতর লক্ষ্য করে বলতে পারতে—বাহ্! আজ ভালো মাছ এনেছো, এ আমার খুবই পছন্দের, আলুগুলো বেশ তরতাজা ইত্যাদি, ইত্যাদি।’

অবুঝ মেয়ের মতো প্রশ্ন করল রানী, ‘কেন?’

‘এরকম কথায় আফসারের মনকে প্রসন্নোৎফুল করত। সুযোগ হাতছাড়া করলে দোষ কাকে দেবে? এখন থেকে সবরকম সুযোগের সদ্ব্যবহার করবে। বাজার থেকে কী কী জিনিশ আনতে হবে তার লিস্ট তৈরি করে দিবে। বাজার থেকে ফিরে এলে এ-নেই, সে-নেই বলা চলবে না। ঠিক তেমনি পরিবেশকে মলিন করে রাখাও উচিত না। আবর্জনা মুক্ত পরিচ্ছন্ন পরিবেশ রাখা তোমারই কর্তব্য।’

চিনি নিয়ে আফসার ফিরে এসে জানাল, ‘এক বাঙালি ও এক পাঞ্জাবির মধ্যে মারামারি, কিলঘুষি খুব হয়েছে। দুজনই এয়ারম্যান, তবুও সিভিলিয়ান পুলিশ তাদের গ্রেফতার করে নিয়ে গেছে।’ বাংলার ভবিষ্যৎ যে বাঙালির স্বাধীনতার উপর নির্ভরশীল—এ সম্ভাবনায় কায়সারের হৃদয়াকাশের অনেকাংশে কালোমেঘের ভেতর দিয়ে সূর্যালো যেন প্রকাশিত ও প্রসারিত হল। হঠাৎ আফসারের শাদাকালো বিড়ালটি একটি ধূসরবর্ণের ইঁদুরকে মুখে নিয়ে ছাদ থেকে লাফিয়ে তাদের সামনে এসে পড়ল। কায়সার বলল, ‘আমরা যদি সচেতন না হই তাহলে দেখবি বাঙালির অবস্থা হবে বিড়ালের মুখের ইঁদুরের মতো।’ আফসার বলল, ‘বাঙালির অবস্থা ইঁদুরের মতো হোক-বা-না-হোক আমার বাসায় কিন্তু ইঁদুর ও মাকড়সার অভাব নেই।’ আফসারের কথায় তিক্ততা প্রকাশ পেলেও কায়সার নিরুত্তর। আর রানী জানালার ফাঁকে তীক্ষ্ণ ও ধাতব শব্দটির সন্ধান করতে লাগল। ডানে-বাঁয়ে তাকিয়ে অনুমান করল বিমানবাহিনীর সৈন্যনিবাসের একপাশে যে সর্বগ্রাসী কংক্রিটের আরেকটি নতুন দালান উঠছে, শব্দের উৎস সেখানেই, এক নাগাড়ে ওয়েল্ডিং বা সে-ধরনের কিছু চলছে। আর এসব নতুন নতুন গজিয়ে উঠা সর্বগ্রাসী কংক্রিটের বাড়িঘরের জন্য এই শান্ত প্রান্তরটি দিন দিন বদলে যাচ্ছে, এরইসঙ্গে বদলে যাচ্ছে এ-অঞ্চলের অধিবাসীদের পরিচয়টুকুও। আবির্ভাব ঘটছে পাঞ্জাবি, গুজরাতি, পুস্তির। বৃদ্ধি পাচ্ছে গাড়ির, জ্যামের, দূষণের; একইসঙ্গে সুন্দরীর ও অন্যের স্বামীকে ভাগিয়ে নেওয়ার রঙ-বেরঙের পন্থাগুলোর।

জি ন

১.

ধূসর আকাশে কঠিন পাথরের মতো আধখানি চাঁদ নেহাত কর্তব্যের খাতিরে মেঘের ভারি লেপের নিচ থেকে তার অলস মুখটি একটুখানি বের করেই, ক্লান্তি দূর হয়নি বলে, আবার ঢুকে পড়ল পেতনীর ঘনকালো চুলের ভেতর। মেঘ ও অন্ধকার স্রোতের মতো ভেসে চলেছে পৃথিবীর উপর দিয়ে; এই মেঘান্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশে জোনাকি পোকা তো ছাই, তারাগুলোর আত্মপ্রকাশ করাই কঠিন। মেঘান্ধকার দিব্যি ফুরফুরে হাওয়ার ওপর ভর দিয়ে আসমানজমিন সাঁতরে তালগাছের মাথা খোঁজে চলেছে, আর গোপাটের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা নিঃসঙ্গ কলাগাছটি নীরবে আঁকড়ে রয়েছে মাটি ও পানি। চাঁদ উঁকি দিল আবার, সঙ্গে সঙ্গে চাঁদকে নিয়ে বাঁশবনের ফাঁকে কচুরিপানাগুলো লুকোচুরি খেলতে শুরু করল; এ-দেখে বুক থেকে অভিমান ঠোঁটে এনে চাঁদকে গেঁথে ফেলল মেঘ। বাতাস ঝুলন্ত পৃথিবীর শিরা-উপশিরা কাঁপিয়ে দপদপ করে জেগে উঠতেই চাঁদ রাগের মাথায় মেঘের গায়ে নখ আঁচড়াতে লাগল। যত না অভিমান করছে মেঘ তত বেশি ছুটে চলেছে বাতাস। একসময় শুরু হল তাদের মধ্যে ধস্তাধস্তি, ক্ষণে অক্ষণে বিজলির চমক—পেতনীর দাঁত খিঁচুনী যেন। বাতাস আর পানির ঘ্রাণ অগ্রিম পেয়ে মাটির শঙ্কাকুল অবস্থা। অনেকক্ষণ ধরে আকাশের গুম হয়ে থাকা গুমোট ভাবটি কাটিয়ে উঠতে-না-উঠতেই হঠাৎ বৃষ্টি নামতে শুরু করল। সেই থেকে গাছগাছালি আবারও জলখেলায় মেতে উঠল। অকালের বাতাস যত চমকে ওঠে বৃষ্টিও তত ঝুমুর ঝুমুর তাল তুলছে, তারপর বৃষ্টি ও বাতাস একসঙ্গে মাটির ঘরের ঝুঁটি ধরে প্রলয়তাণ্ডবনৃত্য শুরু করল। পাশের বাড়ির মরচে ধরা টুটোফুটো টিনের ওপর আছড়ে পড়া অসংখ্য বৃষ্টিকণার অসহ্য আওয়াজে ছনের ঘরের মধ্যে বসেও বোবা-কালার মতো কা-কা করা ছাড়া উপায় কী! চিৎকার করে কথা বললেও মনে হয় কানের কাছে কে যেন শুধু ফিসফিস করছে, তবুও সিদ্দিক আলীকে কথা বলতে হচ্ছে, 'মাতছ না ক্যানে?' উত্তর পেল না সে। মাটির বিছানা আঁকড়ে-থাকা সিদ্দিক আলীর স্ত্রী স্তব্ধ হয়ে আছে। মনে হচ্ছে, ঘরের কোণে জমে ওঠা অন্ধকারকেও সে ভয় পাচ্ছে, অথবা সে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। সিদ্দিক আলী সন্দিগ্ন দৃষ্টিতে তাকাল আবার। তার কোমলস্নিগ্ধ মনে শঙ্খচিল ঘুরে ঘুরে অবিরাম স্বপ্ন দেখাচ্ছে। তার স্ত্রীর কালো ডাগর চোখের ওপর প্রলেপ মেখে আছে ঘনপালক ঘেরা আঁখিপল্লব, মাথায় ঘোমটা নেই, ঘুমন্ত চোখে শুধুই অদ্ভুত বাস্তবতা, তবে মুখটি খুবই রোগা-রোগা মনে হচ্ছে। না জানি কত কষ্ট পাচ্ছে তার স্ত্রী! সিদ্দিক আলীর মন বলছে যে,

না, এখনও তার চৈতন্য ফিরে আসেনি। একসময় সে হাত বাড়িয়ে তুলে নিল তার স্ত্রীর বাঁ-হাতটি; চুড়িতে মৃদুমন্দ ঝঙ্কার উঠল, তারপর নিঃশব্দ। হাতের ছায়া মিলিয়ে গেল মাটির দেওয়ালে, আর দেওয়ালের অপরপাশে বাতাসের ঝাপটায় একটি সুপারিগাছ ভেঙে পড়ল। সিদ্দিক আলী ঘরের মধ্যে জমে ওঠা অন্ধকারের শাখা-প্রশাখাকে অদৃশ্যে সরিয়ে বর্গা-ধর্ণার সন্ধান করতে লাগল। অন্ধকারের ঘাড় চেপে মেঘ ঝলসে বিদ্যুচ্চমকালো। অট্টহাসিতে ফেটে পড়া বাদলের ভারে আকাশ ভেঙে পড়ল উঠোনে যেন। তাড়াতাড়ি সিদ্দিক আলী দৃষ্টি ফিরাল তার কোমলকুসুমনয়না স্ত্রীর দিকে, হয়তো অল্প পরেই তার জ্ঞান ফিরবে। পুরো না-হলেও অর্ধেকটা স্বস্তি বোধ করল সে। এইটুকু করতে কী না দাপট গেছে তার স্ত্রীর রক্তমাংসের ওপর দিয়ে, এ-যেন ছিল দেবতা আর দৈত্যের লড়াই, বাতাস আর মেঘের তুফান, দুর্বল আর শক্তির যুদ্ধ—সত্যিই তাই। প্রেতাত্মা ভর করেছিল তার স্ত্রীর দেহ জুড়ে, একেবারে টায়টায় ভর। একাজে অবশ্য আকমল মোল্লার নাম-ডাক আছে—একথা জেনেই সিদ্দিক আলী দৌড়ে গিয়েছিল তার কাছে। প্রথমে তিনি আসতে চাননি, রাতের আঁধারে নদী পাড়ি না-দেওয়ার অজুহাতে; পরে চুন-জর্দা মিশানো পান খেতে খেতে লোভী কাকের মতো বৃষ্টি মাড়িয়ে, বাতাস গলিয়ে, বাঁশবনের ব্যাঙের ডাক এড়িয়ে, হাসিখুশি মুখে এসে উপস্থিত হলেন। রোগিণীর দেহের পাশে একটি প্রদীপ টিপটিপ করে জ্বললেও আবছা অন্ধকার নিঃশব্দে ঢেউ তুলছে, আধা-আলো আধা-আঁধারে মুখটি ভালো করে দেখা যাচ্ছে না। মোল্লাজি মাটির বিছানায় পা গুটিয়ে বসে রোগিণীর দেহকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করে বললেন, 'প্রেতাত্মা, জিন কাবু করিতে সময় লাগিবে।' সিদ্দিক আলী নিশ্চুপ, শুধু তার দুটো চোখ দরজার ফাঁকে বাইরে ঘুরতে লাগল। একসময় সে দেখতে পেল, কোঁকড়ানো কালোমেঘের ঝাঁক চাঁদকে আগলে রেখেছে, বাতাস দরজার পাল্লার সঙ্গে হোঁচট খাচ্ছে। সেখান থেকে দৃষ্টি ফিরাতেই দেখতে পেল, রোগিণী জোরে জোরে নিশ্বাস নিচ্ছে; তবে বুঝতে পারছে না, কেমন করে যেন একটি অচেনা গন্ধ এগিয়ে আসতে লাগল। মোল্লাজি তার শকুনি দৃষ্টি রোগিণীর দেহে স্থাপন করে বললেন, 'আইনজা করিয়া ধর সিদ্দিক আলী। জিনকে বশীভূত করিতে হইলে শক্তি লাগাইতে হইবে স্বৈরাচারি শাসকের মতন।' সিদ্দিক আলীর বুক টনটন করে উঠল, তার চোয়ালের হাড়গুলো ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাচ্ছে। মোল্লাজি আবার বললেন, 'নিকটে আসিয়া বহ্, পিছন থাকিয়া নেউলের মতন আঁকড়াইয়া ধরো।' তার স্ত্রীকে শোয়া অবস্থা থেকে নির্দয়ভাবে সিদ্দিক আলী একটানে বসিয়ে দিল। তারপর তার লৌহকঠিন হাতে তার স্ত্রীর উরসের

মাঝেখানের ত্রিবলি খামচে ধরল; সঙ্গে সঙ্গে তার মাথার মধ্যে ঝলসে উঠল অন্যের শরীর ভোগ করার একরকম টসটস ভাব। মোল্লাজি জিনে ভর-করা গৃহবধূর মসৃণ কেশগুচ্ছ আলতোভাবে বুলিয়ে বিড়বিড় করে মন্ত্রপাঠ করতে লাগলেন, তারপর কানের কাছে নাক এনে পরের জিনিশ ভোগ করার গন্ধটি শুঁকে বললেন, 'তেরি নাম কিয়া হে?' মোল্লাজির মুখ থেকে বেরিয়ে আসা বকবক গন্ধ রোগিণীর মাথাকে বিগড়ে দিল, বলল, 'আমেনা।' মোল্লাজি এবার আবিষ্কার করলেন আমেনার সঙ্গে আলাপ করার গোপন পন্থা। কুটিল নজর রোগিণীর জড়ুলখানায় স্থাপন করে ধ্বনিহীন বাক্যে, অপ্রকাশ্যে, বললেন, ভালই হইয়াছে, এবার জিনের সন্ধান করিতে অসুবিধা হইবে না। তারপর প্রকাশ্যে বললেন, 'তেরি নিকট থাকিয়া কয়েকটি তথ্য জানিয়া লইতে চাহি। সত্য, সত্য ফরমাইতে হইবে। বলিয়া দাও, তেরি আসল নাম কিয়া হে?' উপেক্ষিত নারী আবারও বলল, 'আমেনা।' বাকবাকুম আর বাকবাকুম। মোল্লাজি রোগিণীর সঙ্গে কথার চরকা কেটে চললেন। সিদ্দিক আলীর বুকের ওমে আমেনার শরীর গলতে শুরু করলেও মন আপোস মানতে নারাজ; আর মোল্লাজি মনমতো উত্তর না-পেয়ে চিত্তবিকার-বিক্ষেপে ক্ষেপতেই লাগলেন; তিনি প্রমাণ করতে বদ্ধপরিকর যে, জিনের সঙ্গে আলাপ করছেন, আমেনার সঙ্গে নয়। শুধু ভর্ৎসনা বা কটুবাক্যই নয়, তার মন চঞ্চল হয়ে উঠেছে আমেনাকে নির্মমভাবে প্রহার করার জন্য। মোল্লাজি অসহায় সিদ্দিক আলীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'যেমনি করিয়াই হউক আজি রাত্রি জিনকে তাড়াইতে হইবে। শরীরে কিলগুতা বসাইলে জিন এমনি এমনিই কাটিয়া পড়িব।' সিদ্দিক আলীর মুখে চিন্তার ছাপ, প্রদীপের আলো ও ছায়া ষোলকটি কাটতে লাগল তার চওড়া কাঁধে, হাতের পেটানো পেশিতেও; তবে বিষণ্ন কিন্তু গভীর চোখে তাকিয়ে রইল মোল্লাজির দিকে। বৃষ্টিভেজা রাতে স্যাঁতস্যাঁতে হাওয়ার মধ্যেও তার পেটানো বুক স্বেদে সপসপ করছে, রোগিণীর শরীরে আলাদা তাপ তাই হয়তো, তবুও সে একবার আড়চোখে দেখে নিল তার হাতের মধ্যে বন্দী থাকা থরথরে কালোছায়াটিকে। আমেনার দেহলতা দারুণভাবে শক্ত হয়ে উঠেছে, এমনকি প্রকৃতির বিবর্তনে নিপুণতায় গড়া তার উরসিরুহ-দুটোও নড়তে চাচ্ছে না, তার গালও না; সেই গালে মোল্লাজির নির্দেশে সিদ্দিক আলী চড়থাপ্পর বসাল। অত্যাচার সহ্য করতে না-পেরে আমেনার চোখ দিয়ে বেরিয়ে এল কয়েক বিন্দু জল, যেন বেদ্বীন জিনের কাতর আর্তনাদ। আমেনার পাশে বসা মোল্লাজি হঠাৎ কিছুটা টানাটানা ও কর্কশ স্বরে হেসে উঠলেন। হাসি থামলে আড়চোখে আমেনার বুকের স্ফুটনোন্মুখ দুটো চুচুকের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বলিবা না? তোমাকে

বলিতেই হইবে।' আর অস্পষ্ট ভাষায়, অর্থাৎ মনে মনে, আমেনাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, না বলিলে আজি রাত্রি তোমার যোনিরস চুষিয়া খাইব। কিন্তু কথাগুলো কোনও মতেই তার ঠোঁটের ফাঁকে বেরিয়ে এল না, বরং তার কণ্ঠ এর আগেই থেমে গেল। তাকে নেশায় পেয়েছে, মাগির নেশায়; তার ছোটো ঘোলাটে চর্মচক্ষু-দুটো ঘোর স্পন্দনে জেগে উঠল আবার। মোল্লাজির ব্যবহার প্রত্যক্ষ করে সিদ্দিক আলীর হৃৎপিণ্ড দ্রুতলয়ে নাচতে লাগল, কিন্তু মুখে কিছুই প্রকাশ পেল না, বরং আমেনাকে দেখতে দেখতে একটু-আর্ধেকটুকু উষ্ণতা ক্রমশ সঞ্চয় হতে লাগল তার শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। রূপসীর দেহলতা কেমন যেন বিচিত্র চিরন্তনভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে তার চোখে, তাই হয়তো সে দাঁত দিয়ে এমুহূর্তে আমেনার কপোলকে কামড়ে ধরতে চাচ্ছে, কিন্তু পারল কই, বরং তার চমক ভাঙল যখন মোল্লাজি মিনমিন করে বলতে লাগলেন, 'নাম তোমারে বলিতে হইবে, নইলে তোমার গভীরে অনুপ্রবেশ করিয়া জিনের জাত মারিয়া দিমু সুন্দরী।' সিদ্দিক আলীর কাছে এ-যেন আকাশ ফাটা কথা, বজ্রপাত। যদিও মোল্লাজির মুখে পরম আনন্দের একরকম তৃপ্তির হাসি প্রকাশ পাচ্ছে, তবুও সিদ্দিক আলী নিথর পাথর যেন, প্রতিবাদের সব ভাষা তার কাছে অজানা।

২.

ডিমডিম প্রদীপশিখা জ্বলছে সিদ্দিক আলী ও আমেনার মাঝখানে। আমেনাকে এই ক্ষীণ প্রদীপের আলোতে কেমন যেন ছায়া ছায়া লাগছে। সিদ্দিক আলী গোপনে প্রদীপটি আরও কাছে এনে আমেনার মুখের দিকে তাকাল। তার ঠোঁটের ফাঁকে লেপটে আছে ঘন ফেনার ছটা; এই ফেনা বেয়ে, পৃথিবীর চোখ বেয়ে পরাজয়ের গাঢ় অন্ধকার নেমে এসেছে সিদ্দিক আলীর চোখে, তবে একইসঙ্গে কৌতূহলের সুস্পষ্ট রেখাটিও ভেসে উঠেছে যেন আমেনার অবিন্যস্ত কুন্তলদলে। ঘর নিঝুম, আকাশ নিঝুম, বাঁশপাতা নিঝুম, তবে বাঁশবনে ব্যাঙের দল সুর তুলেছে আবার, ঘ্যাঙোর ঘ্যাঙোর; ডুবাজলে মাছের লাফালাফি চলছে সফাৎ সফাৎ; এসব শব্দের মাঝেই, ঘরের ভেতরকার জগৎটি অচেনা হয়ে উঠেছে সিদ্দিক আলীর কাছে। সে মাটিতে বসে তার কাঁধ থেকে লাল-সবুজ গামছাটি সরিয়ে নিয়ে, এর খুট দিয়ে আলতোভাবে আমেনার মলিন মুখ মুছতে লাগল। ঘরের আবছা-আচ্ছন্ন অন্ধকারও তার আহ্লাদের ঝিমঝিম ভাবটি উপলব্ধি করছে। আমেনার বুক থেকে শাড়ি সরিয়ে এই বৃষ্টিভেজা রাতে জোরে

জোরে তালপাতার পাখা দিয়ে হাওয়া দিতে লাগল, তাকে শান্ত করার চেয়ে, মনে হচ্ছে, নিজের পরাজয়কেই প্রশান্তির প্রলেপে ঢেকে দিতে চাচ্ছে। একসময় তার অন্তর যখন একটু শান্ত হল তখন সে লুঙ্গির খুট থেকে দিয়াশলায়ের একটি বাক্স বের করে কানের পাশে গুঁজে রাখা বিড়িতে আগুন ধরাল। তারপর বিড়ি টানতে টানতে আমেনার পাশে উবু হয়ে বসে চুপিচুপি ডাকল, 'আমেনা, উটছ্ না!' কোনও সাড়াশব্দ নেই, তবুও শান্তনরম চোখে তাকিয়ে রইল। একটু গভীর, একটু করুণ দেখাচ্ছে আমেনাকে। তার বুকে হাত রেখে নিঃশব্দে একগুচ্ছ ধোঁয়া ছাড়ল। হঠাৎ, অজান্তেই, দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে এল। নিবে গেল তার বিড়ির আগুন। সিদ্দিক আলী মনে মনে বলল, না, অকনও[১] আমেনার হুঁশ অইছে[২] না। তাক, পরিয়া তাক। হুঁশ অইলেই[৩] জাগিয়া উটব। নিজেকে সান্ত্বনা দিল। সময় এগুতে লাগল। জিনের হাত থেকে ছাড়া পাওয়া যে কী দারুণ ব্যাপার তা আজ সিদ্দিক আলী স্বচোখে দেখেছে। শুধু কী তা-ই, নিজের হাতে গরম করে নিয়েছিল একটি লাল মরিচ, সরষে তেলে ডুবিয়ে। পেশিতে শক্তি সঞ্চয় করে আমেনার নাকের কাছে কোনও রকম তুলে এনেছিল, কিন্তু আর অগ্রসর হতে পারেনি। যতবার চেষ্টা করছিল ততবারই তার হাত কেঁপে উঠছিল। অগ্রসর হতে পারেনি বলেই হয়তো মোল্লাজি ধমক দিয়ে বলেছিলেন, 'আহা, মায়া করিলে চলিবে না। ও এখন তোমার স্ত্রী নহে। জিন। বুঝিলা—আসল জিন।' তবুও পারেনি সিদ্দিক আলী। সে নির্বিকার। তার মুখ পাংশু হয়ে ওঠে। মনে মনে বলল যে, শেষ পর্যন্ত কী আমার ভাগ্যে ছিল অন্যের আদেশে আমেনার ওপর অত্যাচার চালানো। মোল্লাজি মরিচটি কেড়ে নিয়ে নির্মল হাসি হেসে বললেন, 'তুমি বাহিরে যাও। আমাকে বহু কঠিন কঠিন ব্যবস্থা লইতে হইবে। তুমি সহিতে পারিবে না।' সিদ্দিক আলীর নিপাটনগ্ন বুকে মোল্লাজি যেন শাবল মেরে থেঁতলে দিলেন। মখমলের মতো ব্যথা নিঃশব্দে আঁচড় কাটতে লাগল তার হাড়ের নিচে; চিড়চিড় করে উঠল তার অন্তরাত্মা। সে জানে, জিন বল বা ভূত বল কোনওটাই ছাড়ানো চাট্টিখানি কথা নয়, তবুও চোট সামলাতে হচ্ছে মোল্লাজিকে। কিছু না-বলে যন্ত্রচালিতের মতো ঘর থেকে বেরিয়ে এল সিদ্দিক আলী; সঙ্গে সঙ্গে একঝলক দমকা হাওয়া লাফিয়ে ঢুকল ঘরের মধ্যে, চারদিক ভরে গেল ভেজা মাটির সোঁদা গন্ধে। দরজা বন্ধ করতে করতে সিদ্দিক আলী একবার অসহায়ভাবে উঁকি দিল মোল্লাজির দিকে।

১. এখনও।
২. হয়নি।
৩. হলেই।

মোল্লাজির চুলগুচ্ছ, আমালদামাল বাইরের বাতাসের মতো, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে তার ঘাড় ও কাঁধ জুড়ে। মোল্লাজি একহাতে কাঁপা প্রদীপ ধরে, অন্যহাতে প্রদীপশিখাকে বাতাসের ছোবল থেকে বাঁচিয়ে রাখতে চেষ্টা করছেন। এরই নিচে আমেনার দেহখানা যেন আখনপাতার মতো বিধ্বস্ত। মুখটি গভীর অন্ধকারের অতলে। অন্ধকারে ছেয়ে গেছে তার পেছনও। দরজা বন্ধ করতেই শিকল ওঠার শব্দে সিদ্দিক আলীর পা-দুটো যেন বরফ হয়ে গেল; সঙ্গে সঙ্গে দাওয়ার বাঁশের খুঁটিতে হেলান দিয়ে নীরবে বসে পড়ল। তার নীরবতা ভাঙল অজানা এক আতঙ্কে, কেঁদে ওঠার শব্দে। মানুষের এত কান্না কোথায় জমা থাকে? অবিরত ক্রন্দনেও যেন তার চোখের অশ্রু ফুরোয় না, কিন্তু কান্নার শব্দ যেন মোল্লাজির কানের পর্দা ভেদ করতে অক্ষম। বাইরে হাওয়া ও বৃষ্টির যুদ্ধ ঠিকই চলছে। এরইসঙ্গে শুরু হয়ে গেল মোল্লাজির একের-পর-এক পরীক্ষানিরীক্ষা, জিন তাড়ানোর সুব্যবস্থা, জানা-অজানা পন্থাগুলোর প্রয়োগ। ফুটন্ত সরষে তেলে ডুবানো আরেকটি লাল মরিচ স্বহস্তে তুলে নিয়ে আমেনার নাসারন্ধ্রে ঢুকিয়ে দিলেন মোল্লাজি, 'বিসমিল্লাহ' বলে। হালকা চিৎকার উঠতেই বাঁ-হাতের পাঁচ আঙুলে মোল্লাজি ঝাঁপটে ধরলেন আমেনার মূর্ধজগুচ্ছ, তারপর হেঁচকা-টানে গায়ের সর্বশক্তি প্রয়োগে আমেনাকে ঝাঁকতে লাগলেন। মাথার ব্যথায় অস্থির হয়ে উঠল আমেনা, উঃ-আঃ করতে লাগল। এই অস্থিরতাকে কাবু করতে মোল্লাজি হাঁটু স্থাপন করলেন আমেনার নেতিয়ে পড়া উরুসন্ধিতে। আমেনা বাঘিনীর দৃষ্টিতে জরিপ করতে লাগল মোল্লাজিকে, একইসঙ্গে তার আলামতকেও। আমেনার শরীরের লোভে আগমনলগ্ন থেকেই শেয়ালের মতো জিভ বের করে ঝুঁকে আছেন মোল্লাজি। সুরমাটানা চোখ-দুটো পলকহীন, রমণীর দেহকে শুধু চাখছে। মোল্লাজি বারংবার বলা সত্ত্বেও আমেনা রাজি হচ্ছে না নিজেকে জিন বলে স্বীকার করতে, তাই মোল্লাজি নিজের রাস্তা ধরে আমেনার ঘাস-মাটি সব হাতিয়ে নিতে ওঠেপড়ে লেগে গেলেন। আমেনার মনের মধ্যে ঘোড়দৌড় চলছে; সে তার শাড়ি দিয়ে চাঁদের মতো অর্ধকলা নাভিকে রক্ষা করার চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে কই; কারণ মোল্লাজি পরমযত্নে তার দেহকে মাটির শয্যায় গেঁথে নিয়েছেন। আড়াই-হাতের মোল্লাজির মাথায় আড়াই রকমের মতলব গজগজ করছে; তার মতিগতিও কেমন কেমন যেন; একারণেই হয়তো তিনি ধস্তাধস্তিতে ঘেমে উঠেছেন। মোল্লাজির লুঙ্গিতে ঢেউ তোলা নানারকম অদৃশ্য তরঙ্গ আমেনার শরীরে এসে ধাক্কা লাগছে, সে ঠিকই বুঝতে পারছে ঘাসফড়িং হয়ে তিনি তাকে চেটে নিতে ব্যস্ত। আমেনার চোখ-দুটো, মোল্লাজিকে ছুঁয়ে, তার স্বামীর সন্ধানে ব্যস্ত, কিন্তু কোনও পাত্তা পাচ্ছে না; তবে

মোল্লাজি তার কাজে অটল, তিনি কোলাব্যাঙের মতো গলার স্বর করে বললেন, 'তুহি আমেনা না। তুহি কালাচাঁন জিন।' মোল্লাজিই ঠিক। আমেনা এখন আর আমেনা নয়। আমেনার শরীরে ভর করেছে কালাচাঁন জিন, তবুও এই দেহ যে তার। দাওয়ায় বসে থাকা সিদ্দিক আলী তার স্ত্রী যে কষ্ট পাচ্ছে তা আর সহ্য করতে পারছে না। এমন অত্যাচার কী মানুষ সহ্য করতে পারে? অথচ তার কিছুই করার উপায় নেই। নিজের নিরুপায় অবস্থার জন্য আপনা থেকেই তার চোখের পাতা ভিজে উঠল আবার। তার মুখে বেদনার ছায়া, দমবন্ধ হয়ে আসা অবস্থা যেন। তার স্ত্রীর উপর যে অত্যাচার চলছে তা সহ্য করতে না-পেরে সে তাড়াতাড়ি দাওয়া ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল, খোলা আকাশের নিচে বৃষ্টি আর বাতাসের যুদ্ধে নিশ্বাস ছেড়ে বাঁচতে। বৃষ্টিভেজা হাওয়ার বেসামাল ধাক্কায় কেমন যেন হালকা বোধ করল সে। দাওয়ার কাছে ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন একটি ছোট্ট মাটির ঘর, খোলা দরজা; এর ভেতর ডানার আশ্রয়ে বাচ্চা নিয়ে ঝিমুচ্ছে একটি মুরগি; আর এর সামনে জলেভেজা, দাঁড়িয়ে থাকা, বুকের পাঁজর বের করা কুকুরটি, মন্থরগতিতে চলা একজোড়া পায়ের আওয়াজে মুখ তুলে তাকাল। অন্ধকার সিদ্দিক আলীর চোখে ধাঁধা ধরিয়ে দিয়েছে। সে দেখে, কুকুরের চোখে ক্রোধের আগুন, যেন তেলসিক্ত লাল মরিচ—শয়তানের ত্রিশূল; এরইসঙ্গে ভেসে উঠল ছিলিমে রাখা একটুকরো জ্বলন্ত আংরা, তার বিপদ ও মনের অস্থিরতা কাটিয়ে নেওয়ার আহ্বান যেন। সিদ্দিক আলীর মনের কথা বুঝতে পেরে কুকুরটি তার মুখ ফিরিয়ে নিল; তবে উঠোনের অন্যপাশে অভাবী সংসারকে সারাদিন একা একা টেনে ক্লান্তির ভারে পাটিতে রাঙাবৌ শোয়ে আছে, পাশে তার ছেলে, অবশ্য তার স্বামী সদরে। কী করবে ভেবে পাচ্ছে না সিদ্দিক আলী। ভাবীর ঘরে গিয়ে এক ছিলিম তামাক চেয়ে নেবে কী! আমেনার আর্তচিৎকার ভেসে এল সিদ্দিক আলীর কানে আবার। তার বুকের মধ্যে কাদা মাটিতে মটোরগাড়ির চাকা যেমনি দাগ কাটে তেমনি ব্যথার আঁচড় কাটতে লাগল, শরীরও কাঁপছে। জিন তাড়ানোর সবচেয়ে কঠিন-কঠোর ব্যবস্থার বোধ হয় প্রয়োগ করা হচ্ছে। জিন যত বেয়াড়া ততই মোল্লাজিকে তেড়ে উঠতে হচ্ছে। বেশরম জিনের জাত। যেমনি কুকুর তেমনি মুগুর প্রয়োজন—নইলে কী চলে! কার্যসিদ্ধি নিয়ে কথা। আকাশ-পাতাল আবারও মাতাল হয়ে উঠেছে, ঝড়-বৃষ্টির তাণ্ডব খেলা চলছে। সিদ্দিক আলী এলোপাতাড়ি পা ফেলে ছিলিমের সন্ধানে এগিয়ে এল। পৃথিবী অশান্ত—চাল উড়ছে, গাছ ভাঙছে। সর্বনাশের এই আতঙ্কে রাঙাবৌ তার ছেলেকে কাঁথায় আঁকড়ে ধরে দরজা খুলে দিল। প্রকৃতি থাবা মেরে ভেঙে দিল গরুহীন গরুঘরের বেড়া, ডুবিয়ে দিল যে-পথ মাড়িয়ে

সিদ্দিক আলী একটু আগে এসেছিল সেই পথ। সে বন্দী হল বৃষ্টিজলরাশিতে। অন্য-পথের সন্ধান না-জানা দিশেহারা সিদ্দিক আলী মুখ থুবড়ে বসে রইল রাঙাবৌয়ের ঘরে। একসময় ছিলিমের সন্ধান পেল। অন্যদিকে বুকে বুক, হাতে হাত, ঊরুতে ঊরু, তবে মুখে মুখ লাগিয়ে স্বর্গোদ্যান বিচরণ করতে যতই চেষ্টা করছেন মোল্লাজি ততই আমেনা মাথা সরিয়ে নিচ্ছে, শুরু হল আবারও ধস্তাধস্তি, কোস্তাকুস্তি। অতৃপ্ত, বঞ্চিত, অপূর্ণ রতিক্রিয়ার ক্ষোভে মোল্লাজির প্রকৃতির উপাদান গোপন অঙ্গটি আমেনার ঘরের মধ্যে বসবাসের সন্ধান করতে না-পেরে বাইরে প্রবলভাবে মাথা কুটে মরছে। ঊরুসন্ধির তৃণরোমে আগুনের অজানা দহন অনুভব করে আমেনা থরথর করে কেঁপে উঠল; তার নাভিমূলও। আত্মার মধ্যে সমস্ত সৃষ্টিকে ধ্বংস করে দেওয়ার একটি আকাঙ্ক্ষা রচিত হতে-না-হতেই আমেনা ঝাঁপ দিল স্বামীর সঙ্গে মিলনের স্মৃতিতে, রোমাঞ্চকর উন্মাদনায়। বুক কম্পিত, উরু উত্তপ্ত, মন দ্রোহাচ্ছন্ন। আর তার হৃদয়ে রণহুংকার, মাথায় সূর্যের চেয়েও তেজি বিদ্যুচ্চমক, এটমে এটমে আলোড়ন যেন। বাইরে যতই প্রকৃতি তর্জনগর্জন করছে না কেন ভেতরে কিন্তু একসময় সবকিছু থেমে যায়, শেষ পর্যন্ত জিনই হাল ছেড়ে দিল। আমেনার ইচ্ছের বিরুদ্ধে তার শরীর দখল করে নিয়েছেন মোল্লাজি। জিনসাধকের শক্তির সঙ্গে পেরে ওঠা কী রমণীর কর্ম! তাই তো জ্বলন্ত কয়লায় পোড়া লাটিমাছের মতো ব্যথায় মোচড়ে উঠতে লাগল আমেনা। সে চিৎকার করল, কিন্তু কণ্ঠ ফুটল না; শুধু তার মন বলতে লাগল, ঘরের বাইরে শোয়া কুকুরের চেয়েও অপবিত্র এই মোল্লাজি; তবে তার মনের কথা মুখে প্রকাশ করতে পারল না, তাই হয়তো তার বুক ফুলে উঠেছে। 'এর মধু পান করিয়াই আমি তোমাকে জিনের হাত থাকিয়া রক্ষা করিব।' কথাটি মোল্লাজির মনে উদয় হতেই তার পেশিতে রক্তপ্রবাহ দ্রুত থেকে দ্রুততর হতে লাগল। মোল্লাজির অদম্য শক্তির কবলে আমেনার দেহের প্রতিটি ভাঁজ আস্তেধীরে স্বর্ণলতার মতো নেতিয়ে পড়তে লাগল; কিন্তু তার নাসারন্ধ্র দিয়ে প্রবাহিত হতে লাগল উষ্ণ নিশ্বাস, আগুনের স্ফুলিঙ্গ যেন। একসময় মোল্লাজির দেহের চাপ শীতল হয়ে এল। শক্তির বেগ কমে গেল। আবেশ ছড়িয়ে পড়ল তার দেহ জুড়ে। স্খলনের আনন্দপ্রবাহের সফলতায় মোল্লাজির ঠোঁটে তৃপ্তির দুষ্টু হাসির তরঙ্গ ভাঙতে লাগল। এরই একটি তরঙ্গ মুখে ধারণ করে মোল্লাজি ফিসফিস করে বললেন, 'সর্বসময় আমি তোমারে রক্ষা করিব। জিন তোমারে আর ধরিতে পারিবে না। আমার রস ধারণ করিয়া তুমি পরিপূরক হইয়াছ। তৃপ্তির পূর্ণতা লাভ করিয়াছ।' একইসময় পুকুরের পাড় ডুবুডুবু করে পৃথিবী শান্ত হল, পাড়ার ছাগলপাল কান্না থামাল; তবে সিদ্দিক

আলীর দাওয়ার চাল উড়ে গিয়েছে, হা-হা করছে, যদিও ছনের কোনও দোষ ছিল না, দিন কয়েক আগেও সে শক্তহাতে মেরামত করেছিল, বেঁধেছিল ঝাউবেত দিয়ে, তার ওপর ছেঁড়া মাছধরার জালটিও ছড়িয়ে দিয়েছিল। এরইমাঝে সিদ্দিক আলীর দাওয়ার কুকুরটি আশ্রয় নিয়েছে অন্যের দাওয়ায়। অবশ্য মুরগিটি তার বাচ্চাসহ বন্দী অবস্থায় এখানেই রয়ে গেল; আর উড়ে যাওয়া চালের নিচে আমেনা যে খিড়কিপথে এটা-ওটা ফেলত সেদিকে সিদ্দিক আলী, ঘন অন্ধকার আঁকড়ে থাকা, বিস্ময়ভরা, নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে রইল। বাতাসের দাপটে রান্নার হাঁড়িতাগার ঘটিবাটি সিঁকের মধ্যে আত্মগোপন করেও যখন রক্ষা পায়নি তখন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়েছে এখানে সেখানে। সিঁকেতে যত্ন করে তুলে রাখা মেহমানদের জন্য চীনা মাটির দু-খানা বাসনও দরজার সামনে পড়ে টুকরো টুকরো। এদেরকে পাশ কাটিয়ে মোল্লাজির অন্তরের মতো শূন্যদৃষ্টিতে সিদ্দিক আলী ঘরে ঢুকে দেখল আমেনা মুখ থুবড়ে পড়ে আছে পাটির একপাশে, লাশ যেন। আমেনার শাড়ি ছিন্নভিন্ন, যেন ঝড়ের পর কলাপাতা। প্রথমেই অনাবৃত দেহাংশ ঢেকে দেওয়ার চেষ্টা করল সে, শরমের ছোঁয়া তার নিজের চোখেমুখে যেন লেপটে আছে; কিন্তু সাফল্যের হাসির বান ভাঙতে লাগলেন মোল্লাজি। হাসি যখন একটু থামল তখন তিনি তার ভাঙা দাঁত বের করে বললেন, 'আর ভাবনা নাহি। অনেক কষ্ট করিয়া জিনটাকে বিদায় করিয়াছি।' কথাগুলো বলে মোল্লাজি আড়চোখে তাকালেন সিদ্দিক আলীর চিন্তিত মুখের দিকে। 'কিতার লাগি আমেনারে জিন আছর করচিল?' সিদ্দিক আলীর কথায় তার মুখে মৌল্লাজি অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে কী যেন খুঁজতে লাগলেন! কিন্তু সেখানে মান-অভিমান, দুঃখ-রাগ কোনও কিছুরই আভাস পেলেন না তিনি, তাই হয়তো তার মুখ গলিয়ে চোখ গিয়ে ঠেকাল উঠোনের অন্যপাশে—হেলে পড়া লেবুগাছের ছায়াটির উপর। ঘরের ভেতর থেকে, অন্ধকারের মধ্য দিয়ে, গাছটির মাথা চোখে পড়ল না, পড়লে হয়তো দেখতে পেতেন লেবুগাছটি ফুলে ভরপুর ছিল, ঝড় ও বৃষ্টির দাপটে ঝরে পড়েছে। প্রদীপের আলোতে ঋজু কাণ্ডটিও দেখা যাচ্ছে না, গুড়িতে ছড়িয়ে থাকা ঝরাপাতাগুলোও না। মোল্লাজি সেদিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে সিদ্দিক আলীর উপর স্থাপন করতেই দেখতে পেলেন, সে মুখ যেন আস্তেধীরে কঠোর হতে শুরু করেছে। মোল্লাজি নিজের মনের কথা গোপন রেখে প্রকাশ্যে বললেন, 'জিনের মতে, হানজাবেলা[৪], বাঁশবনে তাহার সঙ্গে তোমার স্ত্রীর মহব্বত হইয়া ছিল।' আহত অভিমানে সিদ্দিক আলী বলল, 'অখন কিতা অইব।' মোল্লাজি বললেন, 'চিন্তার কোনও কারণ নাহি। নাকে খৎ দিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া গিয়াছে যে, সে

আর কোনও দিন এই তল্লাটে আসিবে না। তবুও বলিয়া রাখিতেছি, ভবিষ্যতে আমার প্রয়োজন পড়িলে আমারে ডাকিতে দ্বিধা করিও না।' এসব বলতে বলতে মোল্লাজি বিদায় নিতে উদ্যত হলেন, আর তখন সিদ্দিক আলী তার গায়ের রক্ত পানি-করা বহুদিনের প্রচেষ্টায় জমানো টাকাগুলো তার হাতে তুলে দিল। মোল্লাজি কাঁপা হাতে দোয়া করে, পকেটে টাকাগুলো গুঁজে, মিলিয়ে গেলেন ঝড়বৃষ্টির প্রলয় শেষের অন্ধকারে।

৩.

ঘণ্টা কয়েক আগের ঘটে যাওয়া ঘটনাটি ছবির মতো সিদ্দিক আলীর মনের পর্দায় ভাসতে লাগল। তন্ময়ভাব কেটে গেলে সে আবার তাকাল আমেনার দিকে। মাত্র এক বছর আগে, আমেনার বাপের ঘাটে পঁচা-পাট ছাড়ানোর জন্য বোঝাই করা নৌকা থেকে ভিজে পাটের আঁটিগুলো গুনে গুনে তুলে দিচ্ছিল সিদ্দিক আলী। তখনই সে লক্ষ করছিল যে, ষোড়শী আমেনা পাটশলার আড়ালে বসে কী যেন করছে। সূর্য তার আভা দিগন্তব্যাপী ছড়িয়ে দিয়ে জেগে উঠেছিল কিছুক্ষণ আগে। আমেনাকে সেই আলোতে আধখানি চাঁদের মতো মনে হচ্ছিল সিদ্দিক আলীর কাছে। গরিবের ঘরে আনন্দ আসে ঈদের দিনই শুধু, তবুও আমেনাকে ঘরে তুলে আনার পর, গত এক বছর ধরে, সিদ্দিক আলীর সংসারে আনন্দের কোনও অভাব হয়নি। আমেনার চাঁদমুখ মলিন হয়নি একদিনের জন্যও। আজ সেই মুখে বিষাদের রেখা স্পষ্টভাবে ভেসে বেড়াচ্ছে। কপালে হাত দিয়ে সিদ্দিক আলী বুঝল আমেনার শরীর গরম। কাঁথা দিয়ে গলা পর্যন্ত ঢেকে দিয়ে নিবে যাওয়া বিড়িতে আগুন ধরিয়ে ঘনঘন টানতে লাগল সে; কিন্তু তার দৃষ্টি আমেনার উপরই স্থির। হঠাৎ আমেনার চোখের পাতাগুলো কেঁপে উঠল, ঠোঁটও মৃদুমন্দ নড়তে লাগল। একসময় আস্তেধীরে চোখ-দুটো খুলে আমেনা তাকাল। মুখের কাছে মুখ এনে সিদ্দিক আলী প্রশ্ন করল, 'কিলাকান[৫] লাগতাছে? কষ্ট অইতাছে বুজি?' সন্দিহান চোখে পালটা প্রশ্ন করল আমেনা, 'ইবলিসের পোয়াটা গেছেগি?' জিন না মোল্লাজি কার কথা—ঠিক ঠাহর করতে পারল না সিদ্দিক আলী, তবুও আমেনাকে আশ্বস্ত করার জন্য বলল, 'এককুইবারে গেছেগি। হারা জীবনের লাগি বিদায় অইছে। যাইবার

৪. সন্ধ্যাবেলা।
৫. কেমন।

সময় ঐ কতাই কইয়া গেছইন মোল্লাজি।' আমেনার ঠোঁটের কোণে গোপন হাসির ঝিলিক উঠল; সেই হাসি দেখে সিদ্দিক আলী আশ্বস্ত হল, জিন ঠিকই আমেনাকে ছেড়ে পালিয়েছে। সে সস্নেহে আমেনার শরীরে হাত বুলাতে লাগল। দুজনই নিশ্চুপ। হঠাৎ সিদ্দিক আলী নীরবতা ভেঙে বলল, 'কিলাকান কেয়ামতই অইয়া গেছে। আমি অখনও বুঝতাছি না হানজাবেলা তুমি বাঁশবনে কিতার[৬] লাগি[৭] গেছিলায়[৮]?' কথাটি শোনামাত্রই আমেনা রক্তজবা চোখে তাকাল তার স্বামীর দিকে। আমেনার চোখ-দুটো যেন । তারপর মুখ ভেংচে বলল, 'গেছি তো ভালাই করছি। তুমি অত ভাবীর কথায় নাচ কিয়র লাগি কওছান হুনি?'

৬. কীসের।
৭. জন্য।
৮. গিয়েছিলে।

উ পো সী

হুরুত্তা[১] একদিন'র উপোসী।

শাখা-বরাক[২] নদীর জলে স্নান শেষ করে, শার্ট-লুঙ্গি পরে, বাড়ি না-ফিরে সরকার বাজারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হল তরমুজ, পেটের ধান্দায়। চুলগুলো কালো দেখাচ্ছে, মুখ তার এমনিতেই কালো—লম্বাটে, নাক একটু চাপা, চওড়া কপাল, চঞ্চল চোখ-দুটো ছোট। শাখা-বরাকের পাড় দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সে ভাবতে লাগল, হুরুত্তা একদিন'র উপোসী। অপরাধীর মতো থমথমে গলায় বলল, 'দূর হালা আর ভালা লাগে না। ইলাখান[৩] আর কত জীবন কাটাইমু।' কোনও রকম ব্যবস্থা করতে না-পারলে তার আর রক্ষা নেই। গত সন্ধ্যায় উত্তরবাড়ির কর্ত্রীর কাছে গিয়েছিল এক সের চাউল ধার চাইবে বলে। কর্জ দেওয়ার সময় তিনি বলেছিলেন, 'সকাল সকাল চাউল ফেরৎ দেওন লাগব, নাইলে আমরা উপাসে মরমু।' তরমুজ বলেছিল, 'বাদলির দিন। কেউর ঘরতঐ তো চাউল নাই। তোমারে চাউল দিমু কোয়াই[৪] তা কি গো চাচিজি।' চাচিজি বলেছিলেন, 'আমি ইতা[৫] কুনতা[৬] বুজি না। আমার চাউল লাগব। চাউল চাই।' তরমুজ চোখে আন্ধকার দেখে, সে নিজের স্বার্থ ছাড়া এ-জগতে আর কিছুই বুঝে না। দুটো পয়সার জন্য কিনা করতে পারে। অলস-অকর্মণ্য জীবনযাপন করে বলে হয়তো সে নিজেকে একান্ত অসহায় ভাবে। স্বীয় পন্থায় উপার্জিত অর্থ নিঃশেষ না-হওয়া পর্যন্ত সে নিজেকে নতুন কাজে সম্পৃক্ত করতে পারে না, হয়তো-বা করতে রাজিও না; যদিও কিছুদিন পরের জমিতে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করেছিল, তবুও না, তবে

১. সন্তান।
২. বরাক নদী মণিপুরের উত্তরে, আঙ্গামী নাগাপাহাড় থেকে উৎপন্ন। দক্ষিণাভিমুখে মণিপুর দিয়ে প্রায় ১৮০ মাইল প্রবাহিত হয়ে কাছাড়ে প্রবেশ করেছে। তারপর কাছাড়কে ভেদ করে, বদরপুরের কাছে এসে সিলেটে প্রবেশ করেছে। হরুটিকরের কাছে এসে দুটো শাখায় বিভক্ত হয়ে উত্তর-শাখাটি সুরমা এবং দক্ষিণ-শাখাটি কুশিয়ারা নাম ধারণ করেছে। কুশিয়ারার একটি শাখা বিবিয়ানা নাম ধারণ করে কালনীর সঙ্গে মিশে ধলেশ্বরী নদীতে পড়েছে, আর আরেকটি শাখা-বরাক নাম ধারণ করে সরকার-বাজারের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে।
৩. এরকম।
৪. কোথা।
৫. এরকম।
৬. কিছু।

সে জানে দশ-টাকার কাজ না-করলে পাঁচ-টাকার মজুরি পাওয়া সম্ভব নয়। কিছুদিন দালালিও করেছে বটে, হোক না সে গরুর দালালি বা জমির দালালি বা মাটির দালালি, কিন্তু এসব কাজে সে নিজের মনে শান্তি পায়নি, বরং তার সামনে মানুষের নিষ্ঠুর চেহারাই নানাভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ক্রমে সে হাড়ভাঙা শ্রমকাজে উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। তারপর বৈধ উপায়ে টাকা উপার্জনের ধান্দা ছেড়ে গোপন ও অপ্রকাশ্য যত প্রকার নীতিবিগর্হিত পন্থা তার জানা আছে সেসব পথেই অগ্রসর হয়।

একটু আগেও একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। এখন অবশ্য মেঘের আস্তর সরিয়ে একটু আলো সারা আকাশে ছড়িয়ে পড়েছে। ঝিঙে-ফুল ভিজে ঢলঢল। গোটা গ্রামই যেন আলো হয়ে আছে ঝিঙেফুলে। মাচায় ঘিরে থাকা গ্রামটি ঝিঙে-ফুলের হলুদ রঙের এক অদ্ভুত আলোর বান ডাকছে, এ-আলো গায়ে মাখলে মনে হয় কালো চামড়াও বদলে যাবে। ঝিঙে-ফুলের মাচার নিচ দিয়ে বয়ে চলা আশ্বিনের শাখা-বরাক নদীও অর্ধপূর্ণতা নিয়ে অর্ধসীমানা পর্যন্ত ভরে উঠেছে, সে এখন কবিতার লাইন—আপন গতিতে আত্মহারা, উদ্দাম, চঞ্চল। মাচা বেয়ে গাছগুলো যেমনি, তেমনি নদীর পাড়ের ঘাসগুলোও সপসপ করছে; ঘনসবুজ কুমড়োজালি যেন, শুধু মাঝেমধ্যে হলুদ রঙের নকশির বাহার। এসবেরই ফাঁকফোঁকরে স্বর্ণলতার মতো গলে পড়ছে ম্লানরশ্মি মাটিতে, জলেতে। বৃষ্টির আঘাত সহ্য করে এখন ঝিঙেগুলো দুলছে আপন মনে। কয়েকদিনের বৃষ্টিতে ঘরে বন্দী থাকা গরুগুলোও ছাড়া পেয়ে বাড়ির পাশের জমিনে কাদা-মাটি শুঁকতে শুঁকতে সরল মেঠোগন্ধ ভরা কচিঘাসের সন্ধান করছে। ঘাসগুলো আলোর ম্লানস্পর্শে সদ্যজাগ্রত হয়ে উঠেছে যেন। এদের সঙ্গে নবীনতার প্রাচুর্যে ভরপুর সুচিকন গ্রামটিও। কলাগাছ, বাঁশপাতা সবই সজীব, সবই স্পন্দিত। গ্রাম্যপ্রকৃতি যেন ক্লান্তি মুছে নতুন যৌবনের আহ্বানে উদ্ভাসিত।

ঢাকা-সিলেটের রাস্তা ধরে আলোর ম্লানরশ্মি ঝরে পড়ছে, তবে শাখা-বরাকের জলের উপর কয়েকটি খণ্ডবিখণ্ড মেঘমালা উড়ে বেড়াচ্ছে। কখন যে আবার কৃষ্ণকালো বৃষ্টির ধারা ছড়িয়ে পড়বে সর্বত্র, কে জানে! সমানভাবে ঝরবে জলে ও ডাঙায়, ঘাটে ও মাঠে, জালে ও জেলেনৌকায়, মানুষের মাথায় ও কুকুরের গায়ে, শাখা-বরাকের পুলে ও বটতলায়, সরকার বাজার অঞ্চলের সমস্ত প্রাণীতে ও বস্তুতে, মুকিমপুর-শ্রীকৃষ্ণপুর-আইনপুর-বাঘারাই গ্রামগুলোর শ্বাসে ও নিশ্বাসে। বৃষ্টির ধারা যেন কিছু সময়ের জন্য দম ধরে আছে চৌধুরী-বাড়ির বড় দামান্দ[৭], বড় মেয়ে ও তাদের সন্তানের আগমনের অপেক্ষায়। একসময় অবশ্য

তারা ঢাকার বাস থেকে নামল, সঙ্গে একটি ট্রাঙ্ক, কয়েকটি ছোটবড় বাক্স ও একটি ব্রিফকেস। বটতলায় দাঁড়িয়ে থাকা তরমুজ এসব লক্ষ্য করল। চৌধুরী-বাড়ির প্রতিবেশী ও তাদের কৃপাপ্রার্থী সে। তরমুজের আচরণের সঙ্গে এদের অমিল থাকলেও সে এগিয়ে এল। তাদের জিনিশপত্র নৌকায় তুলে দিতে গিয়ে তার শিরদাঁড়ায় ব্যথা ধরে। সে পঞ্চাশ টাকা নিতে নিতে জিজ্ঞেস করল, 'জামাইবাবু বাকসটাইন[৮] বহুত ভার[৯]। ইতাত[১০] কড়িয়া কিতা আনচইন[১১]।' জামাইবাবু উত্তর দিলেন, 'শ্বশুর মহাশয়ের ফার্মেসির জন্য সামান্য ওষুধপত্র।' তরমুজ একথা বিশ্বাস করল না, বরং ভাঙা কণ্ঠে বলল, 'কয়দিন থাকবাইন[১২] জামাইবাবু?' জামাইবাবু উত্তর দিলেন, 'কাল সকালেই চলে যাব।' নৌকার গলুই ছাড়তে ছাড়তে তরমুজ আড়চোখে আরেকবার দেখে নিল ব্রিফকেসটি। প্রথম ছেলে নিয়ে মেয়ে এসেছে বাপের বাড়ি—নাই বললেও হয়তো অনেক টাকা সঙ্গে আছে। চৌধুরীরা করুক-বা-না-করুক, তরমুজ পরজন্মে বিশ্বাস করে না, তাই হয়তো তার পাপপুণ্যবোধটি তাদের মতো নয়। বৈধভাবে অর্থ উপার্জন না-করার বৃত্তিতেই তার জীবিকা নির্বাহ, সংসার প্রতিপালন। তরমুজের মন কেমন যেন করে উঠল। এই দেহ, এই মন বৈধভাবে অর্থ উপার্জন না-করার কামনা করে। এছাড়াই-বা তার উপায় কী! টাকার অভাবে তার হুরুত্তারা কষ্ট পাচ্ছে, তাই এমন সুবর্ণসুযোগ সহজে হাতছাড়া করা উচিত কি? নৌকা ছেড়ে দিলেও তরমুজ বটগাছের নিচে, শাখা-বরাকের তীরে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল, কিছুদিন আগে আমি চৌদরি-বাড়ির পছম'র[১৩] দেওয়াল পারঅইয়া[১৪] আমগাছ'র ডাল বাইয়া বাড়ির প্রত্যেক ইট'র খবর লাইয়া আইছি। পাকরঘর[১৫] বাদ হকলতাঐ ইট'র বানাইল। এসব ভাবতে ভাবতে তরমুজ প্রচুর আত্মতৃপ্তি উপলব্ধি করে। এ-কাজ সমাপন করতে পারলে সে তার হুরুত্তার মুখে অনেকদিন পর হাসি ফুটাতে সক্ষম হবে। দুশ্চিন্তার মধ্যেও তরমুজের বেঁচেবর্তে

---

৭. মেয়ের স্বামী।
৮. বাক্সগুলো।
৯. ভারি।
১০. এরমধ্যে।
১১. এনেছেন।
১২. থাকবেন।
১৩. পশ্চিমের।
১৪. পেরিয়ে।
১৫. রান্নাঘর।

থাকার ছন্দে যতি পড়ে না, বরং তার ঠোঁট ভেঙে হাসির বান বইতে লাগল। তরমুজের মধ্যে পরিশ্রম না-করে টাকা উপার্জন করার যা যা বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন সবই যেন বেঁচে আছে। মনে মনে একটি কথা ভেবে সে খুব আনন্দ পাচ্ছে, অবৈধভাবে টাকা উপার্জন তো নয়, ঝমঝম বৃষ্টির রাত...। খরায় চৌচির হয়ে যাওয়া মৃতপ্রায় ফসলক্ষেতে যদি অনর্গল বৃষ্টিপাতে প্রাণ ফিরে পায় তাহলে চাষীর মনে যেরকম আনন্দ সৃষ্টি হয় সেরকম অবস্থাই তার।

পড়ন্ত বিকালের আলোতেও ঝকঝক করছে বৃষ্টিভেজা ঝিঙের পাতাগুলো, তবে বেশিক্ষণ এরকম থাকবে না, পূর্বদিক থেকে কৃষ্ণমেঘচ্ছায়া আস্তেধীরে পশ্চিমে বিস্তৃত হচ্ছে। চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে তরমুজ একবার দেখে নিল আকাশ; তার কাছে মনে হচ্ছে, মেঘমালার গুণ্ঠনে আরও অবনমিত, আর সিন্ধুর বিন্দুতে ভরপুর; এই পরিবেশ তার মনে মোহময় আবেশ রচনা করে চলল। পশ্চিমের মেঘলা রঙ আকাশের গায়ে মিলে যেতে-না-যেতেই বিরাট এক কৃষ্ণমেঘমালা সরকার বাজারকে অচৈতন্যে ঢেকে নিল; শুরু হয়ে গেল গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি। তালগাছটি একা, নিঃসঙ্গভাবে দাঁড়িয়ে আছে, গ্রামের চিকন পথটিও; তবে বেলতলায়, আমতলায় আশ্রয় খোঁজছে মশা ও মাছি। মুকিমপুর-শ্রীকৃষ্ণপুর-আইনপুর-বাঘারাই গ্রামের দরজায় খিল তুলে ফাঁপা-শূন্য পেটে, ক্লান্তি ও ক্ষোভের আশ্রয়ে, ছেলেমেয়েসহ চাষীবউ ভিজে মাটির গন্ধ শুঁকে, ছেঁড়া মাদুলে শরীর পেতে দিতে ব্যস্ত হয়ে উঠল। কিন্তু তরমুজ চায়ের দোকানে চা পান করছে, বাকির খাতায় নাম লিখিয়ে। কনকনে বাতাস বইছে। গ্রামগঞ্জের মানুষ যেখানেই থাকে না কেন সন্ধ্যা হতে-না-হতেই আলো জ্বালায়, এ দোকানেও জ্বলছে। তরমুজ চা শেষ করে, দোকানের লণ্ঠনের উন্মুক্ত অগ্নিশিখায় একটি সিগারেট ধরাল। চৌধুরী-বাড়ির মোহ ছাড়তে তার খুবই কষ্ট হচ্ছে, চাপা এক দীর্ঘশ্বাস উঠে এল তার অন্তর থেকে, একইসঙ্গে দোকানের শনের বেড়ার ফাঁকে বৃষ্টিভেজা ঠাণ্ডা হাওয়া ঝাপটা মেরে চলে গেল তার গালে ভর দিয়ে। তরমুজ কিছুক্ষণের জন্য নিজের মধ্যে ডুবে থেকে দোকানের বারান্দায় ঝুলন্ত আলোটি দেখতে লাগল। সে যেন গাঢ় অন্ধকারের অপেক্ষায়, তবে ভাঙা দাওয়ায় আশ্রয় নেওয়া কুকুরটির কাছে ঝাপসা অন্ধকারই প্রিয়। সে এই আলো-অন্ধকারে লেজ গুটিয়ে সামনে ছড়ানো তার পা-দুটোর ওপর মুখ পেতে চোখ বুজে ঝিমোচ্ছে; কিন্তু তরমুজের চোখে তা ধরা পড়ল না, সে আকাশের গায়ে ভেসে বেড়ানো মেঘের ভেলার দিকে তাকিয়ে রইল। কাশির শব্দে কুকুরটি মুখ তুলে কান-দুটো খাড়া করল, তার শ্রবণশক্তি তীক্ষ্ণ, কিন্তু ঘ্রাণশক্তি আরও প্রবল, তবে দৃষ্টিশক্তি একেবারেই অস্পষ্ট, তাই শব্দের সন্ধান করতে সে হাই তুলে উঠে দাঁড়াল। ঘাড়

ফিরে মানুষটিকে চেনার চেষ্টা করল, চিনতে তার ভুল হল না। তরমুজের চোখ যখন কুকুরটির উপর পড়ল তখন সে দেখে, কুকুরটি তার শরীরের বিভিন্ন জায়গা জিভ দিয়ে চেটে পরিষ্কার করছে। তরমুজ অবশ্য বাজারের কুকুরগুলোকে সহ্য করতে পারে না, গ্রামের গুলো তো অন্যরকম। বাজারি কুকুরগুলো দিনদুপুরে তাদের সামনে দিয়ে হাতি গেলেও টের পায় না, কিন্তু রাতেই যত সমস্যা—মশা দেখলেই ঘেউঘেউ করে ওঠে; তবে এমন বৃষ্টির রাতে গ্রামের কুকুরগুলো গৃহস্থের ঘরে নিরাপদ আশ্রয়ে মাথা গুঁজে ঝিমোতে থাকে, ইচ্ছে থাকলেও মৃদুমন্থর গতিতে চলা পায়ের আওয়াজে ঘেউঘেউ করে ওঠে না। তরমুজ কুকুরটির উপর থেকে চোখ ফিরিয়ে, ধূমপান শেষ করে, আস্তেধীরে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হল। বৃষ্টিটা ভালোমতোই পড়ছে। সে তার শার্টের দুটো বোতাম বন্ধ করে রাস্তা ভাঙতে লাগল। আশ্বিনের বাতাস বইছে তার মুখোমুখি; তারপর বিস্তৃত হয়ে পড়ছে বটবৃক্ষের পাতায়, শাখা-বরাকের জলে, পথের ঘাসে। পথে তেমন লোকজন নেই। তরমুজের শরীরে আশ্বিন মাসের শাখা-বরাকের গন্ধ, তবুও তার ক্লান্তি নেই, সে হেঁটে চলেছে। তার হেঁটে-যাওয়া পথের পাশে, ডুবে-যাওয়া খালের ভেতর থেকে, আকাশের ডাক শোনার লোভে ভেসে উঠেছে কই-মাগুর, উজাই যেন। ভেসে ওঠা মাছগুলোর পাশ দিয়ে কোঁচড়হীন পথিকের মন্থরগতিতে চলে-যাওয়া পায়ের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। অন্ধকারের মধ্যেও তরমুজ বিস্মিত চোখে দেখতে পাচ্ছে পথিকের চোখ-দুটো কই-মাগুর ধরার লোভে যেন বড় বড় হয়ে উঠেছে, তার পুতলির মধ্যে যেন শয়তানের আস্তানা। 'কাঁচা লঙ্কার চড়চড়া রানলে[১৬] বড্ড মজা[১৭] লাগত'—এ-ধরনের কথা নিরীহকণ্ঠে প্রকাশ করে পথিকটি গ্রামের আঁকাবাঁকা পথে, বাঁশপাতা মাড়িয়ে, পায়ে পায়ে বৃষ্টিভেজা শব্দ উড়িয়ে উধাও হতে লাগল। তরমুজও বৃষ্টিভেজা পাতা-ঘাস-মাটি মাড়িয়ে শাখা-বরাকের পাড় ঘেঁষে ঝাপসা আঁধারে ঘেরা মুকিমপুরের বটতলায় এসে থমকে দাঁড়াল। এরই পাশে মাদ্রাসার পাঁচিলের ইটগুলো যেন অন্ধকারেও পেতনীর দাঁতের মতো খিঁচিয়ে আছে। সাড়ে তিন হাতের দেওয়াল খাড়া করতে বছরের-পর-বছর লেগে যাচ্ছে, কিন্তু মাদ্রাসা-কমিটির কোনও খবর নেই, ইটের ফাঁকে শ্যাওলা ধরলেও সিমেন্টের টাকাগুলো ঠিকই সভাপতির পকেটে ঢেউ কাটছে। অন্যদিকে টাকার অভাবে, আশ্বিনের বৃষ্টির সময়ে পাঠশালার পুরনো টিনের ফুটো দিয়ে

১৬. রাঁধলে।
১৭. সুস্বাদু।

জল পড়ছে, তাই হয়তো ছাত্ররা এমনি দিনে স্কুলে আসে না। বৃষ্টির দিনে পাঠশালায় পড়ার ঢেউ না-উঠলেও নদীতে ওঠে। বটতলায় দাঁড়িয়ে থাকা তরমুজ, এই রাতের অন্ধকারেও, ঠিকই বুঝতে পারছে শাখা-বরাকের জলে তরঙ্গের মেলা। এই অপ্রশস্ত নদীর জলে নিজেকে ভাসিয়ে দিতে চায় সে, ভেসে চলে যেতে চায় উজানে, ত্রিবেণী নদীর মোহনায়, যেখানে সহজেই খুঁজে পাবে তার শান্তি, অভাবহীন জীবনের পরম সমাপ্তি, কিন্তু সেই শান্তি কী তার কাছে শাখা-বরাকের প্রশান্তি হবে—এসব ভাবতে ভাবতে তরমুজ বাস্তবে ফিরে মনে মনে বলল যে, খালি হাতে বাড়ি ফিরলে চলবে না—হুরুত্তা একদিন'র উপোসী। তার ইচ্ছে ছিল বাজার থেকে একটি ইলিশ আনাবে কিন্তু সঙ্গে টাকা থাকা সত্ত্বেও খরচের ভয়ে আনেনি। সে জানে দু-দিনের ক্ষুধায় কেউ মরে না, মারা যেতে পারে না, কারণ মৃত্যু এত সহজে আসে না, সে তো গভীর রহস্যময়ী! আর যখন আসে তখন সে তার কালো চিহ্নটি হঠাৎই মানুষের বাড়িতে এঁকে দেয়। পৃথিবীর সকল জীবই তো মরণশীল, তাই এত ভাবার প্রয়োজন কী আছে! তার মাথার ভেতর অভাবের বিষাক্ত ধূমকেতু যেন দপদপ করে জ্বলছে। সে শুধু চায় ধসে যাওয়া ইকরের বেড়া ধরে কোনও প্রকার বেঁচে থাকতে। দিশেহারা তরমুজ একসময় পাঠশালার পাশে, মুদির দোকানে, এসে হাজির হল। দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করতে গিয়ে দোকানি মুখ বাড়িয়ে বলল, 'কিতা চাও তরমুজ?' রাস্তা নীরব, নদীর ঘন জলতরঙ্গের উপর চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা বটবৃক্ষটিও নিশ্চুপ, এমনকি ক্লান্ত দোকানের ঝাঁপটিও দম নিচ্ছে। সব শেষ হয়ে যাওয়ার সময় শব্দও ফুরিয়ে আসে, তাই হয়তো তরমুজ বলল, 'গরিবর আর কিতা চাইবার আছে।' বাবরুখানের মনে সন্দেহ, তাই তার পাঁজরের আর বুকের পাথর-কঠিন হাড়গুলো শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে কাঁপতে লাগল; এমনকি তার চোখের কালো পুতলিগুলোও, পাশে রাখা লণ্ঠনের আলোতে, অদ্ভুত দেখাচ্ছে। 'ধার-টার চাও না কিতা?' বাবরুখানের এমন কথায় ম্লান হাসল তরমুজ; সে জানে, মানুষের মনে অনেক লুকানো জায়গা থাকে, সেখানে অনেক গোপন কথাও থাকে, সবকিছু অন্তর খোলে বলা যায় না, হৃদয়ের সব পাপড়ি মেলেও ধরা যায় না। বাবরুখানের কাছে জীবনের তাবৎ সমস্যার সমাধান পাওয়া যাক-বা-না-যাক তবুও না, যদিও তার সঙ্গে অনেকগুলো বছর পাশাপাশি কাটিয়ে আসছে। সে বুঝতে পারে, বাবরুখানের অজান্তেই তার অন্তরে অবিশ্বাসের জল সৃষ্টি হয়েছে। অন্তর কেঁপে উঠল। অন্তরের কাঁপন থামিয়ে তরমুজ বলল, 'ধার কেটাই-বা দিব। আর চাইতাচেই-বা[১৮] কেটা! জরুরি মাত[১৯] আছে। একটা বিড়ি দেউ।'

'অখন আলাপ-টালাপ করতাম পাড়মু না। তাড়াতাড়ি বাড়িত যাওন লাগব।'

'তাড়াতাড়ি কিতার[২০] লাগি[২১]? ভাবীর শরীর-গতর ভালা তো?'

'তাইনর[২২] তবিয়ৎ ভালাই আছে। বাড়িত কাম[২৩] আছে, তাড়াতাড়ি যাওন লাগব।' তারপর একটু থেমে বলল, 'তোর বউ ভালা আছে তো?'

তরমুজ অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল বাবরুখানের দিকে। শারীরিক ক্লান্তি সরিয়ে বাবরুখানের মুখ ছেঁয়ে গেছে গোপন আনন্দে, যা তার মুখ থেকে ধীরে-আস্তে বিস্তৃত হয়ে পড়ছে অন্তরে, আর সেখানেই স্থান করে নিয়েছে তরমুজ যাকে সারাজীবন ভালোবেসে এসেছে তার ছবি—টানাটানা চোখ, ঢেউ তোলা বুক, পিঠভর্তি কৃষ্ণকালো চুল, ক্লান্তিভরা কিন্তু লাবণ্যময়ী একটি মুখ—বয়সের দীর্ঘতায় কিঞ্চিৎ জীর্ণ, মধ্য-বয়সেই যৌবন অন্তর্হিত প্রায়, যেন জালে আটকে পড়া জলফড়িং। এই মুখের দিকে পরকীয়া প্রেমিকের মতো বাবরুখান সময় পেলেই তাকিয়ে থাকে; সেই দৃষ্টি যেন ঈশান কোণে জমে ওঠা মেঘের মতো বড় দীন, বড় কাতর, বড় রাক্ষুসী। তরমুজের স্ত্রীর রূপ ও গুণের তুলনায় বাবরুখান অতি তুচ্ছ, তবুও তো মেয়েরা ওরকম লোকই খুঁজে। তারা কী আর ফুটো চালের লোকদের সঙ্গে ঘর করতে চায়! যেখানে পয়সা নেই, নিরাপদ আশ্রয় নেই, সেখানে মৌমাছিরা কেন ভিড় জমাবে? তাই তো দশ বছর আগে বাবরুখানের চোখ ফাঁকি দিয়ে তরমুজ তার স্ত্রীকে ঘরে তুলে এনেছিল। বাবরুখানের প্রশ্ন এসব কথাই তাকে মনে করিয়ে দিল, সঙ্গে সঙ্গে তার ভীষণ রাগ ধরল, বলল, 'চুতমারাউনির আবার শরীর ভালা!'

'তোর বউ তো ভালামতোই অতটা বছর কাটাইয়া দিল।'

'আর কিতাঐ করত পারত। যৌবন হেষ[২৪] অইলেও আমার কান্দাতঐ[২৫] পইড়া

১৮. চাচ্ছেই-বা।
১৯. আলাপ।
২০. কীসের।
২১. জন্য।
২২. তাঁর।
২৩. কাজ।

থাকা ছাড়া তাইর[২৬] আর উপায় কিতা।'

'তোর স্ত্রী অখনও যৌবন ধইরা রাকছে[২৭] কিন্তু তোর ভাবী তাও পারল না।'

দোকানের পাশে জমে ওঠা অন্ধকারের দিকে, ঠিক অন্ধকার নয় একটি হালকা কৃষ্ণাভা যেন, তাকিয়ে তরমুজ ভাবতে লাগল, এরকম কথায় চুপ থাকাই ভালো। মানুষের নারীসংক্রান্ত দুঃখকে ভাগ করে নেওয়া যায় না। তাছাড়া নারীসংক্রান্ত ব্যাপারে মিছিমিছি কথাও বলা যায় না। তাই বাবরুখানের কথাটি ঘুরিয়ে বলল, 'বিড়ি দেউ। নাসিরউদ্দীন বিড়ি। দুই মিনিট'র বেশ নিরাম[২৮] না।' অনিচ্ছে সত্ত্বেও বাবরুখান একটি বিড়ি এগিয়ে দিল, সঙ্গে সঙ্গে তরমুজ বলল, 'বিড়ির দামটা লেইক্কা[২৯] রাখছত?'

'না। একটা বিড়ির আবার দাম!'

'এক আলি এ্যণ্ডা[৩০] আর এক বোতল হইর'র তেল দেউ?'

চমকে উঠল বাবরুখান, 'অ্যাঁ। তাজযুব করতাচ না-কিতা।'

'কেনে? কয়টেকা বাকি আছে তোমার কাছঅ?'

'ইতার হিসাব কিতাব আছে না কিতা।'

'হিসাব করঅ। হকলতা হিসাব কইরা নেউগি।'

'অত টেকা কুনখান[৩১] তাকি পাইচচ।'

'হিতা হুনইয়া[৩২] লাভ কিতা। তোমার ঋণ'র টেকা সুদ-আসলে ফিরাইয়া দিতাম চাই।'

'তোর আপন জিনিশ যে আমার কাছ বন্দক আছে হিতার হিসাবও করমুনি!'

---

২৪. শেষ।
২৫. পাশে।
২৬. তার।
২৭. রাখছে।
২৮. নিচ্ছি।
২৯. লিখে।
৩০. ডিম।
৩১. কোথা।
৩২. শুনে।

চাপা রসিকতা বাবরুখানের কথায় প্রকাশ পেল। কিন্তু তরমুজের অন্তর অসহ্য ঈর্ষায় জ্বলে উঠল। বুক কেমন যেন মোচড়ে খাঁ-খাঁ করতে লাগল। একটি দৃশ্য তার মনের পটে ভেসে উঠল: সেদিন ঝিঙে তুলতে যাওয়া তার স্ত্রীকে দেখে দোকান থেকে ছুটে আসে বাবরুখান। তারপর তারা হাসল, কথা বলল, যেন অন্তরঙ্গ কৌতুকে। তরমুজ ভাবে, বাবরুখানের সঙ্গে কী প্রেমপ্রীতির সম্পর্ক চলছে তার স্ত্রীর! হয়তো তা-ই। সুশ্রী বা সুন্দরী নারীর ইচ্ছে থাকলেও সে কি পারে নিজেকে একজন ব্যাপারীর কামলুব্ধের হাত থেকে রক্ষা করতে? হয়তো পারে না। তার স্ত্রী সত্যি সুন্দরী, হাসলে ওকে আরও সুন্দর দেখায়, দাঁতগুলো খুবই সুন্দর। হয়তো অভাবের কারণে একটু ম্লান হয়েছে তার আমেজ, এছাড়া অন্য কিছুই নয়। হয়তো আরও দশজন নারীর মতোই সে। সব নারীই তো চায় সংসার ও সুখ, টাকাওয়ালা পুরুষ! হয়তো সবই ভুল। তার মনে গ্লানি জমতে লাগল। তরমুজের সবকিছুই তো একমাত্র তার স্ত্রী বুঝে, দশ বছরের সংসার তাদের কী না। অকারণে স্ত্রীর সম্পর্কে মনে মনে দুর্নাম রটাচ্ছে কেন? তরমুজ গাঁজার মতো নাসিরউদ্দীন বিড়ি টানতে টানতে বলল, 'কিতা কইলা!' তরমুজের প্রকাশ ভঙ্গি এমন যে বাবরুখান ভয় পেয়ে গেল, তাই প্রসঙ্গ পালটিয়ে বলল, 'না, কইতাছি, চল্লিশ টেকা দিলেই অইব।' টাকার কথা শুনে তরমুজের বুক কনকন করে উঠল। বাবরুখানের দৃষ্টিতে কামসিক্ত ঘ্রাণ লেপটে আছে, তবুও তরমুজ জানে বাড়িতে তার স্ত্রী নিরাপদে আছে, সেই তো তার শান্তি, সেই তো তার একমাত্র ভরসা, নিরাপত্তা। বৃষ্টিভেজা মেদুর অন্ধকারে আচ্ছন্ন দোকানের ভেতর, তবে লণ্ঠনের হালকা হলুদ আলো এখানে-সেখানে ছড়িয়ে পড়ছে। এই আলোতে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে হতাশা আর বিরক্তি যেন জড়াজড়ি করে বেরিয়ে আসছে তরমুজের চলার ভঙ্গিতে। এমনি ভঙ্গিতেই সে দশ টাকা হাতে নিয়ে দোকান থেকে দূরে সরতে লাগল।

তরমুজ বাজারের ঠোঙ্গা হাতে নিয়ে বাড়ি ফিরল। আর তার স্ত্রী দরজার ফাঁকে, দাওয়ায় রাখা প্রদীপের আলোতে, দেখে নিল তার স্বামীর শুকনো মুখটি। নানা দুশ্চিন্তায় তার মন সবসময় চঞ্চল থাকে। শরীরও ভেঙে গেছে। সারা জীবন অভাবের সঙ্গে লড়াই করতে করতে দেহ আর কত সইতে পারে! যতদিন এই পৃথিবী থাকবে ততদিন অভাবের এই সাংঘাতিক আঘাত থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব কি শুধুই স্বামীর হাতে গচ্ছিত থাকবে? সবসময় স্বামীই কি জ্বলবে অভাবের ভয়ঙ্কর দহনে? তরমুজের স্ত্রীর চিন্তা একের-পর-এক সিঁড়ি ভাঙতে লাগল। আর তরমুজ দাওয়ায় দাঁড়িয়ে একমনে ভেবে চলেছে, আমার জীবনের এই অবেলায় একটি নতুন পথের সন্ধান পেয়েছি; যদিও সেই পথে কোনও

আলো নেই, তবুও তা বাস্তব এবং সময়সাপেক্ষ। এই ভাবনায় সে একা, একেবারেই একা। আনন্দের একরকম শিহরণ তার সারা শরীরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে; এরই মাঝে দুঃখের ঝাপসা মেঘও ঘুরপাক খাচ্ছে। এই ঘন নিবিড় ভাবনার মাঝে কখন যে তার স্ত্রী পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, সে টের পায়নি, যদিও রাত গভীর হতে এখনও অনেক বাকি। তরমুজ যখন ভাবনার জগৎ থেকে ফিরে এল তখন দেখে তার স্ত্রী এক বদনা জল দাওয়ায় রেখে, ঠোঙ্গাটি তুলে রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তারপর রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে কাপড় শুকানোর বাঁশ থেকে একটি গামছা তুলে নিয়ে তরমুজের হাতে দিয়ে চৌকাঠ ধরে চুপচাপ দাঁড়াল। তরমুজ তার দশ-বছরের জীবনসঙ্গীর দিকে মায়াভরা চোখে তাকিয়ে বলল, 'টুংকা খুলিয়া দ্যাখ কিতা আইনছি[৩৩]!' তরমুজের স্ত্রী হয়তো বোকা মানুষ, স্বামীর চোখ দেখে কিছুই বুঝে না; শুধু গাছের মতোই ছায়া দিয়ে যাচ্ছে তার স্বামীকে, সাহস দিয়েছে বাসা বাঁধতে, সন্তান দিতে; এছাড়া সে আর কী-ই-বা করতে পারে! একটি দমকা হাওয়া তেড়ে এসে তরমুজের স্ত্রীর শাড়ি দুলিয়ে দিল; সঙ্গে সঙ্গে সে একহাতে শাড়িকে সামলে নিয়ে বলল, 'কিতা আনছ কইলেই পার।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে তরমুজ বলল, 'ইচ্ছা আছিল বাজার তন ইলিশ আনমু। বুনা-বুনা[৩৪] করিয়া রানলে কত মজাই অইত; কিন্তু পয়সার জ্বালায় আর অইল না। উপায় না পাইয়া এ্যণ্ডা আনলাম।' স্বামীর কথা শুনে তার মুখ মলিন হয়ে গেল, উঠোনের ঝিঙে পাতাগুলোও নেতিয়ে পড়ল। কী সামান্য সাধ! ইলিশ খাবে। কিন্তু তাদের মতো সাধারণ মানুষের ভাগ্যে কী আছে জীবনের সামান্যতম সাধ পূরণের সামর্থ! সামান্য স্বপ্নও না। স্বামীর আলো-অন্ধকারে ঢেকে থাকা দেহের দিকে তাকিয়ে তরমুজের স্ত্রী এসব কথা ভেবে চলল। তারপর মনে মনে বলল যে, তবুও বেঁচে থাকতে হয়। কিছু খেতে হয়। ভাঙা ঘরের খুঁটি ধরে সংসার সামলাতে হয়। স্বামীর দেহের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার মনের মধ্যে কেমন যেন এক কৃষ্ণছায়ার আধিপত্য শুরু হল। অনেক কথা উপচে পড়তে চায়, কিন্তু পারছে না, তাই হয়তো বুকের মধ্যে মাথাখুঁড়ে মরছে নানারকম কষ্ট। স্বামীর সব সাধের কথা টের পেয়েও পুরোতে পারছে না বলেই হয়তো বাবরুখানের বাড়িতে ঝিগিরি করে। রান্নাবান্না করে, ঢেঁকিতে পাট দিয়ে, মসলা বেটে, গরুঘর পরিষ্কার করে, কাপড় কেচে যে-কয়টি টাকা ও ধান-চাল সে রুজি করে তা দিয়েই সুখ-দুঃখের এই সংসার চালাতে চেষ্টা করে। নানারকম চিন্তা মাথায় নিয়ে সে নিঃশব্দে পা চালাল

৩৩. এনেছি।
৩৪. কষা-কষা।

মূলঘরের দিকে। ঘর বলতে তো আটে-বারোতে তৈরি একটি খুপরি মাত্র। এ-ঘরের একমাত্র মাটির চৌকিতে শোয় ওরা দু-জন, অপর পাশের কাঠের চৌকিতে তাদের সন্তান-দুটো। সে কাঠের চৌকির নিচ থেকে হাত বাড়িয়ে তুলে নিল একটি বটি। সিঁকির দিকে এগিয়ে এসে মাটির পাতিলে পেঁয়াজের সন্ধান করতে করতে একবার আড়চোখে দেখে নিল তেলের শিশিটিও। তারপর সন্তর্পণে, টিপটিপ পায়ে, মূলঘর ছেড়ে উপস্থিত হল রান্নাঘরে। মূলঘরের উত্তরের বেড়া ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা একচালা ছনের ছাউনিটিই হচ্ছে তাদের রান্নাঘর। সে উনুন জ্বালানোর চেষ্টা করল। ভিজে পাতা ও স্যাঁতানো গোবরের চট দিয়ে আঁচ তুলতে তার কষ্ট হচ্ছে। শুধু ধোঁয়া আর ধোঁয়া। একসময় আগুন উঠল। মাটির হাঁড়িতে চাল ও ডিম একসঙ্গে চাপিয়ে দিয়ে, হাত বাড়িয়ে অন্ধকার হাতড়ে ঝিঙের মাচা থেকে দুটো ঝিঙে তুলে নিল। বিকেলবেলা তুলে আনা মিষ্টি কুমড়োর কয়েকটি ফুলে আটা, নুন, হলুদ মিশিয়ে নাম-মাত্র তেলে ভেজে নিল। তারপর ভাতের হাঁড়ি থেকে ডিমগুলো তুলে খোলস ছাড়িয়ে দুটো ডিম পাঁচ-ফোড়ন দিয়ে রাঁধল। বাকি দুটো ভেঙে ঝিঙের তরকারি পাকাল। তরমুজ দূর থেকে নিরীহ চোখে এসব দেখছে; এরইমাঝে একবার মূলঘরে উঁকি দিয়ে দেখে নিল তাদের ছেলেগুলোকে। ওরা ঘুমোচ্ছে। তারপর রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে বলল, 'দুইটা টুকরি, বেউ আর ছিক্কাই ঠিক রাখিচ। বহুদিন বাদ[৩৫] আবার রাইত বাইরনি[৩৬] লাগব[৩৭]।' তরমুজের স্ত্রী সর্তক হল। উনুনের আগুনে তার স্বামীর মুখে ভেসে ওঠা অস্পষ্ট রেখাগুলো পড়ার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না, তাই প্রশ্ন করল, 'চুরিত যাইবা?' স্ত্রীর কথায় শিউরে উঠল তরমুজ। সে জানে, আশ্বিনের বৃষ্টির রাতে চুরি করা কত সহজ—এমনরাতে অমাবস্যার চেয়েও গাঢ় অন্ধকারে ছেয়ে যায় গ্রাম; এমনরাতে শীতের চেয়েও বেশি ঠাণ্ডা পড়ে; এমনরাতে শত প্রয়োজনেও মহাজন ঘর থেকে বাইরে বেরোয় না, কাঁথা জড়িয়ে ঘুমিয়ে থাকে; গ্রামের কুকুরগুলোও নড়তে চায় না; আর এমনরাতে ঘরের মাটি বৃষ্টির জলে নরম থাকে, সিঁদ কাটতে কষ্ট হয় না, শব্দও না—এসব কথা কী তার স্ত্রী বুঝে না! তাই বলল, 'দুরু চুতমারাউনি, মাতর[৩৮] ওপর মাতচ[৩৯]

৩৫. পরে।
৩৬. বেরুতে।
৩৭. হবে।

খালি[৪০]। কুচতা[৪১] বুজচ[৪২] না?' সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এল, 'বুজি, বুজি, হকলতাই[৪৩] বুজি। মন্দ রাস্তায় টেকা আনতাচ ইতাকিতা বুজি না?' তরমুজ জানে, সে মন্দ হতে চায়নি, তবে বাঁচতে হবে। চারদিকের অবিরাম ক্ষয়ের মাঝে নিজেকে ডুবিয়ে রাখতে চায়নি, কিন্তু...। তার জীবনের শর্তগুলো আলাদাই ছিল। 'চাইছলাম বউটারে লইয়া সুখর এক সংসার বানাইতে। বউটার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা তো আর পথ তুকাইয়া পাওয়া প্রেমট্রেম না, যে আতখা আইল আবার আতখা পলাইয়া গেল। কিন্তু বাস্তব যে আরেকলাখান[৪৪]।' একসময় সে স্বপ্ন দেখত, কিন্তু এখন আর দেখতে সাহস পায় না, হয়তো দেখেও। মানুষ সবকিছুই সময়মতো পেতে চায়, কিন্তু পায় কী! ভাবনা থেকে ফিরে এসে বলল, 'একবারে অচল অইবার[৪৫] আগ[৪৬] কুচতা তো করন লাগব।' তরমুজের স্ত্রী জানে, এ ব্যাপারে আর কিছু বলা পণ্ডশ্রম, তরমুজ যা ভেবেছে তাই করবে, আর তা তাকে মেনে নিতেই হবে, তবুও বলল, 'আমি খালি জানতাম চাইছলাম তুমি চুরিত যাইবা না কিতা?' তরমুজের স্ত্রীর কথা যেন বাঁতে থাকার চেয়েও মারাত্মক; তবুও চিলের ডানার শব্দের মতো কথাগুলো তার কানের উপর দিয়ে উড়ে গেল। মেঘমেদুর আকাশে বিদ্যুৎ চমকালো। আশ্বিনের ভিজে গন্ধ তরমুজের নাকে এসে ধাক্কা খেল, বাস্তবতার ছোঁয়াই যেন, তাই বলল, 'চুতমারাউনি, তুই রান—পেট ভরব।' সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এল, 'মজুর খাটিলে পেট ভইরা[৪৭] তো খাইতামঐ। চুরি করার ধনে রানী হউন লাগত না।' এ-কথায় আহ্লাদের চেয়ে আঘাতই বেশি প্রকাশ পেল। তরমুজ আহত। তার স্ত্রী বলে চলল, 'সাধ-আহ্লাদ তো সব চুলাত দিচি। বাবরুখার বাড়িত ঝিগিরি কইরা খাইতাছি। আর কেউ অইলে অতদিনে...।' বাক্য শেষ করতে পারল না সে, ইচ্ছে করেই হয়তো করল না, একমনে রান্না করতে লাগল; চুলোর আগুনে যেন তার সমস্ত দুঃখবেদনা পুড়িয়ে

৩৮. কথার।
৩৯. কথা বলা।
৪০. শুধু।
৪১. কিচ্ছু।
৪২. বুঝো।
৪৩. সবকিছুই।
৪৪. অন্যরকম।
৪৫. হওয়ার।
৪৬. আগে।
৪৭. ভরে।

দিচ্ছে, স্বপ্ন-সাধ-অভিমান-অবহেলা সবই। তরমুজ অবাক! ওর মুখে এ-ধরনের নালিশ যেন এই প্রথম শুনছে। নালিশ করা ওর স্বভাব নয়, এমনকি অনুযোগও না। তাই চুলোর আগুনে উজ্জ্বল হওয়া স্ত্রীর মুখটি একদৃষ্টিতে দেখতে লাগল। চুলোর উপর থেকে হাঁড়ি নামিয়ে মাটিতে রাখতে রাখতে তার স্ত্রী যেভাবে তরমুজের দিকে তাকাল তাও যেন ওর কাছে অপরিচিত ঠেকাল। অভাবের কারণে তার স্ত্রীর ধৈর্যের বাঁধ যেন ভেঙে গেছে, হয়তো তাও নয়, বাবরুখানই হতে পারে! তরমুজ আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না, ছুটে গেল মূলঘরের দিকে। চৌকির নিচ থেকে হাত বাড়িয়ে সিঁদকাঠি টেনে এনে চোখের সামনে তুলে ধরল। মরচে ধরে গেছে। শিলপাথর দিয়ে বারান্দার এককোণে বসে সিঁদকাঠি ঘষতে লাগল, একমনে; যতই বাবরুখানের কথা মনে হচ্ছে ততই জোরে জোরে হাত চলছে। জীবনে নানা আঘাত সে টের পেয়েছে, কিন্তু বাবরুখানের বাড়িতে তার স্ত্রীর ঝিগিরি করার কথাটি যেন আর সহ্য করতে পারছে না। শরীর মরে গেলেও মন তো আর মরেনি, তার স্ত্রীর মনের মধ্যে যে ব্যথা গোপনে বাস করছে তা সে রন্ধ্রে রন্ধ্রে উপলব্ধি করছে। যদিও শরীর ছাড়া জীবনের স্বাদ পাওয়া যায় না, শরীর বাদ দিলে নারী ও পুরুষ আলাদা আলাদা দ্বীপের মানুষ হয়ে যায়, তবুও সে যেন সেই শরীরকেই বিশ্বাস করতে পারছে না। এখন তাকে কিছু-একটা করতে হবে। চারদিকে জলের শব্দ, এরইমাঝে দূর থেকে একটি লক্ষ্মীপেঁচার ডাক তার কানে ভেসে এল, এ-যেন বৃষ্টিভেজা রহস্যময় রাতের সুর বয়ে আনা ভালোবাসার আহ্বান। এই নির্মম সত্যকে সোজাসুজি প্রকাশ করলে সমাজের বন্ধন থেকে সরে আসতে হবে তাকে, বা সমাজের স্বীকৃতি থেকে বঞ্চিত হতে হবে; গভীর রাত হয়নি বলেই হয়তো কিছুই প্রকাশ করতে পারছে না সে; তবে অন্ধকার গভীর হচ্ছে, বৃষ্টির বেগও বেড়ে চলেছে। কখন যে তার স্ত্রী উনুন নিভিয়ে, রান্নাঘরের মেঝেতে পাটি বিছিয়ে, তার পাশে এসে দাঁড়াল, কখন যে ওর শরীরের ঘ্রাণ তাকে জড়িয়ে ফেলল, সে টের পায়নি। আশ্চর্য! এই নারীই একসময় তার ভালোবাসার মানুষটিকে আহ্বান জানাল, ভাত খাওয়ার জন্য।

ঘুম থেকে জাগিয়ে হুরুত্তা-দুটো নিয়ে তরমুজ পাটিতে বসল অর্ধবৃত্তাকারে, আর তার স্ত্রী একমনে খাবার পরিবেশন করতে লাগল। স্বামীর থালায় একটি ডিম, নাম-মাত্র তেলে ভাজা একটি মিষ্টি কুমড়োর ফুল ও ঝিঙের তরকারি তুলে দিল। একইভাবে সাজিয়ে দিল সন্তানদের থালাও, শুধু অপর ডিমটিকে দু-ভাগে বিভক্ত করে নিল। থালাতে হাত দিতেই তরমুজ ভাবল, পেট বোঝাই করে খেলে এমনি এমনি ঘুম চলে আসবে, ছুটতে কষ্ট হবে; তবুও লোভ সামলাতে পারল না; তার

স্ত্রীর রান্নায় অপূর্ব গুণ আছে, সে যা রাঁধে সবকিছুই যেন সুস্বাদু, রান্নার গন্ধেই হৃদয় ভরে ওঠে তৃপ্তিতে। তরমুজ বড় শিরের সবগুলো দানা পেটে ঢুকিয়ে নিলেও, সারা জীবন মন্দ-মানুষের মধ্যে কাটালেও, অনেকটা ময়লা গায়ে লাগালেও, অর্ধেকটা ডিম একপাশে রেখে দিয়ে সস্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তার স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে রইল। তার মনে অভাব-অনটনের মধ্যেও ভালোবাসার মানচিত্রটি রচনা হয়ে চলল। আর তার স্ত্রী থালা-বাসন ধুয়ে, বেউ-ছিক্কি এনে স্বামীকে জড়িয়ে বলল, 'চুরি করা গুনা। আত[৪৮] কাটা যাইব।' তার হৃদয়ের গভীর যন্ত্রণার জায়গা থেকেই কথাগুলো বলল, কিন্তু তরমুজের মগজ ছাপ্পান্ন, তবুও নিজেকে সামলে নিয়ে, মনের কথা গোপন রেখে যুক্তি দিল, 'নিজর হুরুত্তার পেটত ভাত নাই। চাচিজির ঘরঅ চাউল নাই। তাও চুরি করতাম না। কিন্তু এখন নিজর মানসম্মান ঠেকাইবার লাগি চুরি করন লাগব। এছাড়া আর রাস্তা নাই। আল্লাহ যদি আমার মানইজ্জত রাইখা তাকইন চোদরি-বাড়ির ধন-ভাণ্ডারে, তখন চুরি ছাড়া আর কিতা করার আছে? তা অইলে কামটা তো আল্লার ইচ্ছায় অইতাছে। কু-কামেরও যুক্তি আছে—বুঝচ্চনি।' তরমুজের যুক্তি তো আর তার স্ত্রী বুঝে না, সে বলল, 'তোমার পাও দরি[৪৯], তুমি যাইবা না।' স্ত্রীর দিকে না-তাকিয়ে তরমুজ রাগের মাথায় বলল, 'চুতমারাউনি, তুই কিতা বাবরুখানর শরীর মারা দিবায়, টাকা পাইবার লাগি। চুরিত না যাইলে তোরএ বাবরুখান'র আত তাকি বাঁচাইবার লাগি আর কনঅ[৫০] উপায় চউকে[৫১] দেখরাম[৫২] না।' ধপ করে বসে পড়ল তরমুজের স্ত্রী। চোখে আঁচল। মেয়েদের কত কিছুতেই কাঁদতে হয়, তার কী হিশেব আছে! তার স্ত্রীকে সে কাঁদতে অনেক দেখেছে। যদিও সে জানে, স্ত্রী ছাড়া তার আর কেউ নেই, তবুও ঘরে বসে এরকম কান্না দেখার ইচ্ছে তার নেই। তার মনের মধ্যে দপদপ করে জ্বলছে বাবরুখান। বৃষ্টির গভীরতা কোমল হয়ে এলেও পিটুর পিটুর চলছে, উঠোনের মাটি কাদা না-হলেও শক্ত নয়, আর যে-জায়গা কিছুটা টানটান ছিল তাও পিচ্ছিল হয়ে গেছে, পা ধরানো কঠিন। তরমুজের কাছে তার সংসারের ক্ষুধার চেয়েও বেশি বাবরুখানের হীনদৃষ্টি থেকে নিজেকে রক্ষা করা। তার কথা বলার সময় নেই, তবুও বলল, 'হে আল্লাহ মানসম্মানএ আমারে ফিরাইয়া

৪৮. হাত।
৪৯. ধরি।
৫০. কোনও।
৫১. চোখে।
৫২. দেখি।

আইন্‌অ[৫৩]। আমার তাকদির তোমার লেখা মোতাবেক কাম করতাছে। আমার দোষ নিও না হে খোদা। তোমার হুকুম ছাড়া গাছ'র পাতাও লড়তে[৫৪] পারে না। তোমার হুকুমঐ চল্লাম।' খালি ভার কাঁধে নিয়ে সে রওয়ানা দিল। একসময় সে পৌঁছে গেল চৌধুরী-বাড়ি। পাঁচিল টপকে আমবাগানে এসে দাঁড়াল। বিলাশ আমগাছের ঝুলন্ত ডালটি বেয়ে ছাদে পৌঁছানো সম্ভব। তখনই তার মনে পড়ে গেল, যদি চিলেকোঠার দরজা বন্ধ থাকে তখন উপায় কী হবে! বিশাল আমগাছটি ঘেঁষে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে একদৃষ্টিতে সবকিছু পরীক্ষা করতে লাগল। পূবালী ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। দক্ষিণ দিকের একটি ঘর থেকে আবছা আবছা শব্দও ভেসে আসছে, হয়তো সে-ঘরে চৌধুরী-বাড়ির বড় দামান্দ আশ্রয় পেয়েছে; সকালেই তো সে ফিরে যাবে তাই হয়তো তার স্ত্রীকে শেষবারের মতো আদর করছে। তরমুজ মনে মনে বলল, আরকটু জিরাইতে অইব। জামাই-বউর শরীর দখলা-দখলি হেষ হুক। বিশাল আমগাছের তলায় অপেক্ষারত তরমুজ এক বোতল সরষের তেল টুকরি থেকে বের করে হাতে, পায়ে, বুকে, পিঠে চপচপ করে মাখতে লাগল; কেউ তাকে ধরলে সহজেই যেন পিছলে যায়। বৃষ্টি আবার শুরু হয়েছে। বৃষ্টির জল আমপাতা গলে ফোঁটা ফোঁটা হয়ে গড়িয়ে পড়ছে; পড়ছে তার মাথায়, পেট বেয়ে কোমরে, চুল বেয়ে, পিঠ বেয়ে একেবারে কোলে। পড়ুক। ঠাণ্ডা লাগছে তো লাগুক। সে একসময় উঠে দাঁড়িয়ে লুঙ্গি খুলে একমনে তেল মাখতে লাগল, শরীরের অবশিষ্ট অংশে, কোনও জায়গাই বাকি রইল না। তেল মাখা শেষ হলে লেঙটি পরে মাথায় গামছা জড়াল, চট করে কেউ যেন তাকে চিনতে না পারে। আবার বসল বিশাল আমগাছের নিচে। কয়েক মিনিটে বৃষ্টির জল গামছা ভিজিয়ে, কালো লেঙটি জুবিয়ে চামড়া পর্যন্ত পৌঁছে গেল। সেদিকে তার খেয়াল নেই, ওর নজর দক্ষিণের ঘরে। মান্ধাতার আমলের জানালার ফাঁকে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, হারিকেনের আলোতে মশারির দোলন, মানুষের নড়াচড়া। আস্তেধীরে উঠে দাঁড়াল আবার। একটু এগুতেই বেগুন গাছের কাঁটায় গুতো লাগল, তবে অন্ধকারে বেগুন দেখা যাচ্ছে না। কুকুরের সাড়াশব্দও নেই। শুনেছে শৌচাগারে পেতনী থাকে, পেতনীর বদলে পরীও তো হতে পারে! এই স্থান দিয়ে দিনের বেলাই কেউ চলাফেরা করে না, তবে পেতনী আর চোর যে সহোদর ভাই, রাতের বেলায়ই তাদের চলাফেরা। হঠাৎ তরমুজের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল,

৫৩. এন্।
৫৪. নড়তে।

নিশাচর চোর হলেও তার মনে এরকম ভয় জাগতেই পারে, হাত-পা পাথর হয়ে যাচ্ছে যেন। সে মনে মনে বলল, লক্ষ্মী যদি পরাণে বাঁচায়। কীসের নড়াচড়া—একটি শব্দ তার কানে ভেসে এল। মানুষ নয় তো! দেখে, একটি বিড়াল ইঁদুরের পিছু পিছু দৌড়াচ্ছে। একটু পরেই বিড়ালটি অন্ধকারের আস্তর ভেদ করে পৌঁছে গেল দক্ষিণের বারান্দায়। না কোনও মানুষ জেগে নেই; সমস্ত বাড়ি জুড়েই শুধু অন্ধকার আর স্তব্ধতার রাজত্ব চলছে। শুধু দূর থেকে মাঝেমধ্যে নিশিপলকের হাঁক ভেসে আসছে। অন্য কোনও দিকে তরমুজ ঢোকার পথ খুঁজে না-পেয়ে রান্নাঘরের পশ্চিমের বারান্দায় পৌঁছে মনে মনে বলল, কিছুদিন আগ্ আমি চোদরি-বাড়ির পাকঘরর[৫৫] টিন ঠিক করতে আইছলাম[৫৬]। তখন দেখছিলাম, পাকঘরর পছমর[৫৭] বেড়ার গালাত[৫৮] এক মটকি চাউল আছে। ঐ মটকিত যখন তারা চাউল রাখইন তখন কমবেশি রিজিকের সন্ধান পাওয়া যাইব। বৃষ্টির জল পড়ে বারান্দার মাটি নরম হয়ে গেছে। সিঁদকাঠি দিয়ে কয়েকবার আঘাত করতেই এমনি এমনি মানুষ ঢোকার পথ হয়ে গেল, খোলাসা দরিয়া যেন। ঘরে ঢুকে সে দেখল মটকি ভর্তি ঠিকই চাল আছে। যে-পথ দিয়ে ঢুকেছে সে-পথের কাছেই রাখা হয়েছে মটকিটি। তারই পাশে পশ্চিমের দরজা। এটি খুললে যে-পথের সন্ধান মিলবে সে-পথ সহজেই নিয়ে যাবে পুকুরপাড়ে, বাঁশবনে। দরজাটি আস্তেধীরে খুলে মটকির নিচে টুকরি রাখার জায়গা করে নিল তরমুজ। তারপর বাঁকা রডের মাথা দিয়ে এক আঘাতে ছিদ্র করে ফেলল। মটকি থেকে রডটি সরিয়ে নিতেই হরহর করে চাল পড়তে লাগল। তখনই তার দৃষ্টি পড়ল রান্নাঘর ও মূলঘরের মধ্যকার দরজাটির উপর। এগিয়ে এল। হাত দিয়ে একটু ধাক্কা দিতেই আপনা থেকে খুলে গেল। অবাক! দরজা তো খোলার কথা নয়, হয়তো কেউ শিকল তুলতে ভুলে গেছে। মহাজনের অমনযোগে দরজা খোলা থাকায়, অন্ধকারে তার ধন চুরি করার আনন্দে তরমুজের লোভ চকচক করে উঠল। অন্ধকার ভেঙে মূলঘরে পা দিতে-না-দিতেই সে উপলব্ধি করল সারা ঘরময় ঘুমন্ত মানুষের ঘুমন্ত হাওয়া নিঃশব্দে বইছে। এমন নিঃস্তব্ধ পরিবেশে তরমুজের বিনা কষ্টে, নিঃশব্দে, মহাজনের ধন লুটে নেওয়ার উত্তেজনা আরও তীব্রতর হতে লাগল। করিডোর মাড়িয়ে এগিয়ে চলল। যে-ঘরে চৌধুরীর মেয়ে ও তার স্বামী শুয়ে আছে

৫৫. রান্নাঘরের।
৫৬. এসেছিলাম।
৫৭. পশ্চিমের।
৫৮. নিকটে।

সে-ঘরের সামনে পৌঁছতেই দেখল, দরজার ফাঁকে ঘরের ভেতর থেকে লণ্ঠনের মৃদু আলো বাইরে আসছে; হয়তো ভেতর থেকে ভালোভাবে দরজা বন্ধ করা হয়নি। বাঁকা রড দরজার ফাঁকে রেখে মৃদু আঘাত করতেই কপাট একটু শব্দ করে খুলে গেল। আস্তেধীরে ঘরে প্রবেশ করল সে। ঢুকেই দেখে, শিশুকে একপাশে রেখে স্বামী-স্ত্রী জড়াজড়ি ভাবে শুয়ে আছে; আর ছোট টেবিলে সযত্নে রাখা বেশখানিক দুধ পড়ে থাকা বোতলটি নিঃশব্দে যেন তার কর্মকাণ্ড দেখছে। সে এগিয়ে এসে বোতলে হাত দিতেই বুঝল, দুধ হিম হয়নি; হয়তো কিছুক্ষণ আগে দুধ তৈরি করতে গিয়ে মেয়েটি দরজায় শিকল তুলতে ভুলে গিয়েছিল। ঘুমন্ত মানুষগুলোর দিকে আরেকবার তাকাল। মেয়েটির ঘুমানোর ভঙ্গি যেন তার স্ত্রীর মতো, তবে এই মেয়েটির পরনে দামি শাড়ি ও হাতে স্বর্ণের চুড়ি। ঘুমন্ত মুখের একপাশে, নিঃশব্দে বসে থাকা নাক-ফুলটি তার স্বামীর সঙ্গে শুয়ে-থাকা সুখের অনুভূতিগুলো মাথা উঁচু করে প্রকাশ করছে; তবে তার গলা গহনার ভারে কেমন যেন বিষণ্ন দেখাচ্ছে, হয়তো-বা তার প্রিয় মানুষটি আগামীকাল তাকে ছেড়ে চলে যাবে এজন্যে বিলাপ করছে। তরমুজ হাত বাড়িয়ে গহনাগুলো সহজেই তুলে নিতে পারে, কিন্তু নিশীভিযানের সাফল্যের মধ্যেও কেমন যেন করছে তার অন্তর। পরম আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও সে তুলতে পারল না, বরং লণ্ঠনের আলো নিভিয়ে, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, খাটের পাশে রাখা ব্রিফকেস, ড্রেসিংটেবিলে রাখা অলঙ্কারের কৌটা ও হাতের কাছে যা-কিছু মূল্যবান জিনিশ রাখা আছে সবই তুলে নিল। তারপর ঘুমন্ত মানুষের রাজ্য অতিক্রম করে নিঃশব্দে ফিরে এল রান্নাঘরে। টুকরি চালে ভরে গেছে। অন্য টুকরিতে মূল্যবান জিনিশপত্র রেখে কিছু চাল ছড়িয়ে ঢেকে নিল। তারপর ভার কাঁধে চেপে, বাঁশবনে হারিয়ে যেতে সময় নিল না।

রাত থাকতেই বাড়ি ফিরে এল তরমুজ। ঝিঙে লতায়, বৃষ্টিভেজা ঝিঙে পাতার ফাঁকে, চুপিসারে, হালকা হাওয়া চামর বুলিয়ে যাচ্ছে। ঝিঙে লতাও কথা বলছে, তবে শোনার কান চাই, শুনলেই জানা যাবে, নীরবে সে বৃষ্টিভেজা পৃথিবীর কাণ্ড দেখে ঠাট্টা করছে, আনন্দ পাচ্ছে। এই আনন্দই হয়তো তরমুজ তার স্ত্রীর পাশে শরীর এলিয়ে দিয়ে কাঁথার ভাঁজে ভাঁজে খুঁজে নিতে চাচ্ছে। এই অন্ধকারে, তরমুজ তার স্ত্রীর দেহের প্রত্যেকটি ভাঁজ আবারও চিনে নিচ্ছে। শরীর দিয়েই তো মানুষ মানুষকে জানে। শরীরই হচ্ছে আদি ভালোবাসার উৎস। মানুষের শরীর না-থাকলে জীবনে আর কীই-বা থাকতে পারে! হঠাৎ তরমুজের স্ত্রী বলল, 'কেউর ঘুম ভাঙল না?' কিন্তু তরমুজ তার স্ত্রীর শরীর ভাঙতে ব্যস্ত; ব্যস্ত অবস্থায়ই বলল, 'আশ্বিন মাসর মেঘর রাইত, ভাত খাইয়া ঘুমাইলে কিতা

কেউর হুশটুশ তাকে[৫৯] না কিতা? আর আমারই হুশ আছলনি অন্য কুছতা দেকবার[৬০], কাম হাসিলর কুসিতে[৬১]।' তরমুজের শরীর তার স্ত্রী, নিজের মনের কষ্ট ভুলে গিয়ে, দখল করে নিয়েছে। আর তখনই তরমুজ মনে মনে বলতে লাগল, বাবরুখান'র হারাইবার কষ্ট ভুলইয়া যাইত চায় আমার শরীর খাইয়া। আর প্রকাশ্যে, বিড়বিড় করে বলল, 'বাবরুখানর আর খাওন লাগব না। আমারে খাইয়াই তুষ্ট হুক[৬২] তোর পরাণ।'

তখনও ঘুমিয়ে থাকা ঝিঙে-ফুলের উপর বৃষ্টি পড়া বন্ধ হয়নি।

৫৯. থাকে।
৬০. দেখার।
৬১. খুশিতে।
৬২. হোক।

স্নান

ডানদিকের মোড়ের বাঁকে চেশায়ার স্ট্রিট; তারই শেষপ্রান্তে অবস্থিত একটি স্নানাগার। এখান থেকে অমলের বাসা আধমাইল। এক শনিবার অমল এই আধমাইল পথ পেরিয়ে, নিশ্চুপে ব্রিকলেনের বাঙালির মুখের দিকে একটু তাকিয়ে, পুরাতন একটি ফ্যাক্টরির পাঁচিল ঘেঁষে, মাথাভাঙা ওক গাছটিকে পাশ কাটিয়ে, জুতোর শব্দের সঙ্গে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলা পত্রিকার পাতাগুলো শীতের ঠাণ্ডা বাতাসের সঙ্গে এলোমেলোভাবে উড়িয়ে, তার বন্ধুর দেওয়া ঠিকানায় এসে উপস্থিত হল। স্নানাগারের বাতাস হুঁকোর ফুটোয় মুখ লাগিয়ে দম ধরে থাকা অবস্থা যেন। গরম করে রাখা স্নানাগারে প্রবেশ করে, অসহনীয় শীতের কবল থেকে মুক্তি পেয়ে অমল হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। কী শীতরে বাবা! আষ্টেপৃষ্ঠে আঁকড়ে ধরে। শীতের দারুণ রোষের বিরুদ্ধে শক্তি ব্যয় করে তবুও স্নানার্থীরা এখানে আসে। উপায় কী! সতেজ থাকার আয়োজন কেই-বা বন্ধ করতে পারে! আজ অবশ্য স্নানার্থীর সংখ্যা কম; উত্তেজনা নেই, উচ্ছ্বাসও না, সবেমাত্র শুরু হয়েছে বোধ হয়। এখানে পৌঁছতেই অমলের মনে সৃষ্টি হয়েছে হেমন্তের নরম রোদে পাকাধানের গড়াগড়ি যেন।

তোয়ালে-সাবান-শ্যাম্পুর দর-লেখা ঝুলন্ত বোর্ডের নিচে এক মধ্যবয়সী গোরা কাউন্টার জুড়ে বসে আছে; তার গায়ে ময়লাযুক্ত, এলোমেলো দাগকাটা একটি টি-শার্ট। লাইন ধরে অমল এগুতে লাগল। হঠাৎ জানালার পাশ থেকে একটি বিড়াল ঝাঁপিয়ে পড়ল টেবিলের ওপর, পাতাঝরার মতো নিঃশব্দে। তারপর পা টিপে, সন্তর্পণে এগিয়ে এল গোরার দিকে। ফিকে-নিকষ-হিমেল আলো ভেঙে গোরা হাত বাড়িয়ে বিড়ালের পিঠ ছোঁয়াতেই সে যেন কেমন নড়ে উঠল; পশমে ছোট ছোট তরঙ্গ, মৃদু কম্পন সৃষ্টি হল। ক্ষণিকের জন্য সে নিশ্চল দাঁড়িয়ে থেকে গোরার হাত ও বাহু বেয়ে টেবিলের নিচে লুকিয়ে যাওয়ার মতলব খুঁজতে লাগল। তারপর মৃদু-হাওয়ার ধাক্কায় টেবিলের ওপর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা কাগজগুলো নাড়িয়ে, টুপ করে মেঝেতে পড়ে, দৌড়াতে লাগল, দৌড়ানোর চাল সে জানে। এমন অদ্ভুত বিড়াল কখনও অমল হাত বুলিয়ে দেখেনি, জীবনান্বেষণে এরকম অদ্ভুত প্রাণীকে আপন করে নেওয়ার কথা সে হয়তো আগে ভাবেনি। বিড়ালটি অদৃশ্য হয়ে গেল চেয়ারের পিছনে, কিছুক্ষণের জন্য, তারপর ফিরে এল; সে জানে সচেতনভাবে পা ফেলে দ্রুত হাঁটতে; কখনও সামান্য বেগে, আবার কখনও তার মাঝামাঝি—সবই যেন অমলের কাছে এক

আশ্চর্য অভিজ্ঞতা।

অমলের সামনের লোকটি একটির বদলে দুটো তোয়ালে তুলে নিল। দু-হাতে সোনালি রোম, পেশির গঠন অত্যন্ত ভালো, কী সাংঘাতিক ভাষা, এ-ভাষায় যে-কোনও কামুক নারী মাংসের সন্ধান করবে। পাশ থেকে একটি নারীর চঞ্চল সুর ভেসে এল, এর মধ্যে যেন একটি পুরুষহীন জীবনের হাহাকার প্রকাশ পেল। বিড়ালের সঙ্গে অমলও শিউরে উঠল। নারীটির দিকে না-তাকিয়েই অমল লোকটিকে অনুসরণ করল। গা ঘষা ও মোছার জন্য আলাদা তোয়ালের প্রয়োজন বই কী! সঙ্গে একটুকরো সাবান ও একটি শ্যাম্পুর প্যাকেট চেয়ে নিল কাউন্টারে বসা লোকটির কাছ থেকে। তারই নির্দেশে বারান্দায় পাতা একটি বেঞ্চে সে বসতে-না-বসতেই অপর বেঞ্চে বসা স্বজাতির একজনকে দেখতে পেল। তাঁর কাছে উঠে যেতেই তিনি বাংলায় সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে সম্বোধন করলেন; অমল যে তার স্বজাতি তা বলে দিতে হয়নি; চেহারাই তার বাস্তব প্রমাণ—বিবর্তনের পথ ধরে প্রকৃতি যে তাকে বাঙালি করে সৃষ্টি করেছে এ-বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ রইল না। ভদ্রলোকের পাশে বসল অমল। কুশল-মঙ্গল আদান-প্রদানের পর তিনি গল্পের ঝাঁপির মুখ খুলে দিলেন। গল্পের স্রোত শুধু দৃশ্যাগতই হল না, হঠাৎ বিচিত্রভাবে মোড়ও নিল। এদিকে কেমন করে মোড় নিল তা অমলের কাছে অজানা। এই কাহিনীর সঙ্গে সম্বন্ধ বা যোগাযোগ আছে বলে তার মনে হল না, তবে সে গল্পটিকে যুক্তি বা অর্থপূর্ণতা দিয়ে বিচার করার জন্যেই হয়তো উৎসাহের সঙ্গে শুনতে লাগল; হয়তো-বা শুনতেও চায় না, তবুও নিজেকে নিমিজ্জিত করে রাখল। ভদ্রলোক বলে যেতে লাগলেন, 'আমি চার বছর পর দেশে ফিরে ছ-মাসও থাকতে পারিনি। যাওয়ার আগেই আমার একমাত্র ভাই একখণ্ড জমি খরিদের সর্বাঞ্জাম করে রেখেছিলেন। এমতাবস্থায় আমি গ্যাঞ্জাম করলে ভাইটি আমার মানবে কেমন করে!' অমল বলল, 'বটেই তো! হয়তো তাঁর মনে অন্যকিছু ছিল।' অনিচ্ছে সত্ত্বেও ভদ্রলোক মাথা নেড়ে স্বীকার করলেন, তারপর আস্তেধীরে স্তব্ধ উত্তেজনা জড়িত অকম্পমান কণ্ঠে বললেন, 'অবশ্য স্ত্রীও ঠিক করে রেখেছিলেন, তবে সে একা আমার আর জমিখণ্ডটি তার। যেমন করে তার হয়ে গেল আমার ভালোবাসার মানুষটিও। সে এখন আমার বৌদি।' 'বৌদি' শব্দটি অমলের চোখের সামনে আরেকটি মুখের ঝাপসা চিত্র ফুটিয়ে তুলল। যে মুখটি সবসময় থাকত নিবিড় জিজ্ঞাসায় উন্মুখ, উদ্বেগে আক্রান্ত। সেই মুখওয়ালা মানুষটি একদিকে যেমন লাগাম টেনে ধরত তেমনি অন্যদিকে শক্ত চাবুক চালাত; আর চাবুকের দুরন্ত আঘাতে অমলের হৃদয়ের একদিকে যেমনি দুর্লজ্ঘ্য নিয়তির স্বরূপ প্রকাশ পেত ঠিক তেমনি অন্যদিকে যন্ত্রণার তীব্র দাহ মগজে দাগ

কাটত, যা ছিল তার কাছে নিষ্ঠুর আর রহস্য মিশানো একরকম অনুভূতি। অমল সেই মুখ থেকে তার দৃষ্টি ফিরাতে পারত না। মুখটি ছিল তার বৌদির। এই বৌদি পৌষের এক সকালে, অনেক দিনের গম্ভীরগভীর কঠিন যবনিকা ছিঁড়ে, দেবর-বৌদির পরিচয়ের অন্তরাল থেকে বেরিয়ে এসে নিজেকে নতুনভাবে প্রকাশ করল। সে রান্নাঘরের দাওয়ায় অমলকে ডেকে পাটি বিছিয়ে নরমগরম চিতই পিঠা খাওয়ার আয়োজন করেছিল, যা ছিল অভাবিত। এই আহ্বানে সাড়া না-দেওয়ার ভাষা অমলের কাছে ছিল অজানা। সে পাটিতে বসতেই বৌদি তাকে কোনও প্রকার সম্বোধন না-করেই, কিছু না-বলেই, ঠোঁটের কোণে হাসির প্রলেপ মেখে একমনে থালা সাজাতে লাগল। অমলের বুকে চিকচিক করে উঠল বিব্রতকর অস্থিরতা, কিন্তু তা প্রকাশ করতে পারল না, বরং পাথরের মূর্তির মতো স্থির হয়ে বসে রইল, তবে বাড়ির পাশের খেজুরক্ষেত থেকে তুলে আনা খেজুর রসের বাটিটি থালার মাঝখানে নীরবে সাঁতার কাটতে লাগল। স্থির হয়ে বসে থাকা অমল পিঠার ঘ্রাণের মধ্যে একটি নতুন অদৃশ্য ছবি অনুভব করল। যখন তার মগ্নতা ভাঙে তখন খেজুর রসে পিঠা ডুবাতে গিয়ে বৌদির দিকে পলকহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। সেই মুখ, সেই দৃষ্টি সে ভুলতে পারে না; সেই চাউনি, সেই গুড়ের স্বাদ তার চোখেমুখে আজও লেগে আছে। অতীত থেকে ফিরে এসে অমল বলল, 'মানে?' একলাফে ভদ্রলোকের বয়স কয়েক গুণ বেড়ে গেল। আক্ষেপের সঙ্গে মাথা নেড়ে, ধসে যাওয়া কবরের তলা থেকে উপচে আসা চাপা কান্নার মতো বললেন, 'মানেটা সহজ। ভাই বললেন, 'আলের জমিন খরিদ না-করলেই নয়। আর তোর ভাবীর চুড়িগুলো যেমন-তেমন করে গড়ে দিতেই হয়।' তার ভোগের জিনিশ তো আগেই সামলাতে হয়, তাই জমির দলিল রেজিস্ট্রি করা ও আমার ভালোবাসার মানুষটির জন্য স্বর্ণের চুড়ি গড়ে দেওয়া বাঞ্ছনীয় হয়ে পড়ে। একান্নবর্তী পরিবারের সুখ-সুবিধা আর গুণগাথাকীর্তন করতে করতে গাজীর বয়ানের মতো আমি আম্মার সুরে সুর মিলাতে না-পেরে পালিয়ে এলাম একপ্রকার অতিষ্ট হয়ে।' অমলের সাম্যক ধারণা নেই লোকটির গন্তব্যের সঠিক দূরত্ব কতটুকু। ভদ্রলোকের স্বরে বিস্ময়ের একটি সুর মিশে আছে, যা অভূতপূর্ব, এমন কথা সে আগে কখনও শোনেনি। লোকটির মুখের দিকে তাকিয়ে অমল কী যেন ভাবছে, কে জানে; শুধু তার ঠোঁটের ফাঁকে বেরিয়ে এল, 'অ!' ভদ্রলোকটি তার বসার স্থান পরিবর্তন করলেন; অমল মুখোমুখি বসল, তবুও ভদ্রলোকের ভঙ্গি দেখে কিছুই বোঝা গেল না, শুধু তার স্বচ্ছদৃষ্টিতে দেখতে পেল, মুখে অস্তগামী সূর্যের রক্তাভা লেপটে আছে; তবে হৃদয়ে গাঢ় অন্ধকার, চামড়ায় শীতের হাওয়া, চোখের পাতায় পৌষের কুয়াশা, আঁখিতে নিস্তেজ অশ্রু;

আর তার দেহ—বিলাতি কষ্টিপাথরের ধাক্কা খেতে খেতে কেমন যেন ঝরে পড়েছে। এমন সময় স্নানাগার-পরিচর এসে জানাল, 'বাথ প্রস্তুত।' বেঞ্চ ছাড়তে উদ্যত হলেন ভদ্রলোকটি। অমলের অন্তরে ফস করে দিয়াশলাইয়ের আগুন যেন জ্বলে উঠল; কিন্তু আর্তনাদ করল না, শুধু বিভীষিকা সৃষ্টি করল, হ্রেষাধ্বনি যেন। চুপ করে পকেট থেকে রুমাল বের করে চশমার কাচ মোছে তোয়ালে-সাবান-শ্যাম্পু হাতে নিয়ে উঠে পড়লেন ভদ্রলোকটি। তিনি হাঁটতে হাঁটতে, লোহার বড় পিলারের কাছে পৌঁছে, থমকে দাঁড়ালেন। সর্বস্ব লুণ্ঠিত হয়ে যাওয়ার পর মানুষকে যেমন বিপর্যস্ত-বিভ্রান্ত দেখায়, এরসঙ্গে ভদ্রলোকটির তেমন কোনও পার্থক্য দেখতে পেল না অমল, তাই হয়তো তার অন্তরাত্মা কেঁদে উঠল, শিরদাঁড়ও। নুয়ে কাৎ হয়ে পড়ে থাকা ধানগাছের মতো যেন ভদ্রলোকটিকে তার কাছে মনে হল। এই বিশাল ঘরের এককোণে গরম করে রাখা বাতাসে হঠাৎ সে কেমন যেন ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা অনুভব করল; আর তার অন্তরে অন্যরকম ব্যথা সৃষ্টি হল। এই ব্যথা থেকে বাঁচার জন্যই হয়তো সে ঝাঁপ দিল অতীতে, বৌদির হাতে বানানো পিঠায়, যা ছিল তার খুবই প্রিয়। তার খাবারের ভঙ্গি দেখে বৌদি বলল, 'পেট ভরে খেতে হবে।' খেতে খেতে যখন থালার শেষ পিঠাতে হাত পড়ল তখন বৌদি যোগ করল, 'লজ্জা করছো কেন? চাল ভিজিয়ে, গুঁড়ো করে পিঠা বানাতে আর কতক্ষণ লাগে বলত!' বৌদির সেই কথা মনে পড়তেই চমকে উঠল অমল। ভদ্রলোকটি আরেকবার পিছন ফিরে তাকালেন, আর অমল গভীর বিস্ময়ে তার অশ্রুসিক্ত মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর তিনি ঘাড় ঘুরিয়ে হাঁটতে শুরু করলেন, কিছুক্ষণের মধ্যেই অমলের দৃষ্টির আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। অমলের মন বিহ্বল হয়ে নীরবতার মধ্যে ডুবে গেল। এই নীরবতার মধ্যে সে খুঁজতে লাগল তার বৌদিকে আবার, যার সন্ধান পেল তা আমনের ক্ষেত, মাঠ, বিল, বাড়িঘর, উঠোন, গোয়ালঘর, তারপর এক ভোরবেলা—ভোরবেলাটি ছিল স্বর্গের চেয়েও সুন্দর। পুবের আকাশকে ফর্সা করে সূর্য উঠেছে। দূরে নদীর ঘটে লাল, নীল, বেগুনি রঙের সারিসারি নৌকা দাঁড়িয়ে আছে, যেন জন্তুর মতো। ভাঙা পাঁচিল টপকে বেরিয়ে পড়েছে হাঁস-মোরগ। একটি ঝ্যাঁটার শব্দে বাড়িটি মাতাল হয়ে উঠেছে যেন, এরইসঙ্গে ঘরের মধ্যে একটু-আধটু করে সদস্যদের জেগে ওঠার শব্দও। ঝ্যাঁটার শব্দ সহ্য করতে না-পেরে অমল পুকুরের শ্যাউলাঘন জলের দিকে এগিয়ে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যে ঝ্যাঁটার শব্দ থেমে গেল; থেমে গেল তার স্মৃতিচারণও। বাস্তবে ফিরে এল সে। স্নানাগার-পরিচরের আহ্বানের জন্য অপেক্ষা করতে তার আর সহ্য হচ্ছে না, তাই হয়তো 'ভিজিটরস্ লন্ডন' পকেট-বুকে মনোনিবেশ করল। আন্ডারগ্রাউন্ডের

অবস্থান মনের মানচিত্রে এঁকে নিতে চেষ্টা করল। কিন্তু এ কী! ম্যাপে দেখা যাচ্ছে পাঁচ-ছয়টি লাইন, এক-একটি স্টেশনের গা বেয়ে একাধিক দিকে চলে গেছে, টেমস্ নদীকে ছয় স্থানে ক্রস করে। ছয়টি সুড়ঙ্গ পথ! ব্রিকলেন অঞ্চলের অধিবাসীদের জন্য নিকটবর্তী পাতাল রেলস্টেশন হচ্ছে অলগেইট ইস্ট। এখানে দুটো লাইন দেখা যাচ্ছে—একটি ডিস্ট্রিক্ট, অপরটি মেট্রপলিট্যান। অন্য লাইনের ট্রেনে উঠলে হয়তো অলগেইট ইস্ট স্টেশনে পৌঁছানো সম্ভব নয়; তবে কী করে বুঝবো যে, এ-ই হচ্ছে মেট্রপলিট্যান লাইন অন্যটি নয়! এ-সম্বন্ধে আমার আরও জানা ও বোঝার প্রয়োজন রয়েছে। এখন কী তাহলে বাসে যাতায়াত করা উচিত? কিন্তু বাসলাইনে দেখা যাচ্ছে অনেকরকম সমস্যা। নির্দিষ্ট কোনও স্থানে যেতে হলে কোন রাস্তায় কোন বাসস্টপে উঠতে-নামতে হবে তা আমার জানা নেই, জেনে নিতে দীর্ঘ অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। কিন্তু...। 'তোমার গোসলের ব্যবস্থা করা হয়েছে।' এটেন্‌ডেন্টের গলায় কথাগুলো ভেসে আসতেই অমলের ভাবনায় যতি পড়ল। মাথা তুলে তাকাতেই দেখল, গ্রামাঞ্চলের মানুষের কাছে পেয়াদা যেরকম অবস্থায় হাজির হয় সেরকম মলিনাবরণে আবৃত একটি লোক তার সামনে এসে উপস্থিত হয়েছে। আগের স্নানাগার-পরিচরটি এরকম ছিল না। তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটির গায়ে শাদা হাতকাটা একটি কোট্, কব্জি পর্যন্ত ওয়াটারপ্রুফ গ্লাভস্—জল নিয়ে কারবার তার কী না, পরনে ট্রাউজারস্—হাঁটুর নিচ পর্যন্ত কালো। জল থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যই বোধ হয় সে একজোড়া বুট পরেছে। আঙুলে ঝোলানো বাথের চাবিগুচ্ছ টুনটান শব্দ তুলছে। অমল বাথরুমে ঢোকার পথে পরিচরকে এক শিলিং দিতেই সে 'থ্যাঙ্ক ইউ' বলে তার কোটের পকেটে রেখে দিল। অমল 'ইউ ওয়েলকাম' বলে বাথরুমে ঢুকতেই পরিচরটি বলল, 'স্নান শেষ হলে আমাকে ডাক দিও, জল বদলে দেব।'

'কি বলে ডাকতে হবে?'

'তুমি বুঝি নতুন এসেছো। ঠিক আছে। বাথরুমের নাম্বার দিয়ে ডাকবে। এই দেখ, দেওয়ালে লেখা আছে, শাট আউট দিস নাম্বার। ওকে।'

'থ্যাঙ্কস্।'

'জলের উষ্ণতা দেখে নাও। তোমার শরীর মানবে তো? ঠাণ্ডা বা গরম যা চাইবে তা-ই পাবে।'

অমল তার ডানহাতের একটি আঙুল জলে ডুবিয়ে আন্দাজ করে নিল জলের তাপমাত্রা। পরিচরের আন্দাজের তারিফ করতেই হয়, তাই সে 'ধন্যবাদ' বলে

বাথরুমের দরজা বন্ধ করে দিতেই তার সামনে এসে উপস্থিত হল আরেকটি সমস্যা, বিব্রতকর অবস্থা, বন্ধু বলেছিল, 'গোসলে যাওয়ার সময় তেল, সাবান, লুঙ্গি সঙ্গে করে নিয়ে যাবি।' কিন্তু কিছুই আনা হয়নি তার। এই দারুণ শীতে বাসা থেকে পা বাইরে আনাই ছিল বীরের কাজ, সঙ্গে ক্যারিয়ার ব্যাগ না-থাকলে অন্ততপক্ষে হাত-দুটো ওভারকোটের পকেটে সহজেই গরম রাখা যায়। 'এখন কী করি!' অমল দিগ্বিদিগ নির্ণয় করতে পারছে না, বাষ্পের তরঙ্গ ভেঙে চলেছে গরম জলের ওপর ভর দিয়ে, চকচকে শাদা বাথটাবের কিনারে মাথাখুঁড়ে মরছে ভিজে শীতল বাতাস। এই শীতল কুয়াশাচ্ছন্ন বাতাসের মাঝে ঝাপসাভাবে সে দেখতে পেল তার বৌদির ভরাটে গোলাপি মুখটি আবার, লাল ঠোঁটে চাপা হাসি, তার চোখ-দুটো যেন অমলের প্রতি কৌতুক আর তুচ্ছতায় একটু কোঁচকানো। অমলের অন্তর ছমছম করে উঠল। বাস্তবতার কাছে কল্পনার কোনও স্থান নেই, তবুও কল্পনার কাছেই হাত পাততে হয় সমস্যা থেকে উদ্ধার হওয়ার জন্য; তখনই বিদ্যুচ্চমকের মতো অমলের বুকের মধ্যে গজিয়ে উঠল কোহাট জীবনের একখণ্ড স্মৃতি। তখন প্রাথমিক ট্রেনিং মানে লেফ্‌ট-রাইট শিখছে। এক দুপুরে রাস্তায় হাঁটতে গিয়ে দেখে, প্রৌঢ় গোছের একজন পাঞ্জাবি, শাদাকালো দাড়ি নেড়ে, দিব্যি গোসল করছেন উলঙ্গ হয়ে। এই উলঙ্গ দৃশ্যটি তার চোখের সামনে দীপ্যমান হতেই সে আন্ডারওয়ার খুলে চিৎ হয়ে সটান শুয়ে পড়ল জলবিস্তৃত বাথটাবে। তার দেহ মিশে গেল জলে; হয়তো মিশে গেলও না, তাই হয়তো তার দেহ ফুলের মতো পালক মেলে কর্কের ন্যায় ভাসতে লাগল। নিজের কাছে নিজেকেই হালকা মনে করছে, 'আহ্ কী আরাম!' গরমজলে এত আরাম সে এর আগে কোনও দিন অনুভব করেনি; সেজন্যই হয়তো দু-বাহু, দু-পা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে গরমজলের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। শরীর ভিজে ধুলোগুলো কালো সেমাইয়ের মতো পাকতে লাগল। তার বুঝতে অসুবিধা হল না যে, দিগম্বর হওয়ার মাঝে এক ধরনের অভূতপূর্ব আনন্দ আছে, এরকম আনন্দোপভোগের জন্যেই বোধ হয় জৈন সাধুরা ধর্মের নামে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে স্বীকৃতি আদায় করে নিয়েছেন; তবে সেই পাঞ্জাবি ভদ্রলোকটি তো মুসলমান ছিলেন, তাহলে তিনি নাঙ্গা হওয়ার স্বাদ পেলেন কোথা থেকে? কাদের দেখে তিনি এ-প্রথা শিখেছিলেন? সঙ্গে সঙ্গে অমলের মনের পর্দায় ভেসে উঠল এয়ারফোর্সে ভর্তি হওয়ার সময়ের একটি ঘটনা। সে মনে মনে বলতে লাগল, জাহাজে করে চট্টগ্রাম থেকে করাচি পৌঁছানো মাত্র আমাকে মিলিটারির গাড়িতে করে নেওয়া হয় মৌরিপুর ঘাঁটিতে। এক বিশাল, লম্বা দালানে বাথরুম ও টয়লেট ছিল। হাত-মুখ ধোয়ার জন্য এই দালানে ঢুকে ডজনখানেক পাঞ্জাবিকে দিগম্বর

বেশে দেখতে পেয়ে আমার চোখ ছানাবড়া হয়ে যায়। ব্যাপারটি তেমন কিছুই ছিল না, তবে নিঃশব্দে ফিরে আসি ব্যারেকে। ইংরেজের সংস্পর্শে এসে হয়তো পাঞ্জাবিরা এভাবে নাঙ্গা হয়ে স্নান করার স্বাদ পেয়েছে। অমল তার ডান-হাতের তালুর সাহায্যে দেহ থেকে ময়লা তুলতে লাগল। ঘামগন্ধভরা নোংরাগুলো মরাগাছের পাতার মতো ঝরতে লাগল বাথটাবে, যেখানে সেখানে। যতই ঘষছে ততই রোমের ভেতর থেকে নিঃশব্দে খসে পড়ছে ধূসর রঙের ময়লাগুলো। ঠাণ্ডা বাতাস অগভীর হিম জলের ওপর ভর দিয়ে মৃদুভাবে তার চোখমুখ ছুঁয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে সে শিউরে উঠল। সেই সকালেও সে শিউরে উঠেছিল, হিমেল বাতাসও বইছিল। সূর্যের ঝাপসা আলো বৌদির সিঁদুর বেয়ে তার মুখের সঙ্গে মিতালি পাততে লজ্জা পাচ্ছিল না। খেটে-খাওয়া রমণীর মতোই বৌদির ভরভরন্ত শরীর। পায়ে রুপোর মল, হাতে রুপোর কঙ্কন। মেদহীন, কোমলাঙ্গী বৌদিকে দেখতে দেখতে দাওয়ায় দাঁড়িয়ে থাকা অমলের মনে কিছুটা উদ্বেগ, কিছুটা আবেগের সৃষ্টি হল; না-পাওয়ার চরম অসন্তোষের ছায়াও হতে পারে! অমলের পাশে পড়ে থাকা বাসি গোবরের ডেলার ওপর মাছি দৌড়াদৌড়ি করছে। একটি বিড়াল ঠোঁট চেটে ম্যাঁও ম্যাঁও করে গরুঘরের চৌকাঠ পেরিয়ে তার পাশ দিয়ে চলে গেল, তারপর উঠোন পেরিয়ে তারাফুলের ঝোপঝাড়ের পাশে লেজ গুটিয়ে বসে পড়ল। অমলকে ভাঙা জানালার পাশে বকুল তলার ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বাসি ফুলের গন্ধ স্থির থাকতে দিল না, মাতাল করে তুলল। গোবর এঁটু হাতে জানালার চৌকাঠ ধরে বাইরে থুতু ফেলতে গিয়ে, মাথা ঘুরাতেই, বৌদির দৃষ্টি স্থির হল অমলের ওপর। 'ওখানে দাঁড়িয়ে এমনভাবে কি দেখছো?' বৌদির প্রশ্নে হিম হয়ে গেল সে। জানালা দিয়ে গলিয়ে আসা সূর্যের ঝাপসা আলো বৌদির বুকের পাশে যেমনি ষালকটি খেলছে তেমনি অমলের পুরুষ্ট ঊরুসন্ধি এক নিমিষে মাতাল হয়ে গেল। সে চট করে মাথা নিচু করে বলল, 'কিচ্ছু না।' সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে তার কষ্ট হচ্ছে, তাই গরুঘরের কয়েকটি ধাপ এলোমেলোভাবে টপকিয়ে অজানার উদ্দেশ্যে উধাও হয়ে গেল।

জল হিম হয়ে গেছে। অমল হাঁক ছাড়ল, 'ফর্টিন প্লিজ।' কোনও সাড়াশব্দ নেই। মনে মনে বলল, আর কী বলে ডাকব? নাম তো নেই, শুধু নম্বর। এই নম্বরের মাঝেই তো হারিয়ে যায় মানুষের আসল পরিচয়, যেমনটি ঘটেছিল বিমানবাহিনীতে থাকার সময়, আমার পরিচয় ৪০২ নম্বরের মাঝে হারিয়ে গিয়েছিল। প্রথম প্যারেডে দাঁড়াতেই প্রশিক্ষক বলেছিলেন, 'যখন তোমাকে উদ্দেশ্য করে ডাকা হবে তখন তুমি উত্তর দেবে ৪০২ বলে, এরসঙ্গে 'স্যার' যোগ করতে ভুলো না যেন।' প্রশিক্ষক শিক্ষিত ছিলেন না, তাই শিক্ষিত

রিক্রুটদের তিনি তুচ্ছতাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখতেন; যুদ্ধের সময় ভর্তি হয়েছিলেন বলে হয়তো তার শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রয়োজন পড়েনি; তবে অন্যদের মতো বাঙালি বিদ্বেষী ছিলেন না, যেমন ছিল তার নিম্নপদের কর্পোরলটি, আইয়ুবের মতো দু-নছলা পাঠান, পাঞ্জাবিও ভালো জানত। একরাতে, পাঞ্জাবি এয়ারম্যানদের সঙ্গে পাঞ্জাবিতে গল্প করে, আমাদের কাছে আসতেই কর্পোলটির মেজাজ বিনা কারণে বিগড়ে গেল। পাঞ্জাবির প্রতি যেমন ছিল তার অগাধ আশা-ভরসা, তেমনি ছিল বাঙালির প্রতি অপরিসীম সন্দেহ আর ভয়। তার ধারণা ছিল, অপদার্থতায় নিখিল পাকিস্তানে বাঙালির সমকক্ষ আর কেউ নেই; তাই মনে মনে বাঙালির সদগতির উপায় নির্ধারণ করত; সে-রাতেও করেছিল, বলল, 'ডন'ট স্পিক ইন গ্রিক।' কর্পোলের কথায় আমার হৃদয়ে আঘাত পড়ে, কালবৈশাখীর মতো। সঙ্গে সঙ্গে হিংসা, ঘৃণা, বিদ্বেষ একে একে সবকিছু গভীরভাবে আমার অন্তরে জমা হতে থাকে, তাই সকল সংকল্প অকস্মাৎ ধ্বস্তবিধ্বস্ত করে জানিয়ে দিলাম, 'বাংলা হচ্ছে নিখিল পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা, তদুপরি সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভাষা।' কর্পোরল কোনও উত্তর খুঁজে না-পেয়ে 'মাই বলস্' বলে বেরিয়ে পড়ল। আমি অবশ্য ভেবেছিলাম এ-থেকে যদি পাঠান কর্পোরলটির কিছুটা শিক্ষা হয়, পাকিস্তান-পদার্থটি শুধু পাঠান ও পাঞ্জাবির নিজস্ব বস্তু নয়, এতে বাঙালিরও দাবি আছে। পরদিন, কর্পোরলটি প্যারেড-গ্রাউন্ডে যাওয়ার আগে, আমার বিছানার পাশে এসে, 'লে আউট ঠিক হয়নি' বলে লাথি মেরে জিনিশপত্র ফ্লোরে ফেলে বলল, 'এসব শ্রেণীবদ্ধ করে সাজিয়ে রাখো। এক্ষুণি, অবিলম্বে।' তারপর, প্যারেড-গ্রাউন্ডে আমার জুতোর প্রতি তাকিয়ে বলল, 'ঠিক মতো জুতো পালিশ করা হয়নি, তাই তোমাকে শাস্তি দিতে হবে।' 'কী শাস্তি!' 'বন্দুক মাথার ওপর তুলে ঐ-যে পয়েন্ট দেখছ সেটা ছুঁয়ে আসতে হবে।' হিন্দুকুশ পর্বতের শাখা যেখানে মাথা নত হয়ে রানওয়ের শেষপ্রান্তরে এসে মিশেছে, সেটিই সে পয়েন্ট হিশেবে নির্দিষ্ট করল। পাষাণ পাঞ্জাবির মতো তার হৃদয়ও, সে নরাধম বর্বর, অর্ধমুকুলিত ছিন্নলতার মতো ধরাশায়ী।

জল একেবারে হিম হয়ে গেছে। 'বাথটাবে শুয়ে থাকা বে-আরাম। বৌদির চুলোর আগুন যদি এখানে এসে লাগত...।' অমলের চিন্তায় আবারও বৌদি। কাচা কাঠের ধোঁয়া, ঝাপসা অন্ধকার, বৌদি বটি দিয়ে মাছ কুটছে। তার এলোমেলো চুল, লাল মুখ, চোখে জলের বন্যা। সে শাড়ির আঁচলে চোখ মুছে নিল। বধূ সেজে এ-বাড়িতে উঠে আসার পর প্রথম প্রথম অমলের মনে একরকম পরিবর্তন দেখা দেয়। কল্পনা থেকে, দু-হাতে ঠেলে যতই দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করত

ততই বৌদি যেন তাকে ব্যাকুলভাবে কাছে টানত। এই টানা স্বার্থের আহ্বান ছিল কিনা তা অমলের কাছে অজানা। তবে অমল যখন লন্ডন আসার জন্যে উদ্যোগ নেয় তখন বৌদি তার গহনা বন্ধক রেখে, বিলাত আসার অর্থ সংগ্রহ করে অমলের সামনে রেখে বলল, 'লন্ডন গিয়ে কী কাজ করবে শুনি।' কণ্ঠে অভিমানের রেশ। বিষণ্ন কণ্ঠে অমল উত্তর দিল, 'আলু ছুলাব।' বৌদি বলল, 'তাহলে ওখানে বসে কেন? কাছে এসো।' আমগাছের ডালে বসা দাড়কাকটি কা-কা করে উঠল, আরেকটি উড়ে গেল রান্নাঘরের ওপর দিয়ে। কাকের উড়াল অমলের কপালে কী অমঙ্গল ডেকে আনবে—বৌদি ভেবে পায় না, তবে চুলোর আগুন কেমন যেন প্রসন্ন হয়ে উঠল; শুধু আগুন নয়, কাঠ পোড়ার শব্দগুলোও যেন নূতনকে আহ্বান জানাতে ব্যস্ত। উড়ন্ত কাকের চাঞ্চল্য যেন শব্দের সঙ্গে মিতালি পেতেছে। অমল বলল, 'কেন?' 'কেন' শব্দের মাঝেই অমল অন্বেষণ করতে লাগল রান্নাঘরের এককোণে বসা বৌদির শাঁখা-সিঁদুরের সৌন্দর্যে বিলিয়ে দেওয়া জীবনটি। হঠাৎ একদিন পাখা মেলে উড়ে যাবে অনেক দূরে, অজানা দেশে, যেখানে কৌমুদীময় রাতের স্নিগ্ধ আলোর কোনও সন্ধান মিলবে না, সেখানে শুধুই অন্ধকার খেলা করবে; যেখানে বৌদির হাসির শব্দ শোনা যাবে না, সেখানে সে কী করে বেঁচে থাকবে! বাঁকাচোখে তাকিয়ে আছে বৌদি। নিশ্চুপ। নিঃশব্দে কালো চোরকাঁটাগুলো শাড়ির পাড়ে কেমন যেন আর্তনাদ করছে। অমলের অন্তরে ভীষণ উসখুস, সে মনের মতো জগৎ গড়ার সন্ধান করতে লাগল শাদা-কালো-লাল রঙের শাড়ির ভাঁজে ভাঁজে। 'সব শিখিয়ে দেব। স্ত্রী যখন ভাগ্যে জুটেনি তখন...।' বাক্যটি আর শেষ হল না। এ কী স্বপ্ন না বাস্তব, অমলের কাছে সহজে বোঝা মুশকিল। একঝাঁক কোকিল যেন মহানন্দে সুর তুলেছে অমলের কানে, বলল, 'আহা, সব দায়িত্ব নেওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ না-করাই ভালো বৌদি, শেষে পস্তাবে।' বৌদির গাল-দুটো ফাগমাখা হয়ে উঠল, যেন অমাবস্যা পা পিছলে আগ্নেয়গিরির মধ্যে গিয়ে পড়েছে। সতেজ পাতার মৃদুমন্দ কাঁপন, উন্মোচিত ফুলের সৌরভ, বঙ্কিম চাঁদের আহ্বান—সব মিলে উৎফুল্ল একটি উৎসবের আহ্বান জানাতে বৌদি মৃদু হাসি মুখে টেনে বলল, 'হায়রে আমার কপাল!' তারপর বৌদি কিছুক্ষণ অসমাপ্ত কবিতার হিজিবিজি অক্ষরে কলম থেমে থাকার মতো ভঙ্গিতে বসে রইল। বিষণ্ন এক বটবৃক্ষ যেন। তার চেহারায় অস্বস্তিও প্রকাশ পাচ্ছে। বৌদির অস্বস্তি দূর করার জন্য অমল বলল, 'আলুর খোসা ছাড়ানোর কাজে যে বেতন পাব তা তো আর এখানে বসে পাব না।' সংশয়ের হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে বৌদির শান্ত-সুন্দর চোখ-দুটো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল। স্বাভাবিক অবস্থায় বৌদি ফিরে এসেছে দেখে অমলও

খুশি হল। বৌদির শ্বাসপ্রশ্বাস বইতে শুরু করল আগের মতো। স্বচ্ছন্দ, অনাবিল। গভীর রহস্যময়ী মেঘঢাকা চাঁদের অপরূপ মন-জয়-করা ছবি যেন তার ভঙ্গিতে প্রকাশ পাচ্ছে; এতে চৈত্ররোদের দ্বিপ্রহরের তাপ নেই, শুধু আছে শিল্পীর তুলিরঙে আঁকা একটি ঝলসিত মূর্তি।

জল এখন বরফ যেন। অমল আবার ডাকল, চিৎকার করে। এবার পরিচর সাড়া দিল। নক করতেই অমল ভিজে তোয়ালে কোমরে জড়িয়ে দরজা খুলে দিল। সে ভেতরে প্রবেশ করতেই অমল এককোণে সরে দাঁড়াল। পরিচর জলে হাত দিয়ে বলল, 'তোমাকে একটু অপেক্ষা করতে হবে। এতে গরমজল দিলে তেমন সুবিধা হবে না, তার চেয়ে বরং সম্পূর্ণ জল বদলিয়ে দেওয়াই ভালো।' অমল কথা না-বাড়িয়ে শুধু বলল, 'থ্যাঙ্কস্।' হড়হড় করে জল বেরিয়ে পড়তে লাগল। পরিচর বলল, 'একটু নাড়া দিলে ময়লা সহজে জলের সঙ্গে বেরিয়ে যাবে।' কথা অনুযায়ী কাজ। জল নিষ্কাশন। আবার গরম জলের আগমন। বাথটাবটি অর্ধেক ভরে গেলে পরিচর বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল, তারপর বাথরুমের বাইর থেকে ঠাণ্ডা জল ছেড়ে বলল, 'তোমার গা-সহা-গরম হলে আমাকে বললে আমি নলটি বন্ধ করে দেব।' একসময় ঠাণ্ডাজলের নল বন্ধ হয়ে গেল। অমল তৃপ্তির সঙ্গে স্নান শেষ করে, গা মোছে, আগের কাপড়গুলো পরে নিল। দেশে থাকতে পায়জমা-পাঞ্জাবি পরে থাকাটাই অমলের পছন্দের ছিল, নিজেকে ফিটফাট মনে হতো, কিন্তু এ-দেশে তো আর তা করা সম্ভব নয়। আগের মতো ওভারকোটটি গায়ে জড়িয়ে ভিজে তোয়ালে-দুটো হাতে নিয়ে বেরিয়ে এল বাথরুম থেকে। অমল যখন ভাবছে, তোয়ালে-দুটো কোথায় রাখবে, তখনই দেখল বাঙালি ভদ্রলোকটি তার হাতের তোয়ালে-দুটো বারান্দায় রাখা একটি পেটিকায় ফেলে দিচ্ছেন। অমল তা-ই করল। তারপর ভদ্রলোকটি ধীরস্থির পায়ে একটি মেশিনের দিকে এগিয়ে গেলেন, ওর গায়ে লেখা আছে—'ব্রিলক্রিম। আমাকে ব্যবহার কর।' কীভাবে তাকে ব্যবহার করতে হবে সে-পদ্ধতিও লেখা আছে—'ছিদ্র দিয়ে এক পেনি ঢালুন, তারপর নলের মুখে হাত রেখে বোতাম টিপুন।' তিনি লেখা অনুযায়ী কাজ করলেন, তবে তার হাতের তালুতে কোনও ব্রিলক্রিম এল। ক্রিম না-পাওয়ার ব্যর্থতা মুখে মেখে মাথা ঘুরিয়ে তাকালেন অমলের দিকে। এই ফাঁকে অমল আরেকবার দেখে নিল তাকে, তার মুখটিকে, যেখানে আগের মতোই শ্বাসরুদ্ধকর স্তব্ধতার বিস্ফোরণ ঘটছে; মেশিনটির বিরুদ্ধে, এমনকি তার মা-ভাই, তার ভালোবাসার মানুষটির বিরুদ্ধে হিংস্রঘৃণা জড়িত প্রতিশোধ নেওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাচ্ছে যেন। ভদ্রলোকটি একপলকে সুগভীর-তীব্র আবেগপূর্ণ বেদনা প্রকাশ করে, ঘাড় বাঁকিয়ে, ঠোঁটের ফাঁকে অস্ফুট ভাষার প্রলেপ মেখে,

দেহে গোধূলিলগ্নের অস্তে-যাওয়া সূর্যের বঞ্চিত বাসনার স্ফুলিঙ্গ ধারণ করে দৃঢ় পদক্ষেপে বেরিয়ে গেলেন। তবে তার ব্যর্থজীবনের শ্রান্তির ও দুর্বলতার দীর্ঘনিশ্বাসটি স্নানাগারের দরজায় লেপটে রইল। এই লেপটে থাকা ব্যর্থতার মাঝেই অমল অনুসন্ধান করতে লাগল তার বৌদিকে আবার।

সৃষ্টিতত্ত্ব

গোসল আরও পরে করলেও চলত। জুম্মার আযান পড়বে সাড়ে বারোটায়, কিন্তু স্ত্রীর নির্দেশ আজ সকাল সকাল গোসল সেরে নিতেই হবে। যে কতগুলো কাজে শরীফসাব তার স্ত্রীর উপর নির্ভর করেন, গোসল সে-হিশেবের মধ্যেই পড়ে, তাই এক্ষেত্রে স্ত্রীর কথাই প্রাধান্য পায়, অনুরোধের সুরে বললেও পালন করতে হয় শীতল নির্দেশের মতো। বিলাত ঘুরে-আসা স্ত্রী, হেলাফেলার পাত্রী নয়, আর গোসলের বারোআনা কাজ যখন স্ত্রীই করেন তখন আপত্তি করার কীই-বা থাকতে পারে। শরীফসাবের স্ত্রী কাজ সেরে বাথরুমের দরজায় হাত রেখে স্বামীকে আরেক দফা নির্দেশ দিলেন, 'তুমি কোনও কিছুতে হাত দিবে না। শুধু কাপড় ছেড়ে বেরিয়ে আসবে। আমি ফিরে এসে লুঙ্গি-গেঞ্জি ধুয়ে নেব।' স্যান্ডেল পরতে পা মোছার জন্য তোয়েলের দিকে হাত বাড়াতেই শরীফসাবের মনে হল তার নিশ্চিত হার্ট-অ্যাটাক হচ্ছে। 'আমার স্মরণীয় অভিজ্ঞতা'-নামক 'ঢাকা ডাইজেস্ট'-এ প্রকাশিত হৃৎরোগাক্রান্ত একব্যক্তির গল্প তিনি পড়েছিলেন, আদ্যোপান্ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। তখন গল্পের মতোই আক্রমণটিকে তিনি অনুভব করলেন, বুকে ব্যথা, যেন লোহার পাতের বেল্ট দিয়ে কষে ধরেছে কেউ; সঙ্গে সঙ্গে ঝাপটে ধরলেন তোয়েলেসহ রেলিংটি; আর গল্পের বাকি দৃশ্যগুলো চোখের সামনে ভাসতে লাগল, একের-পর-এক—এ্যাম্বুলেন্সে আরোহন, হাসপাতালে আগমন, জরুরি কক্ষে শয়ন, হৃৎবিশেষজ্ঞরা পরীক্ষানিরীক্ষায় রত, জ্ঞান হারানো, অনেকক্ষণ পর আস্তে আস্তে জ্ঞান ফিরে পাওয়া। যখন তিনি কল্পনা করছিলেন কী কী ঘটনা ঘটা উচিত এবং কোন ক্রমিক-নম্বর অনুযায়ী তখন তার অজ্ঞাতসারে অনেক কিছুই ঘটছিল; হঠাৎ বুঝতে পারলেন আক্রমণটি আর নেই, কেমন করে বুকের ব্যথা মিলিয়ে গেল টেরই পেলেন না। গল্পে পড়েছিলেন, বুকের উপর হাতির অবস্থান অনুভূত হয়, কিন্তু তার বেলাতে একটি বিড়াল থাবা দিয়েছিল বটে, ইঁদুর ভ্রমে, কিন্তু গিন্নী যেই-না শিস দিলেন অমনি একলাফে বিড়ালটি তার কোলে চলে গেল। তাহলে এ হার্ট-অ্যাটাক ছিল না, নিশ্চিত হলেন শরীফসাব।

গল্প আর জমে উঠল না। গল্পের লেখকও এতে নিরাশ হলেন। ঘটনাটি যদি ঘটে যেত তাহলে তিনি পাঠককে নিয়ে কল্পনার রথে চড়ে স্বর্গে চলে যেতে পারতেন, স্বর্গের বর্ণনা দিতে তখন অসুবিধা হতো না, কিন্তু তা আর পারলেন কই! ব্যর্থ

মন নিয়ে তিনি একটি গল্প লেখার উদ্দেশ্যে বাইবেলের পাতা উলটোতে লাগলেন। বেহেশতের বর্ণনায় বাইবেল অনন্য। বর্ণনা চমকপ্রদ, হৃদয়গ্রাহী। লেখক গল্প বুনতে লাগলেন।

> ঈশ্বরের রাজ্য কেমন, যীশু কীসের সঙ্গে এর তুলনা করবেন? এ হল একটি ছোট্ট সরষে বীজের মতো, যা একজন লোক তার বাগানে পুঁতল, আর তা থেকে অঙ্কুর বেরিয়ে সেটি বাড়তে লাগল, পরে তা একটি গাছে পরিণত হলে তার ডালপালাতে আকাশের পাখিরা এসে বাসা বাঁধল। ঈশ্বরের রাজ্যকে যীশু কীসের সঙ্গে তুলনা করবেন? এ হল খামিরের মতো, যা কোনও এক স্ত্রীলোক এক থালা ময়দার সঙ্গে মিশাল, পরে সেই খামিরে সমস্ত থালা স্ফীত হয়ে উঠল।[১] অব্রাহাম, ইসহাক, যাকোব ও সব ভাববাদীরাই ঈশ্বরের রাজ্যে আছেন।[২] যোহনও স্বর্গ দর্শন করেছেন। স্বর্গে এক সিংহাসন আছে, সেই সিংহাসনের ওপর একজন বসে আছেন। যিনি সেখানে বসে আছেন, তাঁর দেহ সূর্যকান্ত ও সার্দীয় মণির মতো অত্যুজ্জ্বল। সেই সিংহাসনের চারদিকে পান্নার মতো ঝলমলে মেঘধনু প্রকাশিত হচ্ছে। সেই সিংহাসনের চারদিকে চব্বিশজন প্রাচীন বসা, তাদের পরনে শুভ্র পোশাক, আর মাথায় সোনার মুকুট। সেই সিংহাসন থেকে বিদ্যুতের ঝলকানি, গুড় গুড় শব্দ ও বজ্রধ্বনি নির্গত হচ্ছে। সেই সিংহাসনের সামনে সাতটি মশাল জ্বলছে। সাতটি আগুনের মশাল ঈশ্বরের সেই সপ্ত আত্মার প্রতীক। সেই সিংহাসনের সামনে আছে কাচের মতো সমুদ্র, যা স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ। সেই সিংহাসনের সামনে এবং চারদিকে চারজন প্রাণী আছে। প্রথমটি দেখতে সিংহের মতো, দ্বিতীয়টি ষাঁড়ের মতো, তৃতীয়টির মুখ মানুষের মতো, চতুর্থটি উড়ন্ত ঈগলের মতো। এই চার প্রাণীর প্রত্যেকের ছয়টি করে পাখা আছে, সর্বাঙ্গে—ভেতরে ও বাইরে—চোখ আছে।[৩] পরে আমি [যোহন] দেখলাম, সিংহাসনের সামনে চারটি প্রাণী ও প্রাচীনদের সঙ্গে এক মেষশাবক দাঁড়িয়ে আছেন, সেই মেষশাবককে এমন দেখাচ্ছে যেন

১. লুক ১৩: ১৯-২১।
২. লুক ১৩: ২৮।
৩. প্রকাশিত বাক্য ৪:৩-৬।

তাকে বধ করা হয়েছে।[৪] এরপর আমি দেখলাম, প্রত্যেক জাতির, বংশের, গোষ্ঠীর ও ভাষার অগণিত লোক সিংহাসন ও মেষশাবকের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের পরনে শুভ্র পোশাক এবং হাতে খেজুর পাতা।[৫] সমস্ত স্বর্গদূত সিংহাসন, প্রাচীনদের ও চারজন প্রাণীর চারদিক ঘিরে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁরা সিংহাসনের সামনে মাথা নিচু করে ঈশ্বরকে প্রণাম ও উপাসনা করলেন। তাঁরা বললেন, 'আমেন! প্রশংসা, মহিমা, প্রজ্ঞা, ধন্যবাদ, সম্মান, পরাক্রম ও ক্ষমতা যুগপর্যায়ের যুগে যুগে আমাদের ঈশ্বরেরই হোক। আমেন!' এরপর সেই প্রাচীনদের মধ্য থেকে একজন আমায় জিজ্ঞেস করলেন, 'শুভ্র পোশাক পরা লোকেরা কারা? এরা সব কোথা থেকে এসেছে?' আমি তাঁকে বললাম, 'মহাশয়, আপনি জানেন।' তিনি আমায় বললেন, 'এরা সেই লোক যারা মহানির্যাতনের ভেতর দিয়ে এসেছে; আর মেষশাবকের রক্তে নিজেদের পোশাক ধুয়ে শুচিশুভ্র করেছে। এই কারণেই এরা ঈশ্বরের সিংহাসনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে; আর দিন-রাত তাঁর মন্দিরে উপাসনা করছে। যিনি সিংহাসনে বসে আছেন, তিনি এদের রক্ষা করবেন। এরা আর কখনও ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত হবে না, এদের গায়ে রোদ বা তার প্রখর তাপও লাগবে না। কারণ সিংহাসনের ঠিক সামনে যে মেষশাবক আছেন তিনি এদের মেষপালক হবেন, তিনি তাদের জীবন জলের প্রস্রবনের কাছে নিয়ে যাবেন আর ঈশ্বর এদের সমস্ত চোখের জল মুছিয়ে দেবেন।'[৬]

একজন পাঠক প্রশ্ন ছুঁড়লেন, 'এ কেমন গল্প? রক্ত দিয়ে কাপড় ভিজালে কি শাদা হয়?' এই প্রশ্নকারীকে নিশ্চয় শয়তানে পেয়েছে—লেখক এ-সিদ্ধান্তে পৌঁছে শয়তানের পরিচয় দানে প্রবৃত্ত হলেন।

শয়তান মূলত জিনজাতির অর্ন্তভুক্ত। আল্লাহ তা'আলার নির্দেশিত পথ থেকে বিচ্যুত হওয়ার ছত্রিশ হাজার বছর পর জিনজাতিকে ধ্বংস করা হয়, তবে মোত্তাকিন বা খোদাভীরু জিনদলই রক্ষা পায়। এসময় হিলিয়াস নামের একজন জিন মোত্তাকিন জিনদলের নেতা হিশেবে

৪. প্রকাশিত বাক্য ৫:৬।
৫. প্রকাশিত বাক্য ৭:৯।
৬. প্রকাশিত বাক্য ৭:১১-১৬।

মনোনীত হয়। পরবর্তীকালে তারা পথভ্রষ্ট হলে, ছত্রিশ হাজার বছর পর, তাদের ধ্বংস করা হয়, তবে কিছু জিন রক্ষা পায়। রক্ষা পাওয়া দলের দলপতি হিশেবে মনোনীত হয় বিলকিয়া নামের একজন জিন। পরবর্তীকালে তারা বিপথগামী হলে, ছত্রিশ হাজার বছর পর, তাদের নির্মূল করা হয়, কিন্তু আবারও কিছু জিন রক্ষা পায়। এই দলের দলপতি হয় সামুদ নামের একজন জিন। তারাও যখন পরবর্তীকালে পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ে তখন, ছত্রিশ হাজার বছর পর, চতুর্থবারের মতো, খোদার অভিশাপে অভিশপ্ত হয়। তখন ধ্বংসপ্রাপ্ত জিনদল থেকে কিছু জিন পাহাড় ও পর্বতগুহায় পালিয়ে যায়। এসব পলাতক জিনদের মধ্যে বেশির ভাগই ছিল পরহেযগার জিন। আযাযীল নামের একজন অল্পবয়স্ক সুশ্রী চেহারার জিনও ছিল। ফেরেস্তাবৃন্দ আযাযীলকে হত্যা না-করে সঙ্গে করে নিয়ে আসেন। তারপর প্রতিপালন করতে লাগলেন।...

'আল্লাহ্‌র আদেশের অতিরিক্ত কাজ ফেরেশতারা করেন কোন সাহসে?' এক পাঠকের প্রশ্নে লেখক থমকে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে অন্য-এক পাঠক প্রশ্ন করলেন, 'সুশ্রী, সুঠাম, সুডৌল, তেজোদীপ্ত চেহারার জিনের প্রতিপালন করার ব্যবস্থা কী আল্লাহ্‌র অজানা ছিল?' আরেক পাঠক প্রশ্ন করলেন, 'ফেরেস্তাদের মধ্যেও ঘেটু নাচের প্রচলন ছিল কি?' পাঠকমণ্ডলীর মুখ বন্ধ করার জন্য লেখক আপ্ত বাক্য ছুঁড়লেন, 'নায়েবে নবীর কেতাবের কথা মান্য করা ইমানের অঙ্গ। ভালো না লাগে তো...।' বাক্যটি শেষ করতে না-দিয়ে প্রথম পাঠক বললেন, 'মজাদার কথা সত্য না-হলেও সন্দেহ প্রকাশ করা ঠিক নয়।' ওষুধে ধরেছে বলে লেখক কাহিনীতে ফিরে গেলেন।

ফেরেস্তাবৃন্দের সাহচর্যে থাকায় আযাযীলের স্বভাব চরিত্র অতি উত্তম হতে থাকে। আল্লাহ তা'আলার আরাধনা-উপাসনায় দ্রুত উন্নতি লাভ করে। সেসময়ে আযাযীল সাতটি সম্মানজনক উপাধিতে ভূষিত হয়। সর্বোপরি 'মস্তাজিবুদ দাওয়াত' আখ্যায়ও সে আখ্যায়িত হয়। পরিশেষে সে 'ময়াল্লিম-এ-মালাকাত' বা 'ফেরেস্তাবৃন্দের গুরু' উপাধিতে খ্যাতি লাভ করে।...

'এতসব গুণাধিকারী আযাযীলকে কি আল্লাহ্ স্পেশিয়্যালভাবে তৈরি করেছিলেন?' এক পাঠকের প্রশ্নে লেখক আবারও বর্ণনা দানে প্রবৃত্ত হলেন।

আযাযীলের জন্ম বৃত্তান্ত অদ্ভুত। আল্লাহ্ তা'আলা দোজখে দুই আকৃতির দুটি প্রাণী সৃষ্টি করেছিলেন। একটি সিংহ, অন্যটি ব্যাঘ্র। এই দুই প্রাণী সিজ্জিল নামক দোজখে গিয়ে সংগম করতেই আযাযীলের জন্ম হয়। সিজ্জিল দোজখে আযাযীল হাজার বছর পর্যন্ত খোদার সেজদায় লিপ্ত থাকে। তারপর সে প্রত্যেক ভূমণ্ডলের স্তরে স্তরে হাজার হাজার বছর ধরে খোদার এবাদত করে পৃথিবীর পৃষ্ঠে এসে উপস্থিত হয়। তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে সবুজ রঙের দুটি শক্তিশালী যমরোদের ডানা প্রদান করেন। তখন সে এই স্থান থেকে উড়ে গিয়ে প্রথম আকাশে পৌঁছে। সেখানেও সে সহস্র বছর পর্যন্ত খোদার সেজদায় লিপ্ত থাকে। তাকে 'খাশে' খেতাবে বিভূষিত করা হয় তখনই। এখান থেকে সে দ্বিতীয় আকাশে পদার্পণ করে। সেখানেও সে হাজার বছর খোদার সেজদায় লিপ্ত থাকে, এবং তখনই তাকে 'আবেদ' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। তারপর সে তৃতীয় আকাশে গিয়ে পৌঁছে। সেখানেও সে...।

বক্তব্যের মাঝখানেই একজন পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটল, বলল, 'এসব গাঁজাখুরি গল্প কোথায় পেয়েছেন?' এই পাঠকের মুখ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে লেখক নীরবমন্ত্র প্রয়োগ করলেন, 'এগুলো কোরআন কিতাবের কথা, হেলাফেলার বস্তু নয়।' আর মনে মনে বললেন, আমার গল্পের নায়কের স্বর্গমর্ত বিচরণ করার সুযোগই তো হল না।

আসলে হার্ট-অ্যাটাক হয়নি, তবু শরীফসাব মনে করছেন অন্তত প্রকারান্তরে হলেও তার হয়েছিল, দশ-পনেরো সেকেন্ডের জন্যে হলেও তার বিশ্বাস জন্মেছে তিনি আক্রান্ত হয়েছিলেন। এই দশ-পনেরো সেকেন্ড ছিল তার জন্যে একযুগ। স্বল্প সময়ের ভূমিকম্পে যেমনি একটি শহরের চেহারা বদলে যায় তেমনি কয়েক সেকেন্ডের বিশ্বাসে জীবন সম্বন্ধে শরীফসাবের ধারণাগুলো উলটেপালটে গেল। তিনি জীবনের সবকিছু নতুন মূল্যবোধে উপলব্ধি করতে শুরু করলেন। ক্ষণস্থায়ী জীবনে আল্লাহ্র বন্দেগী ছাড়া কী অন্যকিছু ভাবা উচিত! পরিবার-পরিজন প্রতিপালনের দায়-দায়িত্ব তো আল্লাহ স্বয়ং গ্রহণ করেছেন বলে নিশ্চয়তা দিয়েছেন। একথা অবশ্য সেদিনও প্রকাশ করেছিলেন এক মাওলানা, প্রতিবেশীর মিলাদে। দূর কোণে বসা এক বাবরিছাটা চুলওয়ালা যুবককে লক্ষ্য করে মাওলানা বলতে লাগলেন, 'জেনে রাখা ভালো—জিন ও ইনসানকে

আল্লাহ্ কেবল মাত্র তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। এজন্যই তো প্রত্যেক জীবের রিজেক পরওয়ারদিগার পূর্ব-থেকেই নির্ধারণ করে রেখেছেন, যাতে আমরা প্রত্যেকে নিশ্চিত মনে তাঁর ইবাদত করতে পারি, পরকালে জান্নাত লাভ করতে পারি, যে জান্নাতে রয়েছে চুন্নী, পান্না, মণিমুক্তা, হীরা, জহরত ও সোনার তৈরি বালাখানাসমূহ। এসব বালাখানার তলদেশ দিয়ে বয়ে চলেছে ঝরণাসমূহ। এসব ঝরণার প্রবাহিত পানি মধুর চেয়েও মিষ্টি, দুধের চেয়েও শুভ্র। জান্নাতি উদ্যানসমূহ সৌরভিত হচ্ছে চির আমোদিত হয়ে। থোকায় থোকায় বেদানা, নাশপাতি, আপেল পেকে আছে। ওষ্ঠস্পর্শ করার জন্য অপেক্ষারত আঙ্গুরের থোকাগুলোও। নানা বর্ণের, নানা রঙের পাখিগুলো সবসময় কলকাকলি করছে। গানবাজনার সুরে জান্নাতি উদ্যানসমূহ নৃত্য করছে। মনে যখন যা খেতে বা পেতে চাইবে, ইচ্ছে প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সেসব মুখের নাগালে এসে হাজির হবে।' হঠাৎ করে মাওলানার বক্তব্যের ছন্দভঙ্গ করে বাবরিছাটা যুবকটি বলল, 'আম, কাঁঠাল ও আনারস কিন্তু সঙ্গে নিয়ে যাবেন নতুবা এসব ফলের আহারানন্দ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।' সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন প্রৌঢ় লোক যুবকের বেতমিজির জন্য ভর্ৎসনা শুরু করলেন। বেগতি দেখে যুবকটি কেটে পড়ল, আর তখনই মাওলানা দ্বিগুণ উৎসাহে, তার পক্ষের বা সমর্থনকারী প্রৌঢ়দের মনোরঞ্জনের জন্য বলতে লাগলেন, 'বত্রিশ বছর বয়সের প্রত্যেক পুরুষের পেছন ঘুরে বেড়াবে ষোল বছর বয়স্কা যুবতীগণ। স্বর্গীয় হুরিগুলো সত্তরজন করে প্রতি পুরুষের সঙ্গে থাকবে। শত যৌনমিলনেও ক্লান্তি আসবে না। স্বর্গীয় যৌনস্বাদ জাগতিক যৌনস্বাদের চেয়ে একশত গুণ বেশি। স্বর্গীয় অপ্সরার রূপ সূর্যালোকে ম্লান ও নিস্প্রভ করে দেয়। ওদের দেহে এমনই সুভাস ও সুরভি ছড়িয়ে আছে, যদি তার বিন্দুমাত্র ধরাপৃষ্ঠে পতিত হতো তাহলে বিশ্বের মানুষ আত্মজ্ঞান হারিয়ে ফেলত।' কয়েকজন পুরুষের কণ্ঠে ধ্বনি-প্রতিধ্বনি সৃষ্টি হল, 'মারহাবা মারহাবা।' এ-ধ্বনি মিলিয়ে যাওয়ার আগেই একটি কণ্ঠে ধ্বনিত হল, 'যৌনস্বাদ উপভোগ করার জন্য একজন পুরুষ পাবে সত্তরজন হুরী, তাহলে একজন বেহেশতি নারী কতজন তাগড়া মরদ পাবেন তার যৌনকামনা চরিতার্থ করার জন্যে?' এত ধ্বনি নয়, যেন বজ্রাঘাত। আহত মৌ-লোভী মাওলানার কথা আর প্রকাশিত হল না। তার সহকারী উপস্থিত সকলকে দুর্বোধ্য ভাষায় হযরতের জীবনী মুখস্থ করার আহ্বান জানিয়ে শিরণী খাওয়ার পথ সুগম করে দিলেন, আর মাওলানা গুম হয়ে বসে রইলেন একপাশে। এই ছবিটি শরীফসাবের মানসপটে উদয় হতেই তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন আজ আর মসজিদে যাবেন না। তার পরিবর্তে বৃন্দাবন কলেজের দিকে

হাঁটতে গেলে মন্দ হয় না। জীবন ক্ষণস্থায়ী, 'পদ্মপত্রে নীড়'; ইমামের ওয়াজ শুনে সময় নষ্ট করার মতো সুযোগ কোথায়? মসজিদের কর্তাব্যক্তি যদি মৌ-লোভী মাওলানার মতো বাজে একটি বিষয় নিয়ে তেনাছেঁড়া শুরু করেন, তার চেয়ে হাঁটা ভালো, হার্টের জন্য উপযুক্ত ব্যায়াম; পাখির গান, ফুলের সৌরভ, সবুজ ঘাসের মধ্যে এক-পা এক-পা করে হাঁটতে হাঁটতে প্রকৃতির মাহাত্ম্যবলোকন করাই উত্তম। কিন্তু শরীফসাব কাদাবন্দি। যে-রাস্তা তার বাসা থেকে বেরিয়ে মূলসড়কে গিয়ে মিলেছে তার খালবাকল উঠে গেছে। ইটগুলো তুলে নিয়েছে পৌরকর্মীরা পিজ্ করার উদ্দেশ্যে, কিন্তু বাধ সেধেছে স্বার্থান্বেষী চক্র। পৌরকর্মী ও স্বার্থান্বেষী চক্রের মিলিত প্রচেষ্টায় ঠিকাদাররাও অন্যের পকেটের টাকাটা-সিকিটা পকেটস্থ করার প্রক্রিয়া শুরু করেছে, আবার সফলতার ক্ষেত্রে একে অন্যকে যাতে বেশি পিছনে ফেলতে না-পারে সেজন্য চলছে তাদের পরস্পরের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, দৃঢ় প্রতিযোগিতা। আজকাল ঠিকাদারিও রাজনীতির একটি বিশেষ অঙ্গ হয়ে উঠেছে, তাই এখন রাজনীতি আর রাষ্ট্রপরিচালনার নীতি নয়, বরং পেটপূজোর উপাদান মাত্র, ফলে রাস্তার খালবাকল চলে যাক—পরোয়া নেই, বরং স্বার্থসিদ্ধির জন্য রাস্তা মেরামতের কাজ বন্ধ থাকার হুমকি বহাল রাখা উচিত—যে এই কাজ করতে আসবে তার কেল্লা আর কোনও দিন আল্লাহ্ রক্ষা করতে পারবেন না। আল্লাহ্‌র প্রতি মায়া না-থাকলেও কেল্লার প্রতি দরদ কার নেই। কাজেই রাস্তা আর মেরামত করা হয় না। বরাদ্দ টাকা ফেরৎ গেল, টাকাগুলো অবশ্য সুইডেন সরকার দিয়েছিল, সে-দেশের শ্রমিকরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যে-অর্থোপার্জ্জন করে তার ত্রিশ শতাংশ তারা ট্যাক্স দেয়। সুইডেন সরকার তারই একটি অংশ দান করেছিল বাংলাদেশি হতভাগাদের জন্য, কিন্তু এ-দুর্ভাগা দেশে মানুষ সম্পদ উৎপাদনে মেধা ও শক্তির প্রয়োগ করতে চায় না, শুধু চেষ্টা চালায় অন্যের পকেট ফুটো করে টাকাটা-সিকিটা কেমন করে নিজের পকেটে আনা যায়; কথায় বলে না, 'অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা'। হার্ট-অ্যাটাকটি শরীফসাবকে এমন একটি ঝাঁকুনি দিয়ে গেছে, তিনি সঠিকভাবে চিন্তা করতে পারছেন না। একবার ভাবছেন জীবন যখন স্বল্পস্থায়ী তখন মসজিদে গিয়ে ইমামের দীর্ঘ বক্তৃতা শোনার প্রয়োজন কী! আবার ভাবছেন, জীবনের অনিশ্চয়তার জন্য পীরের শরণাপন্ন হওয়া সমীচীন। আবার ভাবছেন, আজ জুম্মাবার, আল্লাহর পছন্দের দিন, এখন সাড়ে বারোটা বাজছে মাত্র, কাদা মাড়িয়ে হলেও খোদার ঘরে যাওয়া উচিত, স্রষ্টার কাছে তো কোনও কিছুর অভাব নেই।

মসজিদের ভেতরের চেয়ে বাইরে লোকের সমাবেশ বেশি। লোকজন ইমামের ওয়াজ শেষ হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে। শরীফসাবের মন কিন্তু আজ ওয়াজে আকৃষ্ট, অধিকন্তু আদম সৃষ্টিতত্ত্ব শুনতে আদম সন্তানরা চির আনকোরা। মসজিদের ইমাম টেনে টেনে বলে যেতে লাগলেন,

> আল্লাহ্‌পাকের তরফ থেকে ফেরেস্তা জিব্রাইলের[৭] প্রতি নির্দেশ এল, 'ওহে জিব্রাইল, তুমি ভূপৃষ্ঠ থেকে একমুঠো মাটি নিয়ে এসো।' তৎক্ষণাৎ মহাকাশ থেকে ধুলোর ধারায় ছুটে এলেন ফেরেস্তা। যেখানে কাবাগৃহ বর্তমান, সেখান থেকে একমুঠো মাটি নিয়ে যেতে ইচ্ছে হল ফেরেস্তার। ফেরেস্তা যখন মাটিতে হাত দিলেন তখন সে-মাটি খোদা তা'আলার কসম দিয়ে বলল, 'ওহে জিব্রাইল, তুমি আমা থেকে কোনও মাটি নিও না। কেননা এই মাটি দিয়ে খোদাপাক আদম তৈরি করবেন। আদম ঔরসজাত সন্তানগণ ভীষণ পাপী হবে। তারা দোজখের আগুনে জ্বলবে। আমি তো এক অসহায় মাটি। আমার শক্তি নেই খোদা তা'আলার সেই ভয়াবহ আজাব সহ্য করার।' একথা শুনে জিব্রাইল মাটি নেওয়া থেকে বিরত রইলেন। জিব্রাইল ফিরে গেলে, একে একে মীকাঈল[৮] ও ইস্রাফীল[৯] ফেরেস্তারা এলেন, তারাও মাটি নেওয়া থেকে বিফল মনোরথে ফিরে গেলেন। কারো দ্বারা যখন একাজটি সমর্পণ করা সম্ভব হল না, তখন আযরাইলকে[১০] নির্দেশ দেওয়া হল পৃথিবী থেকে মাটি আনতে। মাটি তাকেও বারণ করল। আযরাইল মাটির কান্না শুনতে চাইলেন না, বরং তিনি স্বগর্বে মাটিকে বললেন, 'তুমি আমাকে যাঁর কসম দিচ্ছো, আমি তাঁরই হুকুমে এসেছি। আমি কখনও তাঁর অবাধ্য হতে পারব না। তোমাকে আমি অবশ্যই নিয়ে যাব।' আযরাইল একথা বলতে বলতে মাটির বুক কামচ্ছে ধরলেন। একটানে ধরণীর বুক থেকে একমুঠো মাটি আলাদা করে ঊর্ধ্বাকাশে চলে এলেন। আযরাইল খোদা তা'আলার দরবারে পৌঁছে আল্লাহকে বিনীতভাবে বললেন, 'ওহে আমার রব, আপনি প্রকৃত জ্ঞানী ও দর্শক। আমি আপনার নির্দেশ মতো একমুঠো মাটি

---

৭. জিব্রাইল : পয়গম্বরদের কাছে ঈশ্বরের আদেশ পৌঁছে দিতেন।
৮. মীকাঈল : খ্যাদবণ্টন ও আবহাওয়া বিভাগের পরিচালনার দায়িত্বে আছেন।
৯. ইস্রাফীল : তাঁর শিঙ্গাধ্বনিতে মহাপ্রলয় শুরু হবে।
১০. আযরাইল : তিনি জীবের প্রাণ হরণ করেন।

আপনার পবিত্র দরবারে হাজির করলাম।' খোদা তা'আলা গুরুগম্ভীর স্বরে ঘোষণা করলেন, 'ওহে আযরাইল, এই মাটি দ্বারা ভূপৃষ্ঠে আমি আমার একজন প্রতিনিধি সৃষ্টি করব। তাঁকে এবং তাঁর ঔরসজাত সন্তানদের প্রাণবায়ু বের করে আনার জন্য আমি তোমাকেই দায়িত্ব বহন করতে হুকুম দিলাম।' আযরাইল আপত্তি জানালেন, 'ওহে আমার প্রতিপালক, এতে আপনার বান্দাগণ আমাকে মহাশত্রু হিশেবে গণ্য করবে। আমাকে তারা অকথ্য ভাষায় গালাগালি করবে, ধিক্কার দিবে, তিরস্কার করবে।' খোদা তা'আলা তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'ওহে আযরাইল, তুমি কোনও রকম চিন্তা করো না, কারণ আমিই তো এ-জগতের স্রষ্টা, সুতরাং প্রত্যেকের মৃত্যুর কারণ নানাভাবে ঘটাব, প্রত্যেকই নানারকম ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু বরণ করবে—আমি কাউকে বিষবেদনায়, কাউকে মাতাল করে, কাউকে পানিতে ডুবিয়ে মারব। তারা ভাববে, রোগ বা দুর্ঘটনায় তাদের মৃত্যু ঘটেছে, তখন তোমাকে কেউ দুষমন ভাববে না।' অতঃপর আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে, ফেরেস্তারা এই মাটিকে মক্কা ও তোয়াফের মাঝখানে রেখে দিলেন। তারপর এর ওপর খোদা তা'আলার অনুগ্রহের বারি বর্ষিত হতে লাগল। দুই বছর পর সেই মাটি গোলাকার পিণ্ডে পরিণত হল; চার বছরে ত্বকবিশিষ্ট হয়ে উঠল; ছয় বছরে ঠনঠন মাটি তথা পরিপক্ব দেহে পরিণত হল; আট বছরে আদমের আকৃতি ধারণ করল। একদিন আযাযীল সত্তর হাজার ফেরেস্তাসহ আদমকে দেখতে এল। সে দেখতে পেল আদমের দেহ মাটিতে পড়ে আছে। সে তখন ঘৃণাভরা চোখে আদমের দিকে তাকাল। ফেরেস্তারা আযাযীলকে বললেন, 'এই মাটিপিণ্ড থেকে খোদা তা'আলা তাঁর প্রতিনিধি তৈরি করবেন।' আযাযীল বলল, 'সত্য বটে! খোদা তা'আলা যদি এই আকৃতি বিশিষ্ট মানব আমার অধীনস্থ করে দেন তাহলে আমি অবশ্যই তাকে ধ্বংস করব। আর যদি আমাকে তার অধীনস্থ করে দেন, তবে আমি কখনও তার অধীনতা স্বীকার করব না।' হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, ইবলীস একদিন আদমের দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে নাভীমূল পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তারপর অগ্নির উত্তাপে ইবলীস সেখান থেকে বেরিয়ে আসে। এ-থেকে আদমের সঙ্গে তার হিংসাবিদ্বেষ ও শত্রুতা চরমে পৌঁছে। হিংসাবিদ্বেষে জর্জরিত ইবলীস একদিন আদমের দেহে থুতু

নিক্ষেপ করে। আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে, জিব্রাইল আদমের দেহ থেকে ইবলীসের নিক্ষিপ্ত থুতু উঠিয়ে নিয়ে অর্ধেক দিয়ে কাঁকুর ও ফুল সৃষ্টি করেন, আর বাকি অর্ধেক দিয়ে আদমের জন্য একটি খুরমা গাছ পয়দা করেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) আরও বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ্পাকের নির্দেশে, জিব্রাইল যেখানে রাসুলুল্লাহ্ (সা.)-র জ্যোতির্ময় সমাধি বর্তমানে অবস্থিত যেখান থেকে কিছু মাটি তুলে এনে মেশ্‌ক ও আম্বারের সঙ্গে মিলিয়ে সুবাসিত করে হযরত আদমের ললাটদেশে মর্দন করেন। এতে আদমের অবয়ব মণ্ডলের জ্যোতি দ্বিগুণ প্রকাশিত হয়। এরপর থেকে চল্লিশ দিন অতীত হয়ে গেলে তার পরমাত্মার বিকাশ ঘটে। এইসময় মহান আল্লাহ্‌র তরফ থেকে জিব্রাইল, মীকাঈল, ইস্রাফীল ও আযরাইলের প্রতি নির্দেশ এল, 'তোমরা আদমের আত্মাকে নিয়ে তাঁর দেহে প্রবেশ করিয়ে দাও।' প্রধান চারজন ফেরেস্তা ও প্রত্যেকের সঙ্গে আরও সত্তর হাজার অনুগামীসহ আদমের আত্মাকে একস্তবক নূরের উপর রেখে, আরেকস্তবক নূর দ্বারা আবদ্ধ করে, আদমের মাথায় ঢুকিয়ে দিলেন। তারপর নূরের স্তবকগুলো আদমের আত্মার উপর থেকে সরিয়ে নিলে কেমন করে আদমের দেহে তাঁর আত্মা প্রবেশ করে তা দেখার জন্য সাত আকাশের সমস্ত ফেরেস্তারা এসে ভিড় জমালেন। তখন আল্লাহর বাণী প্রকাশিত হল, 'ওহে আত্মা, তুমি এ-দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করো।' আদমের আত্মা তাঁর দেহের চারদিকে সাতবার প্রদক্ষিণ করে, কিন্তু দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করল না। আত্মা সবিনয়ে আবেদন জানাল, 'হে প্রভু আমি হলাম নূরের তৈরি জ্যোতির্ময় সত্তা, অথচ এ-দেহটি তো জড়বস্তু বা বস্তুজগতের একটি ঘোর তমসাচ্ছন্ন আঁধার। আমি কেমন করে এরমধ্যে অবস্থান করব?' আবারও আল্লাহর বাণী প্রকাশিত হল, 'ওহে আত্মা, তুমি ঘৃণিত অবস্থায় এ-দেহে প্রবেশ করো। পুনরায় ঘৃণিত অবস্থায়ই বেরিয়ে এসো।' তখন আদমের পবিত্র আত্মা তাঁর নাসারন্ধ্র দিয়ে প্রবেশ করল। মস্তিষ্কমণ্ডলের চারদিকে ঘোরপাক খেতে লাগলে আদম তাঁর চোখ খুললেন। তৎক্ষণাৎ আত্মা তাঁর মস্তিষ্কমণ্ডল থেকে কণ্ঠনালীতে এসে পৌঁছল। তারপর কণ্ঠনালী থেকে বক্ষস্থলে, বক্ষস্থল থেকে নাভীমূলে। আদমের মাটির দেহ রক্তমাংস, ত্বক, অস্থি, ধমনী ও নাড়ীভুঁড়িতে পরিণত হতে লাগল। আদম, খোদা তা'আলার অসীম ক্ষমতায়, হস্তদ্বয় ভূপৃষ্ঠে ঠেকিয়ে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলেন,

এ-দেখে ফেরেস্তারা বলল, 'মানব খুবই চতুর ও দ্রুতগামী হবে। কেননা এখনও তার অর্ধেক দেহে মাটি স্পর্শ করছে অথচ সে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে।' মহান আল্লাহ মানব সৃষ্টি সম্পর্কে তাঁর পবিত্র কোরআনের ভাষায় বললেন, 'মানবকে সৃষ্টি করা হয়েছে দ্রুতগামী করে।' আদম তাঁর দেহের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আল্লাহ্ তা'আলা কী বস্তু দ্বারা আমার দেহ সৃষ্টি করেছেন।' আদমের আত্মা দেহগ্রন্থির—ধমনী, মাংস ও চামড়ার—ভাঁজে ভাঁজে বাতাসের মতো ঘুরতে লাগল। আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেস্তাবৃন্দকে আদেশ করলেন তারা যেন আদমের মস্তিষ্কমণ্ডলে স্থিরতা এনে দেন। ললাটদেশ মর্দন করতে আদেশ করা হলে তারা তাই করলেন। আদমের আত্মা তাঁর দেহে পৌঁছে স্থায়িত্ব গ্রহণ করা মাত্রই আদমের হাঁচি পেল। আদম তখন খোদা তা'আলার হুকুম অনুযায়ী 'আলহামদুলিল্লাহ' বললেন। এর জবাবে আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে বেরিয়ে এল, 'ইয়ারহামুকাল্লাহ্।' তারপর তিনি জিব্রাইলকে নির্দেশ দিলেন, 'আদমের হাঁচিটি উঠিয়ে রাখো।' তারপর, এই হাঁচি দিয়ে খোদা তা'আলা তাঁর বান্দা, মরিয়মের পুত্র, হযরত ঈসা (আ.)-কে পয়দা করলেন।

এমন সময় ইমামসাবের নজরে পড়ল, উঠতি বয়সী এক মুছল্লির গোঁফের নিচে ফুটে উঠেছে মৃদু নাচন। সে তার বন্ধুর কাছে শোনেছিল, 'বিজ্ঞানের মতে বিবর্তনের পথ ধরে মাত্র ৩০ হাজার বছর আগে আধুনিক মানুষ এই পৃথিবীতে এসেছে। রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে প্রথমে সৃষ্টি হয় হাইড্রোজেন; তারপর নানা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অণু-পরমাণু, রেপ্লিকেটিং মলিকিউল, জীবন্ত প্রোটোপ্লাজম; একসময় গঠনহীন প্রোটিন থেকে নিউক্লিয়াস আর কোষঝিল্লি, কৌষিক আর অকৌষিক প্রটিস্টার অসংখ্য প্রজাতি, প্রাথমিক উদ্ভিদ তারপর প্রাথমিক প্রাণী, তারপর প্রাণী-জগতের অগণিত শ্রেণী-বর্ণ-বংশের প্রকার আর প্রজাতি, শেষপর্যন্ত মেরুদণ্ডী প্রাণী এবং শেষত মানুষ। প্রাণের মূলবীজ হচ্ছে ডিএনএ, যার অণু দেখতে মোচড়ে কুণ্ডলিপাকানো মইয়ের মতো, এর ধাপগুলোতেই রয়েছে জৈবসংকেত।' এসব কথা মনে পড়াতেই তার গোঁফের নিচে ফুটে উঠেছে মৃদু নাচন। সেই মৃদু নাচনটির দিকে তাকিয়ে, ভ্রুকুঞ্চিত করে, ইমাম বললেন, 'দেখুন মিয়াসাহেবরা, আমি যা বয়ান করছি তা আমার মনগড়া কথা নয়। মাওলানা আব্দুর রহিম হাজারী হুজুরে কিবলাসাবের কিতাবে এর বৃত্তান্ত আছে, যে-কিতাবটি বাংলার প্রখ্যাত জ্ঞাননিষ্ঠ-মনীষীদের[১১] দ্বারা

উচ্চপ্রশংসিত হয়েছে। মনে রাখবেন, হাঁচির দ্বারা ঈসা নবীকে সৃষ্টি করা হয়েছিল বলেই পরবর্তী সকল মানুষের জীবন বেশ নাজুক হয়ে পড়ে, আয়ু কমে গেছে। তাই তো মাত্র ৬৩ বছর বয়সে মহানবী (সা.) ইন্তেকাল ফরমালেন। আগের নবীরা শ' শ' বছর বেঁচে থাকতেন, কিন্তু আল্লাহ্ প্রত্যেক জীবের আয়ুষ্কাল নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। কোনও কিছুরই ক্ষমতা নেই নির্দিষ্ট সময়ের এক মিনিট আগে বা পরে তাঁর মৃত্যু ঘটাতে; হোক-না যত ইচ্ছে, আসুক-না যত বন্যা, বজ্রাঘাত, দুর্ভিক্ষ, মহামারি, দুর্ঘটনা। আল্লাহ বলেছেন, 'কোনও জীবই আল্লাহর নির্দিষ্ট সময় ছাড়া মরতে পারে না। তাঁর হুকুমের ব্যতিক্রম ঘটে না।'[১২]

শরীফসাবের মন সহসা হেয়ালি হাসিতে ভরে উঠল, নিশ্চিত হলেন হাতির মতো হার্ট-অ্যাটাক হলেও কুছ পরোয়া নেহি, কিচ্ছু হবে না, কেউ কিচ্ছু করতে পারবে না! হায়-রে ধর্ম! তোমার কাছে শাশ্বত বিজ্ঞানও ম্লান হয়ে যায়।

---

১১. অধ্যাপক ড. কাজী দীন মহম্মদ ও বিখ্যাত জ্ঞানবৃদ্ধ দার্শনিক অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ।

১২. আল ইমরান : ১৪৫।

অ পে ক্ষা

ফোঁস ফোঁস আওয়াজে প্রতি নিশ্বাসে ধূমোদ্‌গার করে যে রেলগাড়িটি করাচি অভিমুখে ছুটে চলেছে তারই তৃতীয়শ্রেণীর এক কামরায় বসে থাকা নাসিম আহমেদ জানালা দিয়ে বাইরে তাকাতেই দেখতে পেল, এঞ্জিনের নির্গত ধূম্ররাশি আকাশের নীলের সঙ্গে মিলেমিশে ধূসর বর্ণ ধারণ করে যেন বাজপাখির মতো ডানা মেলে আছে। যদি এর ওপর ভর করে বেড়াতে পারতাম সুলেমান বাদশাহ্‌র মতো! এঞ্জিনকে শক্তি যোগানোর জন্য কয়লাকে জ্বলতে হচ্ছে, ফলে গাড়ি দৌড়াচ্ছে, বাঙালি জাতিকে যদি আমি জ্বলন্ত কয়লা হয়ে দৌড়াতে পারতাম! নাসিমের অন্তর আলোড়িত, কিন্তু বহিরিন্দ্রিয় শান্ত; আঙুলগুলো সাঁড়াশির মতো শক্ত, বলিষ্ঠ হাতের পেশিও; চোখগুলো নির্লিপ্তভাবে দেখছে মানুষের ভিড়, বুদ্ধিদীপ্ত চোখ-দুটো তীক্ষ্ণ, অনুবীক্ষণ যন্ত্র যেন, মানুষের নাড়িভুঁড়ি দেখতে পাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছে মানুষের ঠেলাঠেলি, শিশু কোলে মায়ের করুণ চাউনিও। পাশের বগির দরজা দড়াম করে হঠাৎ খুলে গেল, মুখে সিগারেট নিয়ে এক ছিপছিপে লম্বা গড়নের যুবক এগিয়ে এল, পরনে আটপৌরে পোশাক, শার্টের খোলা বোতামের নিচে অসমান শ্বাসপ্রশ্বাস ওঠানামা করছে শুধু, কয়েকটি কৌতূহলী মুখ তার দিকে উঁকিঝুঁকি দিল। যুবকটি বিনা বাক্যব্যয়ে অজানা অচেনা যাত্রীদের মধ্য দিয়ে রেলগাড়ির অন্য বগিতে চলে গেল। পেছনে ঠাস্ করে বন্ধ করা দরজাটি আপন মনে কাঁপছে এবং এর পাশে ঝোলানো বিচিত্র আবর্জনাগুলো বাঁশপাতার মতো দুলতে লাগল। ধুলো ঢুকছে দরজার ফাঁক ঠেলে বরফ গলার মতো, চপ্পলপরা পায়ে চামড়ার সঙ্গে মিলেমিশে একাকার। নাসিমের মতো যারা এ-ট্রেনে লাহোর স্টেশনে উঠেছিল তাদের ভ্রুকে ভারি করে ফেলেছে পথের ধুলো। অবশ্য প্রথম শ্রেণীর ব্যবস্থা ভিন্ন। নাসিমের দৃষ্টি পড়ল কামরার অন্যপাশে, বেঞ্চে শোয়া দুটো সেপাইয়ের দিকে। সেপাইদ্বয় যদি ইতরপ্রাণী না হতো তাহলে মানুষের এত ভিড়ে অসভ্যের মতো সটান শুয়ে থাকত না; বেঞ্চের দু-হাতলে দুটো মাথা স্থাপনও করত না; বেঢপ আকারের প্রায় ছয়-ফিট দীর্ঘদেহগুলো রাক্ষসের মতো দখল করে নিত না সমস্ত বেঞ্চটি; তারা বালিশের অভাব পূর্ণ করে নিত না তাদের যাবতীয় পরিষ্কার ও ময়লা কাপড়ের পুঁটলি দিয়ে; তাদের আস্পর্ধাই নাসিমকে অবাক করে! ব্যক্তিস্বাধীনতা প্রকাশেরও একটি সীমা থাকা উচিত। স্বার্থপর গর্বিত এসব লোকগুলোকে থাপ্পড় মারতে চায় তার মন, তাদের টুঁটিও চেপে ধরতে চায়, কিন্তু না, এরচেয়ে অনেক বড় কাজের ওয়াদা নিয়ে তার সওদা। যেসব

চিন্তাভাবনা ঘুর্ণিপাক সৃষ্টি করেছে তার মগজে, সেগুলো অনুসরণ করে অপ্রকাশ্যে বলে উঠল, মনের দৃঢ়তা হারিয়ে তুচ্ছবিষয় নিয়ে বিচলিত হলে চলবে না। মনকে শক্ত করতে হবে; সহ্যের ক্ষমতা বাড়ানো উচিত। দেশের খাতিরে, স্বাধীনতা লাভের খাতিরে, সত্যপন্থা অনুসন্ধানের খাতিরে স্বীয় নীতিবোধকে শাসন করে নতুন রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ ও সাধারণ মানুষের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করতে হবে। গুটিকয়েক লোককে সাময়িক নগণ্য ফায়দা দানের লোভ আমাকে সামলাতে হবেই। নাসিম নির্বিকার; কিন্তু জানা-অজানা অব্যক্ত ব্যথা মোচড় দিয়ে উঠেছে তার বুকের ভেতর, মুখে অসামান্য বিরক্তির ছাপ। নাসিম নিজেকে টেনে সোজা করে বসিয়ে দিল। তাকে দেখলে একজন সাধারণ ভদ্রলোক বলেই মনে হয়; পরনে ট্রাউজার্স, গায়ে ভেলভেটের কোট, মাথায় জিন্না টুপি—এরকম টুপি নিয়ে কেউ বে-আদবি করে না নিখিল পাকিস্তানে, 'জিন্নাহ' নামের এমনি মাহাত্ম্য—যদিও শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত জিন্নাহর স্ত্রী ছিলেন পারসি, অগ্নি-উপাসক তবুও না। সেপাইদ্বয়ের কাণ্ডকারখানা তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে নাসিমের চোখের সামনে স্পষ্টভাবে ভেসে উঠল অন্য-একটি ঝাপসা দৃশ্য; যতই চেষ্টা করছে অনুসন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে মনকে অন্যদিকে নিয়ে যেতে ততই বেঞ্চের পিঠে তার শরীর নেতিয়ে পড়ল, মাথা হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করতেই তলিয়ে গেল। লাহোরের অদূরে ওয়াগার সীমান্তরক্ষী পাকিস্তানি এক সেপাইয়ের ঘটনায়। সেই সেপাই নাসিমকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'তুহি কোন হু?' জবাবে নাসিম বলেছিল, 'মে পাকিস্তানি হ্যায়।' পরক্ষণেই 'হ্যায়'র স্থলে 'হু' যোগ করে দিল এ-ভেবে যে, 'হ্যায়' বা 'হু' একটা-না-একটি তো শুদ্ধ হবেই, কারণ, সে জেনেছে যে, বাংলা বাক্যের শেষে 'হ্যায়' নয় 'হু' যোগ করলেই চৌদ্দ-আনা উর্দু হয়ে যায়। উর্দি শব্দ থেকে উর্দুর উৎপত্তি কী না, আর উর্দি পরতে তৎকালীন ভারতের বিভিন্ন অংশের মানুষ, বেশির ভাগ বাঙালি, একত্রিত হয়েছিল সেপাই শিবিরে, তাই উর্দু হচ্ছে ভাঙা বাংলার সিপাহি ঢঙ। নাসিম চোখ খুলল, তারপর বাইরে তাকাল। ছাড়া-বিচ্ছিন্ন, লম্বা-চওড়া, বিরাট-বিশাল ফ্যাক্টরিগুলো ছিন্নবিচ্ছিন্নভাবে স্থানে-অস্থানে তালগাছের মতো দাঁড়িয়ে আছে; মাঝেমধ্যে ছোট-বড় দালান, বাড়িঘরও দেখা যাচ্ছে। দালানগুলোর মাথা ঘিরে খোলা আকাশের শাদা শাদা মেঘপুঞ্জ ভেসে বেড়াচ্ছে, কোনও কোনও ছাদে কাপড়ও শুকোচ্ছে; ট্রেনে বসে নাসিম ঠিকই শুনতে পাচ্ছে তাদের পত্‌পত্ শব্দ। সমস্ত পরিবেশই যেন এক বিশাল-বিরাট সার্কাস; এই বিশাল-বিরাট সার্কাসটি দেখতে দেখতে তার চিন্তা চলে গেল সেই সীমান্তরক্ষী পাকিস্তানি সেপাইয়ের ঘটনায়। মাত্র পাঁচ-টাকার

বিনিময়ে প্রহরীর হাত থেকে ছাড়া পায় সে। সীমান্তপথে জিনিশ ও মানুষ যাতে বে-আইনিভাবে পারাপার হতে না-পারে সেজন্য প্রহরী মোতায়েন করেছে সরকার; কিন্তু উপরি রুজি ছাড়া তার মতো গরিবের সংসার চলে না। একটি সিজার্স চুরুট জ্বেলে সেপাই বলল, 'ম্যারি বিবিকে পরনের কাপড়ে, লারকে কি পাড়হাই, লারকি কি শাদি—উনকি তারা হামারে ভি হে; কিয়া ও ইন হালাত কো নেহি জানতে?' 'তারা' বলতে যে শাসকগোষ্ঠী তা বুঝতে অসুবিধা হয় না নাসিমের, তবে সে কথা বাড়াতে চায় না। প্রথমত—উর্দু তার তেমন পলিশ নয়, করাচি গিয়ে মাজাঘষা করতে হবে; দ্বিতীয়ত—বাঙালি বলে যদি ধরা পড়ে তবে অযথা তাকে হয়রানিতে পড়তে হবে। বাঙালি দুর্লভ উচ্চতায় তাকে অবাঙালি বলে ভ্রম হয় না; প্রয়োজন বোধে নিজেকে চালিয়ে দিতে পারে অবাঙালি বলেই, 'হ্যায়' বা 'হু' শব্দের সাহায্যে; কিন্তু এ দিয়ে তো আর খোশগপ্প চলে না; তবে মেয়ের লেখাপড়ার কথা না-বলায় তার মনে প্রশ্ন জেগে উঠল, একে সহজ ভাষায় প্রকাশ করার চেষ্টা করল, 'খুরির পড়া?' একথায় সেপাইয়ের মনের গভীরে, ব্যথিত স্থানে, আঁচড় কাটে। সে আক্ষেপ করে বলল, 'লারকে কি পড়হাই হিইতনি মুশকিল হে, তো লারকি কো কেছে পড়হাহু?' হঠাৎ সেপাই তার বন্দুক উচিয়ে ফায়ারিং পজিশন নেয়; গুলি ভর্তি থাকলে এইমুহূর্তে ট্রিগার টিপে তার অক্ষমতাকে হত্যা করতে পারত, অতি সহজে। কিন্তু তা না-করে আকস্মিক বন্দুকের বাঁট দিয়ে নাসিমের ঘাড়ে সজোরে আঘাত করে। দু-হাত দূরে কনক্রিটের মতো শক্ত মাটিতে ছিটকে পড়ে সে, ডান-হাতের তালুর চামড়া থেঁতলে যায়, হাতের ওপর ভর না-দিলে হাঁটুও মাথাকাটা লাটিমাছ হয়ে যেত। নাসিম শুয়ে থাকা অবস্থায় তার মাথা একটু উঁচু করতেই দেখতে পায় সীমান্তের অন্যপাশে এক ভারতীয় আর্মি অফিসার আরেক সেপাইয়ের সঙ্গে আলাপে রত। আসল ব্যাপারটি বুঝতে তার দেরি হয় না। এ হচ্ছে পাকিস্তানি সেপাইয়ের তকদিরের লিখন—বিদেশি এমনকি শত্রুদেশীয় অফিসার হলেও তাকে ভয় পেতে হয়। নাসিম উঠে দাঁড়ায়। সেপাইয়ের মুখে ম্লান হাসি দেখে নাসিম নিশ্চিত হয়, কিছুক্ষণ আগে সেপাই যে কাণ্ডটি করেছে তা ইচ্ছেকৃত বা উদ্দেশ্যমূলক নয়।

বেঞ্চে শোয়া সেপাইদের নাক-ডাকা শুরু হয়েছে; কখনও-বা আস্তে আবার কখনও-বা দ্রুত। রেলগাড়ি ছুটে চলেছে আপন মনে। কোনও দিকে তার ভ্রুক্ষেপ নেই, তবুও বিচরণ করছে সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের সঙ্গে মিলেমিশে; বাস্তবতাকে অস্বীকার করে নয়, অতীতকেও না, বরং বিশ্বমানবের সঙ্গে পরম আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে ও মেহনতি মানুষের সঙ্গে সুনিবিড়

সম্পর্ক স্থাপন করে। সুখে-দুঃখে গড়ে ওঠা মেহনতি মানুষের জীবনের মতোই যেন রেলগাড়িটি ছুটে চলেছে; এঁকেবেঁকে বয়ে চলা রেললাইনের পাশ থেকে যেমনি সাধারণ মানুষ তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় প্রয়াস সঞ্চার করে তেমনি রচিত হচ্ছে মানবেতর জীবনযাপনের বাস্তবতা—সৃষ্টিসুখের উল্লাস। নতুন জগৎ সৃজনের জন্য অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে একটি বিচ্ছেদহীন সেতু যেন সৃষ্টি করে চলেছে। একে-অপরের সঙ্গে যোগাযোগ সহজ করাই যেন তার বাসনা। রেলগাড়ি ছুটে চলেছে রেললাইনের দু-পাশে আশ্রয় নিয়ে বেড়ে ওঠা নানারকম গাছগাছালি, ভাঙা ঘরবাড়ি, ফসলের ক্ষেত-মাঠ পিছনে ফেলে। পেছনে পড়ে থাকে সাধারণ নরনারীর কলহাস্যে মুখরিত পরিবেশটিও। যতই নাসিম দেখছে ততই তার মনে হচ্ছে—এখানেই সৃষ্টি হয়ে চলেছে সমগ্র মানবজাতির বাস্তবজীবনের চাহিদা মিটানোর অধিকার—নতুন দিগন্ত। ট্রেনটি ছুটে চলেছে করাচি অভিমুখে। নাসিমের কানে আবারও ভেসে এল বেঞ্চে শোয়া সেপাইদের বেতালা যুগলবন্দী, এরইসঙ্গে দু'জন বাঙালির কথাবর্তাও। একজন বলে চলেছেন, 'গলাধাক্কা পাসপোর্টে কয়কবার ত্রিপুরা, আসাম ও পশ্চিম-বঙ্গ থেকে পূর্ব-বাংলায় যাতায়াত করেছি। দু-চার টাকা দিলেই সীমান্তরক্ষী সেপাই বেশ খুশি হয়ে যায়। সীমান্ত পাড়ি দিতে তখন আর কোনও অসুবিধা থাকে না। এরসঙ্গে নাসিরুদ্দীন বিড়ি দিলে তো কথাই নেই। সহজে আলাপ জমে ওঠে।' তিনি অনুযোগ করে বললেন, 'ব্রিটেনের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে আমরা সুখী হতে পারিনি, বরং মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছি যে, ইংরেজই ভালো ছিল।'

অপরজন বললেন, 'এ আপনার অভিমানের কথা ভাই, আসলে পরাধীনতার জগদ্দল পাথর যে-কোনও বিদেশির নামে আপনি বহন করেন না কেন, পরাধীনতার তীব্রতা দিনদিন বাড়েই, আস্তেধীরে ব্যথার ব্যাপকতাও আপনি অনুভূত করবেন।'

'এই পরিস্থিতি থেকে বাঙালি কী কোনও দিন নিষ্কৃতি পাবে!'

'কেন পাবে না, তবে ন্যায্য দাবি আদায়ের জন্য আন্দোলন করতে হবে।' তারপর যোগ করলেন, 'বাঙালির মানানসই নাম পূর্ব-বাংলা শব্দটি আমার খুবই প্রিয়। পূর্বপুরুষের দেওয়া 'বঙ্গদেশ' বদলে রাখা হয়েছে পূর্ব-পাকিস্তান, আমি তা সহ্য করতে পারি না।'

দেশ বিভাগে ভাগ্য প্রসন্ন হওয়া এক বাঙালি ব্যবসায়ী, বিদেশি সিগারের ধোঁয়া ছেড়ে, কখনও আস্তে, কখনও বেগে আলাপে যোগ দিলেন, একসময় বললেন,

'কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ পূর্ব-বাংলাকে পাকিস্তান নামের রাষ্ট্রের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি এই অঞ্চলকে বিচ্ছিন্নতাবাদ থেকে মুক্ত করে মুসলিম-জাহানের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। তিনি ইসলামিক ভাবধারার পরিপূর্ণ প্রভাবে বাংলার মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষগুলোকে পরিবর্তিত, পরিবর্ধিত, আবর্তিত করে দুনিয়া ও আখিরাতের ইতোপূর্ব সঙ্কীর্ণ পথটিকে প্রশস্ত করেছেন।

নাসিম দেখে বঞ্চিত আত্মার কী আত্মপ্রবঞ্চনা! দ্বিতীয় লোকটি বললেন, 'তখনকার ভারতবর্ষের যেসব প্রদেশের প্রথম অক্ষর অর্থাৎ পাঞ্জাবের 'প', আফগান ফ্রন্টিয়ারের 'আ', কাশ্মিরের 'ক', সিন্ধুর 'স' আর বেলুচিস্তানের 'স্তান' নিয়ে 'আলি এ্যাণ্ড কোম্পানি' লন্ডনে বসে 'প-আ-ক-স্তান' বা 'পাকিস্তান' শব্দচয়ন করেছিল এতে বঙ্গদেশের কোনও চিহ্ন ছিল না, বা 'ব' অক্ষরের যে অভাব আছে তা দেখার মতো সজাগ চোখ আপনার মতো যে-কোনও ব্যবসায়ীরই থাকা উচিত।'

প্রথম লোকটি বললেন, 'এছাড়াও মিস্টার জিন্নাহ যে, বঙ্গদেশকে পাকিস্তানের অংশ হিশেবে অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষে ছিলেন না তার প্রমাণ পাওয়া যায় বড়লাটের কাছে প্রেরিত প্রস্তাবপত্রে।'

ব্যবসায়ী বললেন, 'যা-ই বলেন না কেন, একথা স্বীকার্য যে, এতদিন আমরা কাশীর সঙ্গে যুক্ত ছিলাম, এখন কাবার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছি।'

দ্বিতীয় লোকটি বললেন, 'কাশীর সঙ্গে যুক্ত থাকা বা কাবার সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার মধ্যে আমাদের ইহকাল বা পরকাল নির্ভরশীল নয়, বরং তা নির্ভর করে ব্যক্তিবিশেষের আত্মার উন্নতি ও ব্যাপ্তির ওপর।'

প্রথম লোকটি বললেন, 'দেখুন, আরব ভূখণ্ডের মালিক সৌদি রাজ-পরিবার, তারা বংশের নামে রাষ্ট্রের নাম রেখেছেন।'

দ্বিতীয় লোকটি বললেন, 'সৌদি আরব নিয়ে গর্ব করার মতো সে-দেশের মানুষেরই কিছু নেই, কারণ রাজ্য শাসনে তাদের কোনও অধীকার নেই, আর আমরা তো কোন ছার!'

'হিন্দুস্থান নামে বুঝি কোনও দোষ নেই?' শ্লেষোক্তি ব্যবসায়ীর।

'এই যা বললেন।' দ্বিতীয় লোকটি গম্ভীরতা বজায় রেখে বলে চললেন, 'হিন্দুস্থান, পাকিস্তান, ইজরাইল—এই তিনটি নামের একটিও মানানসই নয়।

ধর্মের খোলসে রাজনৈতিক নাম। আমার মতে দেশের নাম হওয়া উচিত ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক ভিত্তিতে। তাই আমার কাছে পূর্ব-পাকিস্তানের চেয়ে পূর্ব-বাংলা নামটি অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য। এ-অঞ্চলের যোগ্য নাম কারো অজানা নয়। যদি ভুলে গিয়ে থাকেন ভূগোল ও ইতিহাসে বর্ণিত সেই নামটি, উর্দু ভাষা রপ্ত করার কসরতে, তাহলে কাজী নজরুল ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানে, কবিতায়, প্রবন্ধে ও উপন্যাসে নিশ্চয় তার সন্ধান পাবেন—বাংলাদেশ, বঙ্গদেশ।'

একটি ঝাঁকুনি দিয়ে রেলগাড়িটি হঠাৎ থেমে গেল, সঙ্গে সঙ্গে নাসিমের অন্যের আলাপ শোনার মন্থনক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেল। সে জানালা দিয়ে তাকাতেই দেখল—স্টেশনের নাম-লেখা ফলকটি ঠিকমতো পড়া যাচ্ছে না, কে যেন অক্ষরগুলোকে শক্ত পাত দিয়ে ভেঙে দিয়েছে। প্লাটফরমে ট্রেন পৌঁছানোর আগেই বিরতি টেনেছে। হঠাৎ থেমে যাওয়ার কারণ জেনে নেওয়ার আগেই ট্রেনটি আবার চলতে শুরু করল। ধুলোমাখা দমকা হাওয়ার সঙ্গে পাতলা ওড়না জড়িয়ে একজন বৃদ্ধা যাত্রীদের মধ্য দিয়ে হেঁটে চললেন। তার মাথা কাঁপছে। বৃদ্ধার পাশ দিয়ে একদল ছেলেমেয়ে চিৎকার-চেঁচামেচি-হাসাহাসি করে চলে গেল। লিকলিকে থুত্থুরে হাত বাড়িয়ে বৃদ্ধা আঁকড়ে ধরলেন সামনে চলা তার ওয়ারিশের কোমর। যুবকটি মাঝারি কেশের মাথা ও পাকা আনারসের মতো তামাটে রঙের মুখ ঘুরিয়ে পেছন ফিরে তাকাল বৃদ্ধার দিকে। বিশাল চেহারার যুবকটি বৃদ্ধাকে হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরে মোটা-তাজা ও ধীরস্থির পদক্ষেপে স্বচ্ছন্দে টেনে নিয়ে এগিয়ে চলল। যাত্রীর ভিড়ে চারদিক থেকেই টুকরো টুকরো কথাবার্তা, হাসাহাসি, ছোটবড় আওয়াজ জোর কদমে নাসিমের কানে এসে ধাক্কা খেতে লাগল। একইসঙ্গে চোখে এসে ধাক্কা খেল এককোণে বসে থাকা কৃষক-বৌয়ের লাল টকটকে পোশাকটিও। নাসিমের পেছনের সিটে বসা দুটো বখাটে ছোকরা কৃষক-বৌয়ের লাল পোশাকটি নিয়ে হাসি-তামাশা শুরু করেছে। পটপট বুট ভাঙছে আর মাঝেমধ্যে খিলখিল করে হেসে উঠছে। একইসঙ্গে অস্পষ্ট অশ্লীল গান, ফাঁকে ফাঁকে মৃদু শিসও। কৃষক-বৌ অবলার ভঙ্গিতে নিজের হাত নিজে ডলছে। মুখ টিপে চোখের ইশারায় তার পাশে বসা লোকটিকে কী যেন অনুরোধ করার চেষ্টা করছে; হয়তো-বা তাকে এখান থেকে অন্য বগিতে নিয়ে যাওয়ার জন্য বলছে। শান্ত নিরীহ প্রকৃতির লম্বা গড়নের খেটে-খাওয়া লোকটি কৃষক-বৌয়ের সামনে একটি পুঁটলি হাতে নিয়ে নিশ্চুপ বসে রইল, কিছুই বলল না, তার মুখে চিন্তার ছাপ। মনে হচ্ছে বেশ মনোযোগ দিয়ে শুনছে চারদিক থেকে ভেসে আসা কথা, হাসাহাসি, কিন্তু খুঁজে পাচ্ছে না

ঠিক এই মুহূর্তে, এই চরম পরিস্থিতিতে তার কী করা প্রয়োজন! কৃষক-বৌ লোকটির অবস্থা বুঝতে পারছে, তাই তার নিশ্বাসে বুকে জমে থাকা চাপা আর্তনাদ যেন বেরিয়ে আসতে লাগল।

রেলগাড়ি ঝাঁকুনি দিয়ে টলতে টলতে এগিয়ে চলল। নাসিমের শরীর নেতিয়ে পড়েছে বেঞ্চের গায়ে। সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অবশ হয়ে এল বুঝি! এই জড়সড় অবস্থায় সে শুনতে পেল একজন যাত্রী উর্দুতে বলে চলেছেন লাহোরের কথা। গজনীর বাহিনী লাহোরে আসার কয়েক হাজার বছর পর, ক্রীতদাস আয়াজকে লাহোর অঞ্চলের শাসনকর্তা হিশেবে নিযুক্ত করলেন সুলতান মাহমুদ, গোলামকে উপহার দেওয়ার উপযুক্ত লোকালয় জ্ঞানে। তবে মোগল আমলেই লাহোরকে প্রথম শহর বলে গণ্য করা হয়, আর সম্রাট আকবরের সময় সম্ভবত তাঁর গোপনপ্রিয়া ও সেলিমের প্রকাশ্যপ্রেমিকা আনারকলির বাসস্থানের জন্য শহরটি রাজধানীর সম্মান লাভ করে। সম্রাট ও ভাবী রাজার উপস্থিতি যে প্রিয়ামিলন স্থলে ঘটেছে তা তো ধন্য হবেই; রাজাসন যে-স্থানে তা-ই তো রাজধানী। আনারকলির রূপের সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে লাহোরের খ্যাতি। রূপসীর দেহসৌন্দর্যের সঙ্গে শুরু হয় শহরের আখ্যানের ব্যাখ্যা। 'হিন্দু না মুসলমান' এর পরীক্ষানিরীক্ষা। মুসলমান-সম্প্রদায় দাবি করে 'হুর' এসেছিল লাহোরে, ফেরশতার সঙ্গে কোনও এক ফেরেববাজিতে; আর হিন্দু-সম্প্রদায় দাবি করে 'রামায়ণ'-এ বর্ণিত বিষ্ণুর অবতার অযোধ্য রাজা দশরথের পুত্র রামের ঔরসে ও সীতার গর্ভে যে যমজসন্তান জন্মায় সেই লব-কুশের নামানুসারে তৎকালীন নগণ্য এই শহরের নামকরণ করা হয় 'লাহোর', এ-হচ্ছে পৌরাণিক কাহিনী। অন্যদিকে অত্যাচারিত জাতি একতাবদ্ধ হয় সহজে, সমষ্টিস্বার্থে; তারা কালক্রমে শক্তি সঞ্চয় করে অন্য মানবগোষ্ঠীকে অধীনস্থ করে অতীতের প্রতিশোধ নিতে চায়। যেমনি হিটলার দ্বারা নির্যাতিত ইহুদি আজকাল প্যালেস্তিনিদের ওপর আক্রোশ বর্ষণ করছে, তেমনি আওরঙ্গজেবের তিরোধানে, যোগ্য উত্তরাধিকারীর অভাবে, পাঞ্জাবের রনজিৎ সিংহের নেতৃত্বে পাঞ্জাব থেকে পাঠান শাসকদের বিতাড়িত করতে শিখজাতি ওঠেপড়ে লাগে শিখরাজ্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে। শিখরাজ্য স্থাপন করে শিখরা মোগল বাদশাহদের মতো হারেম সৃষ্টি করে বিলাসিতায় গা ভাসিয়ে দিলেও কঠিন শাসনে মুসলিম প্রজার প্রতি পূর্বপুরুষের দাদ আদায়ে সক্রিয় হয়ে ওঠে। অবশ্য তোষণে ইংরেজ সন্তুষ্ট থাকায় রনজিৎ সিংহের চল্লিশ বৎসর রাজত্বকালে যে-তুফান সারা ভারতবর্ষের, ইংরেজ ষড়যন্ত্রে শিকার হওয়া রাজন্যবর্গকে তোলপাড় করেছিল, সে-ধাক্কা কখনও এসে লাগেনি রাভি নদীর তীরে।

রেলগাড়ি আবারও ঝাঁকুনি দিল, সঙ্গে সঙ্গে নাসিমের শরীর সচেতন হয়ে উঠল। ধুলোমাখা বাতাসের দাপট কেটে গেলে বেঞ্চ ছেড়ে জানালার দিকে এগিয়ে এল। আঙুল দিয়ে চুল ঠিক করার ব্যর্থ চেষ্টা করে ঘাড়কে নিচু করে মাটির দিকে ঝোঁকাতেই দেখতে পেল, মাটি যেন পিছনের দিকে দৌড়াচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে চোখের সামনে ভেসে উঠল দু-দিন আগে দেখা আনারকলি বাজারের কথা। সম্রাট আকবরের হারেমের 'হুরি' আনারকলির নামানুসারে সৃষ্টি করা যে-বাজার, যার সঙ্কীর্ণ গলিতে বিরাট বিপণী পণ্যে পূর্ণ, সে-বাজারকে কেন্দ্র করে দ্বাদশ দ্বার যুক্ত দেওয়াল ঘেরা মোগল আমলের লাহোর শহর, যা কালের পরিবর্তনকে উপেক্ষা করে অক্ষয় হয়ে আছে হাজারীভাগ থেকে মোরীদ্বার পর্যন্ত। পানি ও বিদ্যুতের প্রতারণা ব্যতীত, অতীত স্মৃতির সম্মানার্থে 'সুইস মিস্ লিপস্টিক এ্যান্ড নেল পলিশ' বিজ্ঞাপনের দশ-গজ দূরে যে-বলদ ঘানি টান ছিল তারই পাশে দাঁড়িয়ে এক বুড়ো গোবরের গন্ধভরা একচালা ঘরের মেঝের গর্ত থেকে টিন ভরে তেল তুলছিলেন, তার পূর্বপুরুষ সম্ভবত এমনিভাবে কর্মরত অবস্থায় ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে প্রথম মোগল সম্রাট জহীরুদ্দীন মোহাম্মদ বাবরের দর্শন লাভে ধন্য এবং সম্রাট বাবর বৃদ্ধার কর্মকৌশলে মুগ্ধ হয়েছিলেন।

নাসিম বেঞ্চে ফিরে চোখ নির্মীলিত করার চেষ্টা করল। চোখের পাতাগুলো ঘুমে ভারি। আরেকটি স্টেশন ছেড়ে গেল রেলগাড়িটি। ছোট স্টেশন তাই থামল না। নাসিম চোখ খুলতেই দেখল, সেপাই দুটো উঠে বসে অজায়গায় কুজায়গায় দৃক্‌পাত করতে করতে বিস্তর গোল করছে। কৃষক-বৌয়ের ওপর অল্পবয়সের সেপাইটির নজর, তার জিভ যেন চুচুক শুষে তৃষ্ণা মেটানোর জন্য লকলক করছে, তার দৃষ্টিতে ডাকিনী-যোগিনীরা নেচে বেড়াচ্ছে, আর রূপসীর নরম-কোমল রক্তমাংস চিবিয়ে খাওয়ার জন্য তার মুখের পেটানো পেশিগুলোও শক্ত হয়ে উঠেছে। পোশাকের আড়ালে আশ্রয় নেওয়া গোপন আলোড়নও ক্রমশ প্রকাশ পাচ্ছে। বুক কাঁপছে। শার্টের ফাঁকে বুকের বোঁটা দিয়ে যেন কামনির্বাপিত তৃষ্ণা গড়িয়ে পড়ছে। আঁকাবাঁকা মরুভূমির মতো উঁচুনিচু পৌরুষ পেটের শক্ত নিটোল মাংসপিণ্ড যেন টানটান হয়ে উঠেছে। যুবকটি নারীদেহের সৌন্দর্য-গরিমা থেকে বঞ্চিত তাই হয়তো তার গোপন অনুভবগুলো এত তীব্রভাবে প্রকাশ পাচ্ছে। কৃষক-বৌয়ের আচরণে, নাসিম সহজেই বুঝতে পারছে, সেপাইয়ের ছদ্মবেশে শয়তান যেন নেমে এসেছে তার সামনে; এক সংক্রামক ব্যাধির মতো অদৃঢ়চিত্ত ও দুর্বলাত্মার পুরুষের দ্বারাই নারী ধর্ষিত হয়। অসহায়বোধের তাড়নায় কৃষক-বৌ ওড়নার আঁচল দিয়ে শয়তানের আক্রমণ থেকে দেহকে বাঁচানোর জন্যে নিজেকে শক্ত করে বেঁধে নিল। ব্রেইন

আপনা-আপনি, মানুষের সজ্ঞান ইচ্ছের অগোচরে, অনেক কিছু সম্পন্ন করে রাখে। অসহায় কৃষক-বৌয়ের আচরণ নাসিমকে ক্ষোভগ্রস্ত অনুভবের দিকে ঠেলে দিল। নাসিমের দুটো বলিষ্ঠ মুঠো শক্ত হতে লাগল। কী করা উচিত—উত্তর খুঁজে পাচ্ছে না সে; রক্তচোখে নিশ্চুপে বলল, সেপাইয়ের ব্যবহার এত জঘন্য, নীচ, ভাবাই যায় না। অপ্রত্যাশিতভাবে নাসিমের গায়ে আগুন জ্বলে উঠল। মাথায় আকস্মিক চাপ অনুভব করল। মাথাকে বিগড়ে দিয়ে অন্তরে সঞ্চিত প্রতিবাদের দানাগুলো মেঘের মতো পুঞ্জীভূত হতে লাগল। কৃষক-বৌয়ের ভালমন্দের কথা আমাকে ভাবতে হবে। এ-অসহায়, নিরাশ্রয়, নির্বান্ধব, নির্দোষ নারীর অপমান আমি আর সহ্য করতে পারছি না। নিজস্ব ভীতসন্ত্রস্ত ভাবকে নিজের আয়ত্তে এনে নাসিম উঠে দাঁড়াতেই রেলগাড়ি হাঁপাতে হাঁপাতে একটি স্টেশনে এসে থামল। অচেনা অজানা পথচলা মানুষের সঙ্গে সেপাই-দুটো রেলগাড়ি থেকে নেমে পড়ল।

রেলগাড়িটি আবার চলতে শুরু করেছে, কত সময় হয়েছে কে জানে, জানার কী-ই-বা দরকার! হোক যত ইচ্ছে। চোখ মেলে ঘড়ি দেখার ইচ্ছে নেই নাসিমের, ঘুমকে আর সরিয়ে রাখতে পারছে না, এ-যেন আদমবেপারি দালাল, নাছোড়বান্দা। গাড়ির ঝাঁকুনিতে সামনে বসা মানুষের হাঁটুর সঙ্গে তার হাঁটুর ঘষাঘষিতে তন্দ্রা টুটে গেল, তবু চোখ খুলল না। মানুষটি মেয়ে, না পুরুষ, জানার কৌতূহল তার নেই। তৃতীয়শ্রেণীর যাত্রীর মধ্যে স্ত্রীপুরুষের ভেদাভেদ নেই। বনেদিঘরে পর্দা মানায়, সাধারণের পর্দা করা আবার আভিজাত্যের ইজ্জতে আঘাত পরে বলেই হয়তো তারা পর্দা করে না; পার্থক্য না-থাকলে প্রাধান্য বজায় রাখা যায় না, সমাজে ফাটল ধরে না। অদম্য স্রোতশক্তির পথে বাধাবিঘ্ন সৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা না-থাকলে নদী তার পাড় ভেঙে নতুন পথ রচনা করত না, পুরাতনকে ভেঙে নতুন জমি সৃষ্টি করত না—এসব নাসিমের অজানা নয়। বোজা চোখেই নাসিম একটু নড়েচড়ে বসল। বসার স্থানকে একটু আরামদায়ক করার চেষ্টা করল, ঘুমদূত যেন নারাজ না হন। দোলনায় দোল-খাওয়া শিশুর মতো শীঘ্রই সে নিদ্রাভিভূত হল। কিছুক্ষণের মধ্যেই একটি অদ্ভুত স্বপ্নে বিভোর হল সে। স্থান-কাল ভেদহীন, সামঞ্জস্য শূন্য। অপ্রত্যাশিত অবস্থায় মানুষ যখন স্বপ্ন দেখে তখন তা অদ্ভুতই হয় বটে! একের-পর-এক দৃশ্য যখন চোখের সামনে ভেসে ওঠে তখন তা উপস্থাপনার ক্ষেত্রে, দৃশ্যবিন্যাসের ক্ষেত্রে, বর্ণনার ক্ষেত্রে, প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে এত সূক্ষ্ম ও বিশ্বাসযোগ্য ঘটনা ঘটে যে, তা যে দেখছে তার কাছেও অবিশ্বাস্য; এ কল্পনা, নাকি বাস্তব! নাসিম কিন্তু স্বপ্নই দেখছে: পালের নৌকা নদীর স্রোতে টলমল করছে। হাল ধরে আছে একজন নবীন মাঝি।

বাতাসের বেগ বেড়ে চলেছে। মেঘের-পর-মেঘ ঘনীভুত হচ্ছে আকাশে। বাতাস পৃথিবীর শিরা-উপশিরা কাঁপিয়ে দপদপ করে জেগে উঠেছে। মেঘে বাতাসে চলছে ধস্তাধস্তি। বিজলি চমকও। বৃষ্টিও ঝরছে তুমুল বেগে, ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে পৃথিবীর বুক। বৃষ্টি ও বাতাসের যুদ্ধে মাঝির মাথার ছাতা উড়ে গেল, পাল ছিঁড়ে পড়ল; তবুও তরী চলল তীরবেগে, পাটক্ষেত পেছনে পড়ে রইল। নদীর উভয় কূল প্লাবিত। ঢেউয়ের তালে নৌকা দোলছে বিষম বেগে। তুফান নৌকার ছাদ ও বর্গার ঝুঁটি ধরে প্রলয়তাণ্ডব নৃত্যে মত্ত। ঝরে-ছিঁড়ে-ভেঙে পড়ছে বর্গা সব। ছাদ ভেঙে ছইয়ের হাড়গুলো বেরিয়ে পড়েছে, যেন পেতনীর দাঁত, এরই মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে একটি নারী, কোলে তার কম্পমান বছর দেড়েক শিশু; মা'র বুকে দুধ নেই, শুকনো; ফানুস ফেটে বায়ু বেরিয়ে গেছে যেন। শিশুর চিৎকারে দিগ-দিগন্ত মাতাল। শিশুকে আলিঙ্গন করে মা ফুঁপিয়ে কাঁদছে। শিশুটি তার নগ্ন হাত-দুটো প্রসারিত করেছে শূন্যে। মা-পুত্রের দেহ বৃষ্টির জলে ভিজে একাকার। অজানা আশঙ্কায় কেঁপে উঠল নাসিমের বুক। দুর্বল গলায় তবে তীক্ষ্ণতীব্র স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'তারা কাঁদছে কেন?' মাঝি উত্তর দিল, 'সে যে কচি বাচ্চা, দুধের জন্য তো কাঁদবেই।' মাঝির মুখে 'বাচ্চা' শব্দটি এমনভাবে উচ্চারিত হল যে, সে আবেগ নাসিমের চিন্তাশক্তিকে দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিল। 'কিন্তু কাঁদছে কেন?' নাসিম আহাম্মকের মতো বকে যাচ্ছে, 'কঙ্কালসার দেহ অনাবৃত কেন?' মাঝি বলল, 'তারা যে গরিব। ঝড়ে উড়িয়ে নিয়েছে তাদের কুঁড়েঘর। এখন বৃষ্টিতে ভেজা ছাড়া তাদের আর উপায় কী!' নাসিম দেখল অর্ধাহারে শুকিয়ে তারা কাঠ। বিষাক্ত জলের মতো তাদের শ্বাসপ্রশ্বাসে বেরিয়ে আসছে পচে যাওয়া শরীরের দুর্গন্ধ। এখন আর তাদের উঠার ক্ষমতা নেই। এত দুর্বল হয়েছে যে, পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারছে না। তাদের বাঁচাই কঠিন। শিশু কোলে মায়ের দল জড়ো হচ্ছে নদীর পাড়ে, যেন ইঁদুরগুলো গর্ত থেকে বেরিয়ে এসেছে বাচ্চাসহ, উলঙ্গ বেগুনাহ শিশুর দল, গোনা যায় না; ছিন্নতেনাবৃত শীর্ণ দেহ মা'দের, তারা বেগানা পুরুষচক্ষে। 'না, না, তা হয় না। হতে পারে না। হতে দেওয়া যায় না।' নাসিমের অন্তরাত্মা যেন চিৎকার করছে, এ হৃদয়বিদারক ব্যবস্থার প্রবর্তক কোথায়? বলো, ওরা গরিব হওয়ার জন্য দায়ী কে? শিশুর দল কেন বস্ত্রহীন? এসব কী অবিচার নয়! নাসিম বুঝতে পারে তার প্রশ্নগুলো বর্তমান আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় সঙ্গতিহীন, অযৌক্তিক; তবুও এসবই তার অন্তরতরঙ্গে ঘাতপ্রতিঘাতে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে রচনা করছে বিদ্যুৎ, যার আলোতে দৃশ্যগত হতে লাগল আঁধারে গ্রাস-করা ট্যানেলের অপরমুখে আলোকরশ্মি, সেখানে শিশুর মুখে হাসি ফুটে উঠেছে, মায়ের বুকের ভাণ্ডার উপচে পড়ছে। সেই আলোকরশ্মির

কাছে সবাইকে নিয়ে যেতে হবে, সুড়ঙ্গপথে ধরাধরি করে, কাঁধেপিঠে বহন করে, সেজন্য চাই বন্যহস্তির শক্তি, চাই সিংহের সাহস। আমি পারব। দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ নাসিম, তার অন্তর উদ্ভাসিত, এগিয়ে চলার অদম্য শক্তির উৎসসন্ধান লাভে। পালে লেগেছে হাওয়া; নবীন মাঝি গান গাইছে; চারিদিকে উদ্দাম উল্লাস, বিজয় উৎসব। নাসিম বিস্ময়ানন্দে চিৎকার করে উঠল, 'ইউরেকা! ইউরেকা!' তার তন্দ্রা টুটে গেল। তবে তার ষড়ঙ্গ—মস্তক, হস্তদ্বয়, কোমর, পদদ্বয়—স্বেদাপ্লুত। আনন্দে তার দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে যেন, তবে তার সারা মুখে প্রশান্তির হাসি ফুটে উঠেছে। এই স্বপ্ন আমার আগামী দিনগুলোর ওপর চরম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে, আমার জীবনে গভীর ছাপ ফেলবে।

রেলগাড়িটি ড্রিগরোড স্টেশনের ইংরেজি ও উর্দুতে বড় বড় অক্ষরে লেখা সাইনবোর্ডটি ফেলে গেল। তার পরই ক্যান্টনমেন্ট। রেললাইনের প্রায় সমান্তরালে বয়ে চলেছে মালীর রোড। কিছু দূর এগিয়ে মালীর হাবভাব পরিণত হয়েছে শাহ্‌জাদায়, রাজকীয় জাঁক্‌জম্‌কে; এখানে মালীর রোড পরিবর্তন হয়েছে ফয়সল রোডে। নাসিম উভয় পাশে তাকিয়ে দেখল, কেমন করে করাচি ফুলে ফেঁপে বড় হচ্ছে, ফুলছে তো ফুলছেই, অজগরের মতো আস্ত পেটে ঢুকিয়ে নিচ্ছে ড্রগরোডটিকে; মনে হচ্ছে এয়ারপোর্ট ও মালীর ক্যান্ট পর্যন্ত মেলে দিয়েছে তার ডানা, হয়তো-বা আরও দূরে। যতদূর দৃষ্টি পৌঁছোয় ততদূরই দেখা যাচ্ছে দালান আর দালানের সারি—পাঁচতলা, দশতলা; এরমধ্যে এক-একটি দালান অন্যগুলোর সঙ্গে আড়ি ধরে এমনভাবে ওপরে ওঠে গেছে যেন পাহাড়চূড়া। দেশবিভাগের সময় করাচির লোকসংখ্যা ছিল চার লাখ, এখন সত্তর লাখ ছাড়িয়ে গেছে। ঢাকা ও চট্টগ্রামের মতো ছিন্নবস্ত্রধারী ভিখারির দল নাসিমের নজরে পড়ল না। সে সত্যি সত্যি উপলব্ধি করছে যে, প্রফেসর রেহমান সোবহানের মন্তব্যগুলো সঠিক। পরীক্ষানিরীক্ষার অজুহাতে ঢাকা-দেহ-ধমনীর রক্ত শাসকগোষ্ঠী শোষণ করে এনে করাচির শিরা-উপশিরায় নবজীবন সঞ্চার করছে। ক্লাইভের খঞ্জর তারা উত্তরাধিকারের সূত্রে পেয়েছে বলেই হয়তো এমন করছে! তারা এর উপযুক্ত জবাব পাবে যদি বাঙালি জাতি একদিন জেগে ওঠে। নিজেকে আশ্বাস দিল নাসিম, সেই জাগরণের আমি হব নাবিক।

সামনে দেখা যাচ্ছে কোরাঙ্গি রোডের সাইনবোর্ড। নাসিমের মনে পড়ে গেল, কোরাঙ্গি ক্রিকে অবস্থানরত দিনগুলোর কথা; দশ বছর আগের ঘটনাবলি স্মৃতিতে উজ্জ্বল, মনে হয় সেদিনের কথা। নৌবিমানের ওঠানামা অবলোকন

তার খুব প্রিয় ছিল। রাজহংসের মতো ডানা মেলে, গ্রীবা উঁচু করে পানির ওপর ভেসে বেড়াত উড়োজাহাজগুলো। সমুদ্রসৈকতের এক পাথরখণ্ডের ওপর বসে দূর-দিগন্ত পানে চেয়ে থাকত নাসিম; যেখানে আকাশ নতজানু হতো বারিধিপদে, আর আশমানের এই নতি স্বীকারে তরঙ্গবালাদের কলহাস্য ভেসে আসত তার কর্ণকুহরে, কোকিলের কুহুকুহু ধ্বনির মতো মন মাতানো শব্দে।

ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনে রেলগাড়িটি থামল; পেছন থেকে যেন কারো কুলক্ষণের ডাকে অনিচ্ছেয় থমকে দাঁড়াল। যাত্রীদল হুমড়ি খেয়ে পড়ল একে-অন্যের ঘাড়ে। প্যাটেরা থেকে বেরিয়ে পড়া পোঁটল-পুঁটলি ভেতরে ঢুকিয়ে নেমে পড়ল যাত্রীরা, যাদের প্রিয়া-মিলন-সাধ মিটে গেছে গত বারো ঘণ্টার কাঁঠলীগরমে, তাদের জান নিয়েই এখন টানাটানি চলছে যেন। ফোঁস ফোঁস করে রেলগাড়িটি আবার সজীব হয়ে গর্জে উঠল, ছুটছে, যেন এবার মঞ্জিলে মকসুদে না-পৌঁছে থামবে না কোথাও। কারো চোখ-রাঙানো সে পরোয়া করবে না! রেসকোর্স বাঁয়ে রেখে রেলগাড়িটি এগিয়ে চলেছে সাপের মতো লিকলিকিয়ে। সামনের রাস্তা ক্রস করবে বলে উভয় পাশের গেট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কোনও একসময় এই ক্রসরাস্তা ভিক্টোরিয়া রোড নামে পরিচিত ছিল, এখন ইকবাল রোড, পারস্য ভাষায় পাকিস্তানি কবি ইকবালের নাম অনুসারে। রাস্তাটি বিভিন্ন নামে ক্লিফটনকে বেষ্টন করে কিমারী পর্যন্ত চলে গিয়েছে, সেখানে গালিব ও ন্যাপিয়ার মোলী রোড এসে একের সঙ্গে অপর মিশেছে, সেই মিলনবিন্দু থেকে নৌবিহারে মানওয়ারা দ্বীপ পর্যন্তও যাতায়াত করা যায়, সহজে। দূর থেকে নাসিম দেখতে পেল 'মেমন' মসজিদের গম্বুজটি। সিটি স্টেশন আর দূরে নয়—এ আন্দাজ করে নাসিম মাথা থেকে জিন্না টুপিটি খুলে ফেলল, যা ধুলোবালি থেকে তার ঘন-তামাটে-কালো চুলকে এতক্ষণ রক্ষা করছিল। কাপড়চোপড় ঝেড়ে স্যুটকেস ও ব্যাগ হাতের পাশে আনতে-না-আনতেই ট্রেনের গতি মন্থর হয়ে এল। ট্রেনটি করাচি সিটি স্টেশনে পৌঁছতেই তার যাত্রার ইতি ঘটল। যাত্রীরা একসঙ্গে নামতে উদ্যত হল, এক মিনিট দেরি যেন কারো সহ্য হচ্ছে না আর। দরজার সামনে ভীষণ ভিড়, তেমনি অবস্থা গেটের সামনেও; একসঙ্গে অনেকগুলো হাত এগিয়ে এল টিকেট কালেক্টোরের দিকে। টিকেট কালেক্টোর একে একে টিকেট সংগ্রহ করে চলেছে। নাসিমের সামনে ডজনের বেশি স্ত্রীপুরুষের জটলা। এদের ফাঁকে নাসিমের দৃষ্টি পৌঁছে গেল তার প্রেমিকার ওপর, গেটের অন্যপাশে, যেখানে আপনজনের অভ্যর্থনায় ভিড় জমে উঠেছে। গেট পেরিয়ে এগিয়ে এল নাসিম, দৃষ্টি বিনিময় হতেই প্রেমিকা ভিড় ঠেলে ত্রস্তপদে কাছে এসে নাসিমকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'কেমন আছো?

অনেকদিন তোমাকে দেখিনি। বার্তা পেয়েই দিন গুনতে শুরু করেছি কবে তেইশ তারিখ আসবে।'

আর দু-দিন পরই ২৫শে মার্চ ১৯৭১ সন।

পি তা

১.

গোবিন্দ্র চন্দ্র ভুলে গেছে কে তাকে প্রথম সংবাদ দিয়েছিল দেশে ফিরে আসার জন্য, হয়তো-বা সরকারি আহ্বানই হবে; তার উপর ভিটেমাটির জন্য আকর্ষণ তো তার অন্তরে প্রবল ছিল; আগপিছু কিছু না-ভেবে জীবনের একমাত্র সম্বল তার কিশোরী মেয়েটির হাত ধরে সীমান্ত অতিক্রম করে পা ফেলল বাংলাদেশে, একেবারে যেখানে শাখা-বরাকের ওপর সুপারি গাছের ভাঙা সাঁকোটি অদ্ভুতভাবে লকলক করছে সেখানে। গোবিন্দ্র চন্দ্রের পিঠে সের দশেক চাল আর হাঁড়ি-হুঁকোর পুঁটলি; একইসঙ্গে দড়িতে ঝোলানো গুটি কয়েক লুটা-বাটি টুনটান শব্দ ভাঙছে; আর ছেঁড়া কাপড়ের ভাঙা ঝুড়িটি নিয়ে যুতি এই স্তব্ধপ্রান্তরে হঠাৎ হঠাৎ ফোঁস ফোঁস করছে। যুতির দিকে চোখ ফিরিয়ে গোবিন্দ্র চন্দ্র বলল, 'কান্দিছ না মা, কান্দিছ না। জলদি করিয়া আয়।' যুতি কিছুই বলতে পারল না, শুধু দূর থেকে চিন্তাক্লিষ্ট চোখে তার বাবাকে দেখে নিচ্ছে। সে স্থির করতে পারছে না তার বাবার চলার ভঙ্গিতে কী কোনও গোপন অর্থ আছে। মনের মধ্যে ভেসে ওঠা কোনও এক বিষয়ের মীমাংসা করতে চাচ্ছে না কী! নিজের বাড়ি-ঘর সহায়-সম্পত্তি উদ্ধার করার প্রতিজ্ঞা নয়তো? এসবের উত্তর খুঁজে পাচ্ছে না যুতি, তাই হয়তো তার কপালে কুঞ্চিত রেখা ভেসে উঠেছে। পিতার চোখে দৃষ্টি পড়তেই যুতি তার চোখ-দুটো দ্রুতবেগে ফিরিয়ে নিল; তারপর নদীর জলের দিকে তাকিয়ে, ভাঙা ঝুড়িটি টেনে, ভারপিষ্ট ভঙ্গিতে সাঁকো অতিক্রম করতে লাগল। তার সমস্ত মুখ জুড়ে যেন দ্রুত ক্রিয়াশীল ছাপ ফুটে উঠেছে—অনিশ্চয়তা, আশঙ্কাজনিত একরকম অস্থিরতাই। তবে সূর্যের কোমল আলো তার কালো চুলকে চিকচিক করে তুলেছে; অবশ্য এতে সূর্যের কিরণের তেজ নেই, তাপও না, শুধু স্বচ্ছনির্মল নদীর মৃদুমন্দ তরঙ্গই যেন। তার পায়ের নিচে ঘোলাটে নদীর জলের ফেনার সঙ্গে যেমনি কচুরিপানাগুলো বন্ধুত্ব পেতেছে তেমনি তার চুলের সঙ্গে সূর্যের কোমল আলো মিতালি চলছে। চুলের ফাঁকে যুতির মুখটি একবার দেখে নিল গোবিন্দ্র চন্দ্র; খুবই অচেনা লাগছে তার কাছে; তার চোখে, যুতির দেহ যেন গলে পড়তে চাচ্ছে নদীতে। মেয়ের চলনভঙ্গি দেখে পিতার অন্তরে জমে উঠল বুকভাঙা কান্না, এই কান্না যেন অপরাজিতের গায়ে প্রজাপতি উড়ে বেড়ানোর মতো ঝিলিক দিয়ে বরফগলা নদীর মতো গড়িয়ে পড়তে চাচ্ছে তার গাল বেয়ে; কিন্তু পারছে কই! যুতির হাঁটার ভঙ্গি যেন কৃষকের মাথার ছেঁড়া ছাতা—বেছাদ, হতশ্রী, শীর্ণ। গোবিন্দ্র

চন্দ্র বলল, 'আয় মা, তাড়াতাড়ি পা চালা। সেন্ডেল আত[১] নিলেঐ অইত?' সঙ্গে সঙ্গে যুতি তার ক্লান্ত দেহকে শক্ত চাবুকের আঘাতে সজাগ করার চেষ্টা করল, তবুও তার চোখ-দুটোর ঝাপসা ভাবটি কাটাল না; তার শরীরও টলমল করে দোল খেতে লাগল এদিক-ওদিক। ভাঙা ঝুড়ি হাতে চেপে, সুপারি গাছের চিহ্নগুলোকে সেন্ডেলের ফিতার ফাঁকে আঙুল দিয়ে আঁচড়ে আঁচড়ে এগুতে লাগল যুতি। 'ঐ তো আইয়া গেছি মা। আর একটু পথ এরপর...।' গোবিন্দ্র চন্দ্রের কথাগুলো যেন পাখির পালকের মতো উড়ে গেল; বসন্তের হাওয়ায় নয়, গুমোট বাতাসে; তারপর টুপ করে জলের ভেতর ডুব দিল। বাক্য শেষ করতে পারল না গোবিন্দ্র চন্দ্র। দূর থেকে তার চোখ গিয়ে ঠেকাল অদ্যিকালের সাক্ষী, মান্ধাতার আমলের প্রহরী, বেঁচে থাকার একমাত্র ভরসা কালাচাঁন্দে—স্থিরচিত্রধারী সন্ন্যাসী বটগাছে। জটের ভার যেখানে এলোমেলো, ঠিক তারই নিচে নিঝুমভাবে দাঁড়িয়ে থাকতেন বাঁকাবাঁশিধারী কৃষ্ণ। আজ থেকে কয়েকমাস আগেও সেখানে পূজা দিত গ্রামের লোকজন। রাতভর এই কৃষ্ণকে নিয়ে কীর্তন চলত। উৎসুক চোখে সে আবার তাকাল; দূর থেকে কৃষ্ণমূর্তিটি আর চোখে পড়ে না। তার মুখ রক্তশূন্য, চোখ বিস্ফারিত, বাক স্তম্ভিত, কিন্তু দৃষ্টি স্থির। সেখান থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিল আরও উপরে, আকাশে—সেখানে মেঘ উড়ে বেড়াচ্ছে। তারপর আবারও ফিরে এল কালাচাঁন্দে, তখনই তার আচমকা মনে পড়ল হারিয়ে যাওয়া, মিলিয়ে যাওয়া, ফুরিয়ে যাওয়া যতসব মৃদুমন্দ স্মৃতি, সেসব এখনও বটজটের গুচ্ছে সযত্নে বাঁধা আছে। তার অন্তরে যেরকম আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে তা ভাষাতীত, তাই হয়তো তার চোখ বেয়ে হঠাৎ ছোটবড়ো অশ্রুফোঁটা ঝরতে লাগল; একসময় সাঁতারুর মতো সেগুলো ঝাঁপিয়ে পড়ল নদীতে; পড়েই ঝরে-পড়া পাতার মতো নিজের জাতপাত ভুলে জলকে লবণাক্ত করতে লাগল। এখনও তার কানে ভাসছে পাশের বাড়ির কেচকুচ ঢেঁকির শব্দ। ধানসিদ্ধ ম্‌ম্‌ গন্ধটিও নাকে লেপটে রয়েছে। চোখের সামনে ভেসে বেড়াচ্ছে সাবিত্রীর সিঁথির সিঁদুরও। বিকালে দাওয়ায় বসে যুতির চুলগুলোকে পরিপাটি করে আঁচড়ে দিত সাবিত্রী, আর মায়ের হাতে আটকা-পরা পাখির ছানার মতো ছটফট করত ঝি। মায়ে-ঝিয়ে সন্ধ্যারাতের কাজ সেরে গোবিন্দ্র চন্দ্রের জন্য অপেক্ষা করত। হাজার ক্ষিধে পেটের মধ্যে যুদ্ধ করলেও তারা খেত না। কিন্তু সেই রাত: সন্ধ্যাপূজা ঠিকই সেরেছিল সাবিত্রী, ঠাকুরসেবাও, কিন্তু গোবিন্দ্র চন্দ্র সময়মতো বাড়ি ফিরছে না বলেই কী মায়ে-ঝিয়ে ভয় পাচ্ছিল; না, নদীর চরে, দুপুরের আকাশে, যে লুব্ধ গৃধ্রের দল অধীর আগ্রহে উড়ছিল সেই

১. হাত।

দৃশ্য মনে পড়াতে; কে জানে, কে তাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিল দুপুরে; হয়তো কেউই না; জিঘাংসা-ঈর্ষা-দ্বেষ-লোলুপতার নিজস্ব গন্ধ আছে, সেই গন্ধ আগাম পেয়েই হয়তো গৃধ্রের দল আকাশে ভিড় জমিয়েছিল। আদিগন্ত অন্ধকারে আচ্ছন্ন শ্রীকৃষ্ণপুরের একটি ঘরে বুকের ব্যবধানে বসে থাকা মায়ে-ঝিয়ে নীরব, নিস্পন্দে কাঁপছিল। কীসের যেন প্রতীক্ষায় তারা, এমনকি গোয়ালের গরুগুলো পর্যন্ত লেজ নেড়ে মশা তাড়াতে ভয় পাচ্ছিল। হঠাৎ সবকিছু কেমন উলটেপালটে গেল। চারপাশে বুটজুতোর আওয়াজ। সৈন্যদের পদভারে কাঁপছে ধানক্ষেত। বাঁশবনে শেয়ালও ডাকতে সাহস পাচ্ছে না। যেখানে শেষ হয়েছে গ্রাম, আর শুরু হয়েছে মেঠোপথ, জমির আল, খালের শরীর সেখানে, ঝাউবেতের জঙ্গলে, কোনও প্রাণী 'রা' নেই। গোবিন্দ্র চন্দ্র একসময় বাড়ি ফিরল। সাবিত্রী ও যুতির সন্ধান না-পেয়ে সে ভয়ে, আতঙ্কে ছুটে গেল বাঁশবনে, সেখানে চাঁদের ক্ষীণ আলোও আত্মহত্যা করেছে, গৃধ্রের দল তাদের ডানা মেলে বিশাল আকাশকে যেন আড়াল করে রেখেছে। অনেক খোঁজাখুঁজির পরও সে সাবিত্রী ও যুতির সন্ধান পেল না, আপন মানুষগুলোর শরীরের গন্ধও না, তবে তার দেহের উৎকট ঘামের ঝাঁঝ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। ফাঁকা, শূন্য মস্তিষ্কে সে যন্ত্রচালিতের মতো পা-দুটো চালিয়ে দিল কালাচাঁন্দের দিকে। দূর থেকে দেখতে পেল, মন্দির ঘিরে ভিড় করেছে পাকিস্তানের গৃধ্রের দল। সেদিকে আর সে অগ্রসর হল না, বরং ঝাউবেতের জঙ্গলের দিকে পিছু হাঁটল। এই ঝাউবেতের জঙ্গল দিন-দুপুরেই সন্ধ্যার অন্ধকারের দখলে থাকে, আর রাতের বেলায় তো কথাই নেই; তবুও সে ঝাউবেতের ফাঁকে দেখতে পেল, দূরে, বেশ দূরে ভেসে বেড়াচ্ছে রাজাকারবাহিনীর মশাল, শয়তানের ত্রিশূল; বিদেশি সৈন্যগুলোকে পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলেছে চামচারা, তারাই বাংলা মায়ের বিষবৈরী সন্তান। ওরা বাংলা মায়ের মান-ইজ্জত ভুলে গিয়ে বিদেশির সম্মান রক্ষার্থে ব্যস্ত। প্রেত-সন্তানরা আকুল ভাবে বিদেশির উলঙ্গ দেহের উত্তাপ নেওয়ার জন্যে সুজনকে জীবন্ত কবরে পুঁতে ফেলার প্রতিজ্ঞায় বদ্ধপরিকর। সাবিত্রী ও যুতির সন্ধান পেলেই গোবিন্দ্র চন্দ্রের রক্ষা। কিন্তু পাচ্ছে কই! বুক বেয়ে একরকম উত্তাপ নেমে আসছে তার শরীরের জটিল শিরা-উপশিরা বেয়ে। সে এগিয়ে চলল। ঝাউবেত ভাঙছে। একসময় পৌঁছে গেল গ্রামের একমাত্র মলমুত্র বহনকারী খালটির পাশে। বুটজুতোর শব্দ দূর থেকে জঙ্গলের দিকেই অগ্রসর হচ্ছে। এর হাত থেকে বাঁচার জন্য সে টলমল মাথা নিয়ে খালে গলে পড়ল। তখনই মুত্রজল আর মল-কাদামাটি থেকে একটি হাত ওপরে উঠে এল। ফিসফিস শব্দে বলল, 'শুইয়া পড়, শুইয়া পড়।' নিজেদের প্রাণরক্ষার

জন্য এই বীভৎস, মলমুত্র ভরা খালটির ভেতর এমনভাবে শুয়ে আছে কয়েকটি প্রাণ, তাদের অস্তিত্ব বোঝাই কঠিন। চারদিকে চলছে রণ হুঙ্কার। সৈন্যরা মানুষ মারার উল্লাসে মত্ত। তাদের রক্তে যেন জেগে উঠেছে নিরীহ প্রাণী হত্যার উচ্ছ্বাস। ধানক্ষেতে দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে। মানুষ আর পশু পোড়া মাংসের গন্ধে শ্রীকৃষ্ণপুরের বাতাসও নিশ্চুপ। আগুন জ্বলে উঠেছে মন্দিরে। মন্দিরের আত্মা চষেই বেঁচে ছিল গ্রামের মানুষ। মন্দিরকে কেন্দ্র করেই ছিল তারা চঞ্চল, কর্মমুখর। মন্দির টিকে থাকা আর তাদের বেঁচে থাকার মর্মার্থ একসুরেই বাঁধা ছিল। কিন্তু আজ মন্দিরে আশ্রয় নিয়ে মানুষ রক্ষা পাচ্ছে না। মরছে, কয়লার মতো। চারদিকে চিৎকার। শীৎকার। মন্দিরের ঘণ্টায় জ্বলন্ত লেলিহান। আগুনের আঘাতে কেঁপে উঠছে বারবার। ঘণ্টার ধ্বনি ছড়িয়ে পড়ছে দূরে, বহু দূরে—আকাশে-বাতাসে; স্বর্গে-মর্তেও যেন। গোবিন্দ্র চন্দ্রের কানে ঘণ্টার আঘাত পৌঁছতে-না-পৌঁছতেই তার মন ছুটে বেড়াতে লাগল মহাভারতের মহাযুদ্ধের কাহিনীতে—অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও অদম্য যোদ্ধা অর্জুন আত্মীয়দের দুঃখ ও হত্যালীলা সম্পর্কে নিস্পৃহ থাকতে চাইলেও কৃষ্ণ কিন্তু মহাযুদ্ধের পক্ষেই ছিলেন। তিনি তো দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালনের জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন! তিনি ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে, অর্জুনের মতের বিরুদ্ধে, আপনজনকে হত্যা করার জন্য, মহাধর্মযুদ্ধ শুরু করেছিলেন! গোবিন্দ্র চন্দ্র বুঝে উঠতে পারছে না, বিপুল সংখ্যক মানুষ হত্যা করে কীভাবে মঙ্গল সাধিত হয়। তার মন যখন যুদ্ধের যৌক্তিকতা নিয়ে ব্যস্ত তখন এই খালেই ভয়ে সাবিত্রীর অন্তর পাগলপ্রায়। পোড়া মাটির মতো সে ভয়ে কাতর। তার মুখ ভেঙে পড়েছে যুতির দেহে। মেয়েকে রক্ষা করার এক কঠিন ব্রতেই যেন সে কাতর। আর যুতি এই বিভীষিকাময় পরিবেশ থেকে নিজেকে নিস্তার দিতে তারা-নক্ষত্রহীন আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল। দেখতে পেল, আকাশের নিচে গৃধ্রের পালকের মতো বারুদ-পোড়া পাতলা সরের ভেলা ভেসে বেড়াচ্ছে; আর তার উপর ঝুলন্ত আকাশে মেঘে ও আগুনের খেলা চলছে। দাউদাউ করে জ্বলে ওঠা আগুন ঢেকে নিচ্ছে মেঘ। একসময় ঝিঁঝিপোকার শব্দ থেমে গেল; চিৎকারও। তবে কালাচাঁন্দের পাশ থেকে কয়েকটি কণ্ঠ ভেসে আসতে লাগল, 'কালাচাঁন্দ অঞ্চল এখন শ্মশানঘাট', 'কৃষ্ণ তুমি কই গেলারে', 'বৃন্দাবনে! হা, হা', 'রাধা মন্থনে ব্যস্ত বুঝি!' হঠাৎ একজন বলে উঠল, 'খালে?' একদিকে ঝাউবেতের জঙ্গলের নাভিমূল ফেটে বেরিয়ে আসতে লাগল গভীর অভিমান, আর অন্যদিকে জঙ্গল কাঁপিয়ে ছুটে চলল রক্তলুলোপ বাঘের মতো লাফ দিয়ে দিয়ে বুটের আওয়াজ। খালের ভেতর থাকা প্রাণীগুলো আঁতকে উঠল। এ কী

যমের শব্দ! এখন কি হবে? তাদের দমবন্ধ অবস্থা। নিশ্চল-নিথর প্রাণগুলো তাদের বাঁচার আশায় নিঃশব্দে মাটি-জল-জঙ্গল আঁকড়ে লাশের মতো কবরের গাঢ় অন্ধকার খুঁজতে লাগল। তাদের অন্তরের পুরোটা জায়গা জুড়ে যেন হিংস্র শকুনের নখের আঁচড়ে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। তাদের হৃদয়ের তাজা ঘাসগুলো যেন রক্ত জমে কালো হয়ে উঠেছে। তাদের মাথা জুড়ে একের-পর-এক প্রশ্ন : জীবনের গতি কি? কাকে, কখন, কোথায় মরতে হবে তা ঘুণাক্ষরে কি কেউ টের পায়? হঠাৎ একজন বলে উঠল, 'গুয়ের মাঝে কে যাইব? তার ওপর বেতকাঁটা। জাত বইলা একটা কথা আছে না।' আগুনের চাদর ছিঁড়ে হঠাৎ বুটের আওয়াজ থেমে গেল। গ্রামের ভাঙা রাস্তা দিয়ে জিপ-গাড়িটি এগিয়ে চলল তীব্র আলোর সন্ধানী দৃষ্টি ফেলতে ফেলতে। মানুষ পুড়িয়ে, খুন করে, খুশিতে ডগমগ হয়ে প্রেত-সন্তানরা ঘরে ফিরতে লাগল। মন্দিরের ঘণ্টার ঢং...ঢং...ঢং... থেমে গেছে একটু আগেই, তবে থেমে যাওয়ার আগে বলে গেছে, সম্মুখে সমর অনন্ত বাঙালিকে অসাধারণ ভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে আগামী দিনের জন্য।

২.

যুতি ভাঙা ঝুড়ি নিয়ে, সাঁকো পেরিয়ে, তার পিতার সামনে এসে ধপাস করে মাটিতে বসে পড়ল। তেড়ে আসা বাতাসে পিতার লুঙ্গি পত্‌পত্‌ করে উড়ছে, লুটা-বাটি টুনটান শব্দ তুলছে, একইসঙ্গে পিতার বুক হু-হু করছে, চোখ দিয়ে বয়ে চলেছে অবরুদ্ধ যন্ত্রণার স্রোত, যুদ্ধ-ধ্বংস-যন্ত্রণা অনুচ্চারিত শব্দগুলো কানে প্রতিধ্বনি তুলছে। যুতি তার চঞ্চল দৃষ্টিতে অন্বেষণ করে চলল হাঁড়ি-হুঁকোর পুঁটলি বহনকারী পিতাকে, বিস্ময় জাগা, বেদনায় বিধুর হওয়া মুখটিও। এই মুখ তাকে যন্ত্রণাবিধ করল, যে যন্ত্রণা তার কাছে অসহ্য, তাই গভীর নিশ্বাস ফেলে, ব্যথিত কণ্ঠে বলল, 'বাবা তুমি কানতাছ?' পিঠে ঝুলে থাকা সের দশেক চালের পুঁটলির মতোই পিতা নিশ্চুপ। তার শরীর, আত্মা, হৃদয় জুড়ে শুধুই ক্লান্তি; তবে তার ক্লান্তিময় মগজ জুড়ে একের-পর-এক প্রশ্ন : পাকিস্তানি সৈন্য দ্বারা প্রজ্বলিত আগুনে এতগুলো নিরীহ প্রাণ কেন বিনা অপরাধে অগ্নিলুব্ধ পতঙ্গের মতো দগ্ধ হল? তাদের জীবনের মূল্য কী পাকিস্তানের কর্তাব্যক্তিদের চেয়ে ন্যূন ছিল? এ-কেমন ষড়যন্ত্র? যুতির দিকে রহস্যময় দৃষ্টিতে গোবিন্দ্র চন্দ্র পিছন ফিরে তাকিয়ে বলল, 'কুছতা না।' কেন এই ছলনা? কী আত্মপ্রবঞ্চনা! 'কুছতা না' শব্দ-দুটো বড়ই পীড়াদায়ক। গুমোট হয়ে গেল শ্রীকৃষ্ণপুরের আকাশ। পিতা একটু ম্লান হেসে, বিষণ্ণ স্বরে যোগ করল, 'তুই টিক আছছ?' ভাঙা ঝুড়িসহ যুতি শক্ত হাতে তার পিতাকে জড়িয়ে

ধরল, যেন তার মনের শিলাপটে জেগে উঠেছে সেই রাতের কথা। সে অনেক চেষ্টা করেও, এই মুহূর্তে, সেই রাতের কথা ভুলতে পারছে না, তাই হয়তো ভ্রুকুঞ্চিত করে বলল, 'ডর লাগতাছে।' সঙ্গে সঙ্গে পিতার স্নেহ-জড়ানো আহ্লাদী-কণ্ঠে প্রকাশ পেল, 'ডর লাগার কোনঅ কারণ নাই-রে মা। আমি অখনও বাঁইচা আছি।' পিতার কথায় যুতি আশ্বস্ত হল, ক্ষণিকের জন্য হলেও তার মনের ভয় শ্রীকৃষ্ণপুরের মাটির নিচে বন্দী হয়ে গেল; তাই হয়তো সে প্রসন্ন আঁখিতে দেখতে লাগল ছেড়ে যাওয়া গ্রামটি। গোবিন্দ্র চন্দ্র সেই প্রসন্ন আঁখির দিকে তাকিয়ে এবং তার মাথায় আঁকাবাঁকা গাঁট-ওঠা আঙুল বুলিয়ে বলল, 'কুছতা খাইবে।' যুতি জানতে চাইল, 'কিতা আছে!' দুদিনের যাত্রাপথে ভাত কিংবা ঝাল তাদের মুখে ওঠেনি; চাইলে হয়তো-বা চলার পথে পুঁটলি থেকে কিছুটা চাল সিদ্ধ করে নিতে পারত বা কোনও এক বাড়িতে ডাল-ভাতের সন্ধান করতে পারত, কিন্তু করেনি; তাই কলা-খই-বিস্কুট-বাতাসায় তাদের সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। বাড়িতে না-পৌঁছানো পর্যন্ত ভাতের সঙ্গে তারা সম্পর্ক তৈরি করতে চায় না; যদিও যুতির মন গরম ভাতের আঠালো ভিজে গন্ধ পাওয়ার জন্য মাতোয়ারা; তবে তার একটিই ইচ্ছে, কতক্ষণে বাড়ি পৌঁছোবে। গ্রামের পথে পিতা ও কন্যার নিশ্বাস-পতনের শব্দ এবং লুটা-বাটির টুনটান আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই যেন শোনা যাচ্ছে না। গোবিন্দ্র চন্দ্র তার পিঠের পুঁটলিটি মাটিতে রেখে একটি ঠোঙ্গা বের করে এগিয়ে দিল যুতির দিকে। ঠোঙ্গাটি তুলে নিতেই যুতির মনে পড়ে গেল তার মায়ের কথা, মা'ই তো তাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য বাবাকে নিয়ে দেশ পাড়ি দিয়েছিল। ঠোঙ্গা থেকে তুলে-নেওয়া বাতাসাটি শেষ করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। আজ তার পিতা তার মায়ের মতোই তাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য বাংলাদেশে ফিরে এসেছে। যুতি আরেকটি বাতাসা মুখে তুলে নিয়ে ঠোঙ্গাটি তার পিতার দিকে এগিয়ে দিল। বাতাসার গন্ধে বাতাস যেন গাঢ় ও মন্থর হয়ে গেছে। বাতাসা কেনার সুবাদে প্রাপ্ত ঠোঙ্গাটি কড়মড় শব্দে ভাঁজ করে পূবালি গাঢ় ও মন্থর পবনে উড়িয়ে দিল। এতে বাপ ও মেয়ের একাকী পথ-চলার শূন্যতা কিছুটা হলেও আনন্দদায়ক হয়ে উঠল। গোবিন্দ্র চন্দ্র তার তেলমাখা ও রঙজ্বলা গামছায় হাত মুছতে মুছতে বলল, 'আয় অখন উঠি। বাপ ঠাকুরদা'র ভিটর সন্ধান তো করন লাগব।' পিতার মুখে যেন ফুটে উঠেছে সোনালি ধানের ঝিলিক। পিতার কথায় যুতি উৎসাহী হয়ে উঠল, গরম ভাতের আঠালো ভিজে গন্ধটি যেন তার নাকে ধাক্কা খেতে লাগল; সঙ্গে সঙ্গে সে তার মুখে তুলে নেওয়া বাতাসার অর্ধেকটা শেষ করে, বাকি অর্ধেকটা আঁচলে বেঁধে, উৎকীর্ণ হয়ে পিতার সঙ্গে হাঁটা শুরু করল। বৃষ্টিহীন গ্রামটি যুতির কাছে

স্যাঁতস্যাঁতে মনে হচ্ছে। নদীর কূল থেকে ভেসে আসা বিশ্রী মানুষ-পচা গন্ধ তার নাকে এসে ধাক্কা খেলেও সেকথা সে তার পিতার কাছে প্রকাশ করতে পারল না। তার পিতা এমন দাপটে হাঁটছে যেন সে তার পিতৃভিটেতে গিয়েই, প্রয়োজন হলে, জীবনের সর্বশেষ নিশ্বাসটুকু ফেলবে। পিতার সঙ্গে তাল সামলাতেই যুতির প্রাণ যেন বেরিয়ে যাচ্ছে।

৩.

বটগাছের পাতায় আচমকা শিহরণ জাগল। গুঁড়ি থেকে শ্রীকৃষ্ণপুরের মানুষের ঘনকালো রক্তের দাগ এখনও মুছে যায়নি। হঠাৎ থমকে দাঁড়াল তারা। বাতাস, জলতরঙ্গ—সবকিছুই যেন থেমে গেছে। চমকে উঠল গোবিন্দ্র চন্দ্র। তার চাঞ্চল্য যুতির নজর এড়াল না, সে তার পিতার বাঁ-হাতটি খপ করে ধরে সচকিত হয়ে লক্ষ্য করল হিন্দু গাঁয়ের কোনও চিহ্ন নেই, উলুধ্বনি শোনার তো কোনও কথাই নেই। তার বুক কাঁপতে লাগল। হৃৎপিণ্ডটি গলাকাটা মোরগের মতো ধড়ফড় করতে লাগল। পিতার হাত ধরে যুতি গাঁয়ের পথে নেমে অনুভব করল, তার আত্মার ভেতর কেমন যেন শীতের প্রবাহ বইতে শুরু করেছে। ঘাড় ফিরিয়ে বিস্মিত চোখে দেখল পিতা অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার পিতৃভিটের দিকে। যুতির গোটা অস্তিত্ব জুড়ে সৃষ্টি হয়েছে যতিহীন বিহ্বলতা, কিন্তু পিতাকে তা স্পর্শ করতে পারছে না, আদৌ; বরং সে স্থির দৃষ্টিতে এগিয়ে চলেছে তার পিতৃভিটের সন্ধানে। ভাঙাচোরা ঘরবাড়ি—কয়েকটি ধ্বসে গেছে, কয়েকটির চাল উড়ে গেছে, কয়েকটির বেড়া নেই, কয়েকটির কেবলই খুঁটি। একটি ঘরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে চিরচেনা কিন্তু গুড়ি পোড়া নারিকেল গাছটি। উঠোন ও ভিটে ছাইয়ে একাকার; পথের চিহ্নটুকুও মুছে গেছে। গোবিন্দ্র চন্দ্র নিজের ভিটে চিনতে পারছে না। সে পথের মধ্যেই বসে পড়ল। লুটা-বাটির টুনটান শব্দও থেমে গেল। শুধু মরা গাছের ঝিরঝির হওয়া তার চোখেমুখে ধাক্কা খাচ্ছে। গোবিন্দ্র চন্দ্র সের দশেক চালের পুঁটলিটি খুলে একটি চাদর বের করে আনল। চাদরটি গায়ে জড়িয়ে মাথা পর্যন্ত তুলে নিতেই অপ্রত্যাশিতভাবে তার চোখের পাতায় ভেসে উঠল সৈয়দ বরকত উল্লার স্মৃতি। শীতের সকাল। তার বন্ধু তাকে জড়িয়ে বলল, 'শীতর দিন গরম কাপড় পড়িয়া থাকবা, বয়স হইছে, শরীর ঠিক রাখন লাগব।' তারই ছেলে, গোবিন্দ্র চন্দ্র শোনেছিল, যুদ্ধ চলাকালীন সময়ের এক গভীর রাতে এসেছিল মাতৃদর্শনে। রুগ্ন মা। শয্যার পাশে ছেলে কখন আসবে তা জেনে নিয়েছিল চতুর তাজিদুল্লা। সে একা এসে সৈয়দ বরকত উল্লার ছেলের সামনে দাঁড়াতে সাহস পায়নি, তাই

কুকুরদৌড়ে পৌঁছে গিয়েছিল শাহবাজপুর পাকিস্তানি সেনা-শিবিরে। ফিরে এসেছিল রাজাকার[২], আল-বদর[৩], আল-শামস[৪]-এর সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে, সশস্ত্র পাঠানসেনাও চারজন। পুব-পুকুরের পুব-পাড়ে উর্দিপরা চারটি সেপাইকে উর্দুতে ও হাতের ইশারায় দিশা বাতিয়ে রাজাকার তাজিদুল্লা মিশে গেল ভোরের আলো-আঁধারে আচ্ছন্ন নদীর তীরে। এদিকে বর্বর সৈন্যের আগমন টের পেয়ে, অতি সন্তর্পণে, কিন্তু দৃঢ় পদক্ষেপে, সৈয়দ বরকতের ছেলে তার শায়িত মাকে কদমবুচি করে, দু-ফোঁটা অশ্রু ফেলে, মুক্তিবাহিনীর মরণবরণপণ মন্ত্র 'জয় বাংলা' স্মরণ করে, গোয়াল থেকে লাঙল কাঁধে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। সে মুহূর্তে ক্ষিপ্ত চারজন পাঠানসেনার একজন ভুল করে তাকে বলল, 'তেরা লারকা আন্দর হ্যায়?' 'জি।' ছেলেটি হাতের ইশারায় মূলঘরের দিকে ইঙ্গিত করল। খড়বুদ্ধি পাকিস্তানি নৃশংসরা উঠোন পেরিয়ে উঠে এল বারান্দায়। দুজন দু-দোয়ারে দাঁড়াল সঙিন উঁচিয়ে, বাকি দুজন ভেজানো দরজা ঠেলে মূলঘরে ঢুকে সারা ঘর তছনছ করতে লাগল। তারা ছেলের কোনও পাত্তা পেল না, তাই রুগ্ন মায়ের ঘরে দাঁড়িয়ে শুরু করল তর্জন গর্জন। সৈয়দ বরকত উল্লা বারবার মিনতি ভরা চোখে, কম্পিত কলেবরে জানাল যে, অবাধ্য ছেলের কার্যকলাপ সম্বন্ধে সে অবহিত নয়। নরাধমরা তাকে নাস্তানাবুদ করেও যখন তার ছেলের কোনও সন্ধান পেল না তখন তাকে শিকলে বেঁধে নিয়ে এল ক্যাম্পে। শুরু হল তার উপর নির্যাতন। একসময় সেনা-শিবিরের পাশে, বটগাছের একটি শাখায় রশি বেঁধে তাকে ঝুলিয়ে দিল। এই দৃশ্য দেখে কয়েকটি কাক দীর্ঘনিশ্বাসের পাল উড়িয়ে সেনা-শিবিরের চারপাশে প্রতিবাদ করতে লাগল। সৈয়দ বরকত উল্লার পা-দুটো ছিল আকাশ-পানে আর জমিন-পানে তার মাথা, গরুর জিভের মতো বেরিয়ে-পড়া মুখে প্রকাশ পাচ্ছিল মরণত্রাণকামনার বীভৎস চিত্রটি। শুধু তার

২. ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে রাজাকার বাহিনী গঠিত হলে ইসলামি ছাত্র সংঘের জেলা প্রধানরা নিজ নিজ জেলার রাজাকার বাহিনীর প্রধান হিশেবে নিযুক্ত হয়; এর সদস্য সংখ্যা ছিল প্রায় পঞ্চাশ হাজার।

৩. ২২শে এপ্রিল ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে আল-বদর বাহিনী গঠিত হলে বাংলাদেশের ইসলামী ছাত্র সংঘের শাখাগুলোকে আল-বদর বাহিনীতে সংগঠিত করা হয়; এর সদস্য সংখ্যা ছিল প্রায় দশ হাজার।

৪. বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন বাংলাদেশে বসবাসকারী বিহারি ও অন্যান্য অ-বাঙালিকে নিয়ে গঠিত হয় আল-শামস বাহিনী; এর সদস্য সংখ্যা ছিল প্রায় আড়াই হাজার।

অপরাধ একটিই ছিল সে তার ছেলেকে মুক্তিবাহিনীতে[৫] যোগ দিতে বাধা দেয়নি।

৪.

যুতির হাত ধরে গোবিন্দ্র চন্দ্র এগিয়ে চলল তার পিতৃভিটের সন্ধানে। আবারও শুরু হল লুটা-বাটির টুনটান। বাড়ির সীমানায় ভেরেণ্ডা গাছের ক্ষতবিক্ষত বেড়া। তারা এগিয়ে চলল। কারণে-অকারণে যুতি যখন পা বা হাত কাটত তখন সাবিত্রী ভেরেণ্ডার কষ ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিত, গাছপালার গুণাগুণ সম্পর্কে তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল। গোবিন্দ্র চন্দ্রের দৃষ্টি ক্ষতবিক্ষত ভেরেণ্ডা গাছের দিকেই। আর তার মন জুড়ে ভেসে বেড়াচ্ছে সাবিত্রীর ছবিটি। ইয়াহিয়া সরকারের সেনাবাহিনীর নির্মম অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে বাংলাদেশের মানুষ—শোকাতুর আত্মীয়স্বজন, ধর্ষিতার ভীত মর্মাহত পরিবার-পরিজন—প্রতিদিন দলে দলে সীমান্ত অতিক্রম করে জমা হচ্ছিল ভারতে; নির্দোষ গোবিন্দ্র চন্দ্রও তার স্ত্রী ও কন্যাকে নিয়ে প্রাণের ভয়ে প্রথমে পালিয়ে বেড়ায় গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, তারপর বনজঙ্গলে, অবশেষে স্বদেশে আত্মগোপন করা যখন অসম্ভব হয়ে ওঠে তখন অনিদ্রায়-অনাহারে কালাজ্বরের রোগীর মতো দেহকে টানতে টানতে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতে। এখানে পৌঁছেই তার চোখে ধরা পড়ে ভিজে ঘাসের ওপর বসা একটি কিশোরীকে। তারপর পেট বেরিয়ে পড়া একটি শিশুকে। শিশুটির পাটশলার মতো পা-দুটো ফুলে যেন কলাগাছ, বাহুগুলো পুরুষের আঙুলের চেয়েও সরু। শুকনো ভাত দুটো মুখে দেওয়ার জন্য অনেকক্ষণ ধরে কিশোরীটি শিশুকে সাধাসাধি করছে; অবশেষে মুখে নিল, কিছুক্ষণ পর আবার সবকিছু উগলে ফেলে দিল; তার প্রাণও বেরিয়ে আসতে সময় নিল না। অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে, শরণার্থীশিবিরে কলেরা মহামারী রূপে অকালেই আঘাত হানে। হঠাৎ করে লাখ লাখ মানুষ যদি স্বদেশীয় প্রেত-সন্তানদের অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য চলে আসে পার্শ্ববর্তী দেশে তখন সে-দেশের প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় স্বাস্থ্য, খাদ্য, বাসস্থান, স্যানিটেশন; আর তা তাৎক্ষণিকভাবে মোকাবিলা করা কোনও রাষ্ট্রের পক্ষেই সম্ভব না। বাঙালিরা

৫. আগস্ট ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে, মুক্তিবাহিনী সংগঠিত হয় সমগ্র বাংলাদেশ জুড়ে গেরিলা ও নিয়মিত পদ্ধতিতে পাকিস্তান সমর-বাহিনীর বিরুদ্ধে শসস্ত্র আক্রমণ চালানোর জন্য। নভেম্বর ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের দ্বিতীয় সপ্তাহে বাংলাদেশের ৯০% অঞ্চল মুক্তিবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে মুক্তিবাহিনী বাংলাদেশকে মুক্ত করে।

তাদের স্বদেশে কালান্তক ইয়াহিয়া-বাহিনী ও তাদের দেমড়া রাজাকার-বাহিনীর হাত থেকে অব্যাহতি পেলেও অনাহার ক্লিষ্ট মানুষের ভিড়ে ভারতের শরণার্থীশিবিরের ভিন্ন ধরনের সমস্যা থেকে রক্ষা পায় না, পাওয়াও কঠিন। বাংলাদেশে পাকিস্তানি জল্লাদের শাসনে মৃত্যু আসে রুদ্র বেশে কালাপাহাড় আকৃতিতে, আর সীমান্ত পেরিয়ে শরণার্থীশিবিরে আসে বন্ধু বেশে, শ্যামসম ফেরেশতা রূপে, এই যা পার্থক্য। এ থেকে গোবিন্দ্র চন্দ্রের স্ত্রী, যুতির জননী, সাবিত্রীকে রক্ষা করা যায়নি; শোভাকেও না। গোবিন্দ্র চন্দ্র শুনেছিল শোভা ছিল একজন বীরাঙ্গনা; ত্যাগ ও তিতিক্ষায় যার খ্যাতি। একদিন, শোভা চলে এল সুরমা নদীর তীরে, পাঞ্জাবি কর্নেলের তাঁবুর পাশে, স্বচ্ছজলে অবগাহন করার উদ্দেশ্যে। সিক্ত শাড়ির পরতে পরতে চন্দ্ররশ্মির প্রতিফলনে শোভার দেহে যেন সুষমা ঝিলিক দিচ্ছিল জোনাকির মতো। এই রূপের বাহারে কামুক কর্নেলের মনের গোপন বাসনা সৃষ্টি হল। আর এই বাসনা প্রকাশ করতে এগিয়ে গেল সুরমার জলে। ছলনাময়ী শোভা সুকৌশলে ছেড়ে দিল তার শাড়ি সুরমার স্রোতে, তবে ছোট্ট একটি অস্ত্র গোপনে সম্বল করে নিতে ভুলল না। তারপর সে ছুঁড়ে দিল কর্নেলের প্রতি উর্বশী হাসির বাণ, সঙ্গে সঙ্গে বিঁধে গেল কর্নেলের কামুক প্রাণ। কর্নেল মনে মনে 'তব চরণে ঠাঁই চায় মম পরাণ' বলতে বলতে তার জামাকাপড় ছেড়ে জলে নেমে নিজেকে নিবেদন করল শোভার কাছে। স্মিত মুখে শোভা তার নূপুরহীন পদযুগল পাঞ্জাবির প্রশস্ত কাঁধে স্থাপন করল; আর কর্নেল অমৃত জ্ঞানে শোভার নাভী নির্বাণসৃত জল পান করতে লাগল। কর্নেলের ক্রীতদাস সদৃশ্য ব্যবহারে শোভার অন্তরে ক্রোধের পরিবর্তে দেখা দিল কৃপা। অত্যাচারিত বঙ্গনারীদের পক্ষ থেকে প্রতিশোধ নিতে এসে, কর্নেলের ব্যস্ত-ব্যাকুল ক্রীতদাস-সেবায় শোভা তার সংকল্প থেকে বিচ্যুত হল। তাই কর্নেলকে তীরে ফিরে যেতে অনুরোধ জানাল, কিন্তু কর্নেল গণ্ডারের মতো হিংস্র হয়ে রুখে দাঁড়াল। ক্ষুধার্ত কুকুরের মতো কর্নেলের নির্লজ্জ কর্মকাণ্ড দেখে শোভা লজ্জা পেল। সে মনে মনে বলল, যে-মানুষ লাজনম্র লালিমার প্রতি সম্মান দেখানোর মতো মনোভাব নিয়ে জন্মায়নি, শিক্ষাও গ্রহণ করেনি, তার কাছে কিন্নর[৬]-সুলভ কদর্যতা ছাড়া আর কী-বা আশা করা যায়! শোভা শত চেষ্টা করেও কর্নেলকে দূরে সরাতে পারল না। নির্লিপ্ত করতেও পারল না। অবশেষে, ষাঁড়ের মতো ব্যবহারের অসাড়তা সহ্য করতে অক্ষম হয়ে শোভা তার সর্বশেষ অস্ত্রটি প্রয়োগ করল। পরদিন, নদীগর্ভ থেকে কর্নেলের লাশ উঠিয়ে,

৬. ঘোড়ার মতো মুখ ও মানুষের মতো দেহবিশিষ্ট দেবলোকের প্রাণীজাতিবিশেষ।

শত-লাশের সঙ্গে, ইতিহাসের কুখ্যাত হত্যাকাণ্ডের লীলাভূমি লাহোরে পাঠিয়ে দেওয়া হল। আর শোভার আশ্রয় হল ভারতের এই শরণার্থীশিবিরে। সাবিত্রীর সঙ্গে শোভার দেহটিও গোবিন্দ্র চন্দ্র গঙ্গায় ভাসিয়ে দিল। তারপর অর্ধধ্বংস পুল, ভাঙা রাস্তাঘাট, শস্যহীন ক্ষেতমাঠ, মানুষহীন বসতবসতি, আধপোড়া বেড়াখুঁটি, ধ্বংস স্তূপে পরিণত গ্রামের-পর-গ্রাম—পাকহানাদার বাহিনীর নির্যাতনের নিদর্শন—অতিক্রম করে গোবিন্দ্র চন্দ্র তার মেয়েকে নিয়ে পৌঁছে গেল নিজ-গ্রামে, পিতৃভিটের সন্ধানে। পিতৃভিটের সামনে দাঁড়িয়ে গোবিন্দ্র চন্দ্র যখন সন্ধান পেল শ্মশান সদৃশ ভয়াবহ নির্জনতার তখন স্তব্ধ হয়ে গেল। নিস্তব্ধ পিতার পাশে দাঁড়িয়ে যুতিও দেখতে পেল, শুধু কয়েকটি খুঁটি তার পূর্বপুরুষের ভিটের সাক্ষী হিশেবে দাঁড়িয়ে রয়েছে, বাকি সবকিছু যেন মাটির স্তূপ, ছাইয়ের জঙ্গল। যুতি তার পিতার চাদরের খুট ধরে বলল, 'আমরার ঘর কুনটা বাবা?' পিতা নিশ্চুপ। দু-হাতে মুখ ঢেকে চিৎকার করে উঠল যুতি। তার আর্তনাদে নির্লিপ্ত বিধাতার অন্তঃকরণে করুণার উদ্রেক হল কিনা তা জানার আগেই গোবিন্দ্র চন্দ্রের কর্ণ বিদীর্ণ করে চলল যুতির বুকফাটা কান্না। ক্ষোভে, দুঃখে, অন্তঃগ্লানিতে দিশেহারা পিতা দৌড়ে গেল তার পিতৃভিটের দিকে, একইসঙ্গে তার কণ্ঠে ধ্বনিত হতে লাগল, 'ইতারেই কিতা স্বাধীনতা কয়?' কেঁপে উঠল বাংলার বিষণ্ন বাতাস; প্রকৃতি রোষবিষ্ট, উষ্মান্বিত যেন; একচমকে শতাব্দীসুপ্ত ভীতু পিতার শরীরে শক্তি সঞ্চয় হল, সঙ্গে সঙ্গে তার মনে জেগে উঠল এক নতুন স্পৃহা—সন্তানকে রক্ষা করা যেমনি তারই কর্তব্য ঠিক তেমনি স্বাধীনতা রক্ষা করা তার মতো পিতারই দায়িত্ব।

নে শা

বেসিনের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা এরকম যুবকের সন্ধান সাধারণত বাঙালি বাড়িতে মিলে না। সে এ-বাড়িতে ভাড়া পেয়েছিল তার বরাত জোরে; এখানে বেশিরভাগ ভাড়াটেরা অল্প ভাড়ায় বসে আছে, কেউই নড়তে চায় না, নড়ানো সম্ভবও নয়। আচমকা এখান থেকে একজন ভাড়াটে চলে গেল; আর তখনই যুবকটি বাড়ির মালিককে বলল, 'একটি ঘর দেবেন আমি থাকব?' মালিক বললেন, 'একটাই সমস্যা, খাবারঘরে থাকতে হবে, শেয়ারে।' সে আপত্তি করেনি, সে-থেকে অভিষেকের সঙ্গে খাবারঘরে জাবেদের আশ্রয় হয়, কিন্তু মুশকিল হচ্ছে—বিলাতি রাতের অন্ধকার ভেদ করে কাজ-ফেরৎ লোকগুলো তাদের খাটের চারদিকে ঘুরে বেড়ায়, এটি-ওটি নাড়ে, ভারি পায়ে শব্দ তুলে, সারাদিনের উপচে পড়া কিছু গল্পের ভগ্নাংশ একে অপরকে শোনায়। শীতের বিছানায় কম্বলের নিচে যুবক-দুটোর রক্তে তখনই চলে এ-বাড়ির মানুষগুলোর বিরুদ্ধে ঘুমন্ত প্রতিবাদ, তুষের আগুন যেন। মনে হয়, সকলই তাদের উত্যক্ত করতে সবসময় প্রস্তুত; তাই একরাতে ফিসফিস করে জাবেদ বলল, 'আমাদের বিরক্ত করা কী তাদের উচিত!' অভিষেক বলল, 'ইচ্ছে করে তো আর করছেন না।' ওরা নিস্পন্দ এতিমের মতো নীরব থেকে কান সজাগ রাখে, সবই শুনে, আর ভাবে, আমাদের তো সংসার নেই, নারী নেই, বাচ্চা নেই, এ-বাড়ির অন্য মানুষগুলোর মতো দুশ্চিন্তাও নেই। জাবেদের সঙ্গে এ-বাড়ির বিবাহিত পুরুষগুলোর অল্পই পরিচয়, এ-সত্ত্বেও কিছুটা হলেও তারা তাকে নিয়ে চিন্তিত; একজন তো বলেই ফেললেন, 'তোমার মতো ব্যাচেলর যুবকের পাখির ছানার মতো নীড়ের ভরসা নেই, নিরাপত্তা তো নেই-ই।' উত্তরে জাবেদ বলল, 'আমি নারীর প্রতি সম্মান রেখেই তাদের সঙ্গে নিরাপদ দূরত্বে চলি। আর সেজন্যই আমার নীড়ের ভরসা ও নিরাপত্তা দুটোই আছে। কিন্তু আপনারা, বিবাহিত পুরুষরা ভুলে যান, আপনাদের থেকেও নেই। শুধু এই বিদেশবিভূঁই জীবনে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা বাঙালিকে নিয়ে একটি নিকেতন তৈরির ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।' এখানে পুরুষগুলো রাঁধে, সকালের চা-নাস্তা করে দেওয়ার জন্য কাজের লোকের প্রয়োজন পড়ে না, সবই নিজেরা করে; তবুও মেঘযুক্ত আকাশের মতোই আবছা, স্যাঁতস্যাঁতে একটি নিঃসঙ্গভাব বাড়ির দেওয়ালে নকশি কাটে। রাত যখন ঘনীভূত হয় তখন আস্তেধীরে এই নিকেতনের লোকগুলো অন্ধকারের পাখা ধরে নিজ নিজ ঘরে আশ্রয় খুঁজে। ঘুম থেকে উঠেই আবার যার যার কাজে ছুটে। আজ সকালেও তারা ছুটেছে, শুধু বেসিনের সামনে

দাঁড়িয়ে জাবেদ অল্পজলে হাত ডুবিয়ে সাবান পরিষ্কার করছে, আর বারকয়েক আয়নার মধ্য দিয়ে নিজেকে দেখে নিচ্ছে; এতবার দেখার পরও যেন তৃপ্তি পাচ্ছে না। তার দৃষ্টি যতই আনন্দদায়ক ততই সকরুণ, নবীন পাতার আশ্চর্য আকর্ষণ যেমনি আছে তেমনি তেঁতুল পাতার চিরল ছায়াও, তবে সরষের হলুদ স্নিগ্ধ-ধরা নেশার এবং অবশ-হওয়া ঝিঙেলতা ও সন্ধ্যা-নদীর নীরব মিলাতির সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। ওর দৃষ্টি যেন আখের রসের মতো গড়িয়ে পড়ছে ঠোঁটে, মুখে; তবে তার নিরীহ ভাবটি শেভিংক্রিমের মাঝে সগর্বে আত্মপ্রকাশ করতে ভুলছে না। ওকে দেখলেই মনে হয় সে অত্যন্ত নিরীহ প্রকৃতির মানুষ; মাংসপেশিতে পাকামি নেই, অহঙ্কার তো নেই-ই। ওর গড়নে শুধু কয়েকটি প্রবল যৌনোদ্দীপক রেখার রাজত্ব চলছে। বেসিনের উপর রাখা বাটিতে সাবানের গায়ে শুয়ে থাকা সাবান-লাগানো ব্রাশটির ওপর থেকে চোখ সরিয়ে জাবেদ আবার শেভিংয়ে মনোনিবেশ করল; টেপ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা করে জল গড়াচ্ছে। তার গায়ের রঙ সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছুই বলা সম্ভব নয়, মাঝে মাঝে তাকে বিদেশি বলেই মনে হয়, আবার কখনও মনে হয় সে খুবই ফর্শা ধরনের একজন বাঙালি; তবে তার স্বরে যুবকসুলভ উগ্রতা নেই, মনে হয় সে অল্পভাষী, আসলে ব্যাপারটি উলটো, খুব বেশি কথা বলে; চোখ-ঠোঁট সবসময় খেলা করে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা জাবেদ একমনে তলোয়ার মার্কা ব্লেডের ছোঁয়ায় শেভ করে চলেছে; আর অভিষেক বেশ কষ্ট করেই জেগে আছে, কিছুক্ষণের মধ্যেই তাকে উঠতে হবে। অভিষেক ভেবে পায় না, একটি মানুষ সারাক্ষণ এত টেনশন-ফ্রি থাকে কীভাবে! তার চেয়ে আশ্চর্যের কথা সে শত চেষ্টা করেও টেনশন-ফ্রি থাকতে পারে না। জীবন নিয়ে জাবেদের মতো এত শীতলও না সে। একটু অস্থির থাকে বলেই হয়তো সে বালিশ থেকে নিঃশব্দে মাথা তুলে বাইরের জগৎটি দেখার চেষ্টা করল; স্তব্ধ-নিঝুম-বিপুল অন্ধকারের রাজত্ব চলছে সেখানে, যতদূর দৃষ্টি যাচ্ছে তার চেয়েও অনেক অনেক দূর পর্যন্ত। সেখান থেকে তার কিঞ্চিৎ রোষায়িত ও মৃদু অনুযোগে ভরা দৃষ্টি গিয়ে স্থির হল রান্নাঘরের ভেজানো দরজার ফাঁকে, সেদিকে তাকাতেই দেখল, খুব সন্তর্পণে দরজার ফাঁক দিয়ে বিদ্যুৎবাতির আলো জাবেদের চুল ঘেঁষে আয়নার সঙ্গে হৃদয়ঘটিত একরকম বন্ধুত্বের ভাব রচনা করে চলেছে। জাবেদ রান্নাঘরের বিদ্যুৎবাতিটি জ্বালিয়ে ছিল অভিষেকের ঘুম না-ভাঙানোর জন্যেই, কিন্তু বাতির জন্যেই তার ঘুম ভেঙে গেল। অভিষেক ভেবে পাচ্ছে না, আয়নার সঙ্গে রান্নাঘরের আলোর এত উতল-উল্লাসে খেলা কেন? অদ্ভুত! অভিষেক তার মাথা আবার বালিশে শুইয়ে, শরীরকে টানটান করে বিশ্রাম নেওয়ার চেষ্টা করল।

শ্রান্তি যখন তার শরীরকে দখল করতে পারছে না তখন সে জোর করেই চোখ-দুটো বন্ধ করে রাখল। চোখ বন্ধ করে জটিল জিনিশ নিয়ে সে চিন্তা করতে ভালোবাসে; সারা দিন নানারকম কাজকর্মে ব্যস্ত থাকে তাই ভাবার সময় পায় না। সকালটাই আলাদা করে রাখে; চিন্তা করে, টেনশন করে। তাই হয়তো চোখ-দুটো বন্ধ রাখতে পারছে না। চোখ খুলল। তার দৃষ্টি গিয়ে পড়ল ছাদে, যেখানে আয়না থেকে ছিটকে পড়া আলোর প্রতিফলন-প্রতিসরণ মৃদুমন্দ আলো-অন্ধকারে কয়েকটি অসমাপিকা ক্রিয়াপদের সাহায্যে একরকম অস্ফুট ভাব রচনা করে চলেছে। শুয়ে শুয়ে এই খেলা দেখতে অভিষেকের ভালোই লাগছে, যদিও গতরাত তার নানারকম ঝামেলায় কেটেছে, একফোঁটা ঘুমও চোখে আসেনি, এখনও যে ঘুম পাচ্ছে তা নয়, শুধু গা ঝিমঝিম করছে। সে নিশ্চিত আরও কিছুক্ষণ এভাবে শুয়ে থাকতে পারবে, অন্ততপক্ষে যতক্ষণ পর্যন্ত না জাবেদ তাকে ডেকে তুলছে, কিন্তু তার এখন ডাকার কথা নয়, সে চোখেমুখে জল ছেটাচ্ছে। জাবেদকে নিয়েই অভিষেক ভাবছে, যেন তার সকল চিন্তাই তাকে নিয়ে। জাবেদের বয়স বিশের বেশি নয়। অভিষেকের বেশিই; তবুও জাবেদের গতরাতের ঘটনা, ভ্রমণ, আপ্যায়ন কোনও কিছুই মেনে নিতে পারছে না; ওর সঙ্গ-নেওয়া যেন ভুল হয়েছিল, না-গেলেই হয়তো ভালো হতো, ভেতর থেকে কে যেন টিকটিক করতে লাগল। জাবেদকে নিয়ে ঘটে-যাওয়া ঘটনাটি ঝাপসা অন্ধকারে ও ঝিমঝিম লাগা অবস্থায় মনের মধ্যে চিকচিক করছে; গোটা ঘটনাটি যেন তার মগজে কামড়ে ধরেছে। জাবেদ তাকে প্রায় টেনেই বাড়ি থেকে বের করে একটি ট্যাক্সিতে চেপে বসিয়ে দিল। তার কল্যাণেই শাহীচাল; অন্যদিন হলে বাসে ঝুলতে ঝুলতে ঘুরে বেড়াত। অক্সফোর্ড স্ট্রিটের মোড়ে পৌঁছতেই ট্যাক্সিওয়ালাকে জাবেদ বলল, 'স্টপ।' দরজা খোলা মাত্রই এপাশ-ওপাশ থেকে যুবক-যুবতীর হইচই অভিষেকের কানে ভেসে এল। রাস্তার পাশের 'হটডগ' দোকানে আঁচ পড়েছে, বাতাসে ধোঁয়ার গন্ধ; এরই পাশে একটি ফুটবল ক্লাবের 'বন্ধুসভা'র সদস্যরা জটলা বেঁধে আছে। রাত হয় হয়, তবুও শীতের কোনও তীব্রতা নেই, শুধু ঝাপসা কুয়াশার চাদর লেপটে আছে। ট্যাক্সি ছেড়ে ওরা এগুতে লাগল। একটি শুঁড়িখানার সামনে জাবেদ দাঁড়াতেই অভিষেক চমকে উঠল; মনে মনে বলল, আমাকে জাবেদ হঠাৎ করে এখানে নিয়ে এল কেন? তবুও সে শাহী-মেজাজে চলা জাবেদের পিছু পিছু শুঁড়িখানায় প্রবেশ করল। ইয়ার-বন্ধুর ধোঁয়া-ভরা পরিবেশে সূরাপানের মেলা জমে উঠেছে বেশ। সবাই যেন সাচ্চা মানুষ, সব্বাই হাসিহাসি-খুশিখুশি, বিনা বাক্যালাপে তাদের অমীমাংসিত সমস্যা যেন মিটে যাচ্ছে; তবুও আলাদা আলাদা

সুর—ফুর্তির স্বর, আনন্দের ঝঙ্কার, সমবেত সঙ্গীত যেন—শুঁড়িখানার এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে; ঠিক সুর নয়, সুরের ঝরণা যেন। বিয়ে-করা সংসারী মানুষগুলো যেন সারা সপ্তাহের কুলিগিরি-পরিশ্রমের ক্লান্তি দেহ থেকে মুছে নিশ্চিহ্ন করতে এই আনন্দসাগরে ডুব দিয়েছে, তবে তাদের ঠোঁটের ফাঁকে ব্যথিত জীবনের ব্যর্থতার ঝিলিক ঠিকই প্রকাশ পাচ্ছে; তারা যেন মদ খেয়ে তাদের অভাবের চাপ ভোঁতা করতে চাচ্ছে। এখানেই, সুরের ঝরণা-ধারা মিলিয়ে যাক-বা-না-যাক, সৃষ্টি হতে লাগল জীবন-নামের চালচিত্রটি। অভিষেক তার জোয়ান বুকে শক্তি সঞ্চয় করে, চারদিকের দৃশ্য অবলোকন করতে করতে, একটি চেয়ার টেনে আঁটসাঁট হয়ে বসল, তবে তার মনের খুঁত খুঁত দূর হল না; তাই হয়তো জাবেদ বসতে-না-বসতেই তার দেহ দুলে উঠল। তখনই সিগারেটের ধোঁয়ার বিচিত্র জালটি ভেদ করে একটি যুবক ধীরস্থির পদক্ষেপে ও গম্ভীর মুখে তাদের সামনে এসে দাঁড়াল। সাজপোশাকে বোঝা যায় সে শুঁড়িখানার একজন কর্মচারী, বিনা প্রশ্নে ও নির্বিচারে গ্রাহকের হুকুম তামিল করে চলার জন্যই যেন তাকে গড়া হয়েছে। তার চোখে ঘৃণা-অবিশ্বাস-ভয়। ভারতবর্ষের মানুষগুলো যেন তার দৃষ্টিতে আবর্জনার স্তূপ। সে যে অস্বস্তি বোধ করছে তা লুকানো রইল না, কপালের ভাঁজে ভাঁজেই প্রকাশ পায়। সে একরোখাভাবে তার মাথাটি শরীরের মধ্যখানে স্থির করে ঠোঁটের কোণে সুকৌশলে ধারণ করল একটুকরো হাসি। গ্রাহককে মদ দিয়ে বেহুঁশ করে রাখাই তো তার কাজ, তাই হয়তো তার দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে ক্লান্তির ছাপ থাকলেও ঠোঁট-দুটোতে এর প্রভাব পড়ল না। অভিষেক ঠিকই বুঝতে পারল, যুবকটি হেসে মনে মনে গালি দিতে পরোয়া করবে না, আবার গালি দিয়ে উচ্চস্বরে হেসে উঠতেও সময় নেবে না। গ্রাহকের আসা-যাওয়ার পথে আস্তেধীরে মাকড়সার জাল বোনার মতো আলাপে জড়িয়ে, জীবন-সম্পর্কে নিজের অভিমত প্রকাশ করে, অকারণে-অনায়াসে কয়েকবার হাসির চমক তুলে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করতেও সময় নেবে না; তার চেহারাই এর সাক্ষী দিচ্ছে। তার ভঙ্গিতে যদিও অন্যরকম না-শোধানো প্রশ্নের উত্তর পাওয়া কঠিন, আন্তরিকতার ইশারা তো নয়ই, তবুও একরকম কৃত্রিম বন্ধুসুলভ ব্যবহার আশা-করা অসম্ভব নয়; সে যতই চেষ্টা করুক না কেন, তা গোপন রাখতে পারছে না। যুবকটির দিকে ঘাড় ফিরিয়ে জাবেদ বলল, 'ভোদকা প্লিজ।' ভোদকার নাম শুনে অভিষেক কেঁপে উঠল। সে অপ্রস্তুত। তার বিব্রতকর অবস্থা। জাবেদের দিকে একটু ঝুঁকে অভিষেক, মনে মনে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করা সত্ত্বেও, মুখের পেশিতে প্রসন্নভাব ফুটিয়ে বলল, 'ভোদকা পান করার কথা বলছো?' জাবেদ

সেকথায় কান না-দিয়ে যুবকটিকে বলল, 'দুটো ভোদকা প্লিজ।' অভিষেক প্রতিটি শব্দ ওজন করে উচ্চারণ করল, 'যাই বলো, আমি এতে অভ্যস্ত না, বরং আমার জন্য কোকাকোলা অর্ডার দাও।' কোকাকোলা অর্ডার দেওয়ার আগেই যুবকটি সিগারেটের ধোঁয়া ভেঙে তাদের সামন থেকে উধাও হয়ে গেল। জাবেদ বলল, 'এ কী বলছো! কোল্ডড্রিঙ্কস্ তো মেয়েরা পান করে। পানাহার স্রেফ অভ্যাসের ওপর নির্ভরশীল।' অভিষেক তার মনের কথা গোপন রেখে, এক মনোরম ভঙ্গিতে হাসতে লাগল। যুবকটি ভোদকার দুটো গ্লাশ দিয়ে গেল, সঙ্গে কিছু বাদামও। চলে যাওয়া যুবকের চুলের ঢেউ তোলা ঝিরঝির হাওয়া দেখতে দেখতে শুরু হল মদপানের আসর। জাবেদের তীক্ষ্ণ চোখ-দুটো তার বন্ধুর উপর যেন তীরের মতো বিঁধে আছে, তবে দৃষ্টিতে স্থান করে নিয়েছে একরকম বিস্ময়কর অনুভূতি। যদিও তার ঠোঁট-দুটো কাঁপছে, তবুও ঠোঁটের ফাঁকে দাঁতগুলো নীরব। আর অভিষেক নেশার দখলে, চোখের পাতাগুলো তাই ভারি দেখাচ্ছে, তার কাছে সবকিছু যেন কেমন কেমন লাগছে। সে নিজেকে সংযত করে, ঘামে ভেজা আলুথালু চুলে হাত বুলিয়ে কী যেন বলতে চাচ্ছে, কিন্তু পারছে না; বরং উৎসুক অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। জাবেদ তার লম্বা দেহ সামনের দিকে একটু ঝুঁকিয়ে, নিঃশব্দে একটু নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসল, তারপর ভ্রুর উপর গভীর উদ্বেগের সচেতন রেখা ফুটিয়ে, চট করে ভোদকার গ্লাশ একনিশ্বাসে শেষ করে টেবিলে রাখল। গ্লাশটি থরথর করে কেঁপে উঠল, যেন জীবনের কোলাহল আছড়ে পড়ছে এর ভেতর। তারপর আস্তেধীরে মিটিমিটি হাসি ছড়িয়ে, দু-হাতে চেয়ারের হাতল আঁকড়ে ধরে, চেঁচিয়ে উঠল, 'সেরী প্লিজ।' যুবকটি ভারি পদক্ষেপে এগিয়ে এল। তাদের সামনে আরও দুটো গ্লাশ স্থাপন করে, ফিরে যেতে যেতে আড়চোখে দেখে নিল অভিষেককে। যুবকের মুখ আগের চেয়েও গম্ভীর, চোখ-দুটো যেন চুপি চুপি কাঁদছে। হঠাৎ যুবকের পাশ দিয়ে ফ্যাক্টরির গন্ধ ছড়িয়ে দুটো যুবক ব্যস্তভাবে ছুটে গেল। মদবারের পাশে ছেলে-বুড়োর জটলা থেকে তাদের উদ্দেশ্যে কেউ কেউ টিটকারি দিল, কেউ-বা উৎসাহও। তারা মদবারের সামনে গিয়ে থামল। তাদের ভারি চিন্তিত চেহারায় ফুটে উঠেছে বিরক্তির কয়েকটি ক্রুদ্ধ রেখা। একজন তার ঘাড় ডান-দিকে একটু কাৎ করে অন্যজনের লম্বাচওড়া ভরাটে মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলছে, আর অর্ডারের জন্য অপেক্ষা করছে। অভিষেক সেদিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে জাবেদের উপর স্থাপন করে দেখল, তার মুখে একটি অনিশ্চিত ভাব ফুটে উঠেছে; অন্যদিকে জাবেদ তার বিষাদ আর সংশয়ের ছায়া মিশানো তীক্ষ্ণ দৃষ্টির শর দিয়ে বন্ধুকে পাঁতি পাঁতি করে কাটছে, একইসঙ্গে তার

বুক অসমানভাবে ওঠানামা করছে, যেন এই বুকে মাথাখুঁড়ে মরছে একটি আশ্চর্য জটিল ব্যথা। এরকম আকুল ব্যথায় ব্যাকুল হতে জাবেদকে কখনও দেখেনি অভিষেক, এই অসহায় অবস্থার বিশ্লেষণ তার কাছে অজানা। বুকের ওঠানামা কিছুটা স্থির হলে, জাবেদ গলাকাশি দিয়ে, ডানে-বাঁয়ে তাকিয়ে বলল, 'আমাদের একটি সুখী পরিবার ছিল। কিন্তু দিন কতক আগে পূর্ব-বাংলা থেকে একজন মৌলানা এসে এমন ফতোয়া দিলেন যে, এখন আমাদের শান্তিকুঞ্জে ঢুকে পড়েছে একটি হিংস্র নেকড়ে, আর তার তীক্ষ্ণ নখের আঁচড়ে আমাদের সংসারটি ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। আমার মা-বাবার ধৈর্যে-চেষ্টায়-যত্নে, তাদের রক্তমাংসের বন্ধনে, রচিত সংসারটি ভেঙে যেতে বসেছে।' দগ্ধ কান্না জড়ানো 'ভেঙে যেতে বসেছে' শব্দগুলো অভিষেককে বিধ্বস্ত করল। জাবেদের বুকে এতদিন সযত্নে ধরে রাখা হৃদয় মোচড়ানো ও নাভিছেঁড়া গোপন কষ্টগুলো যেন প্রকাশ পেল জ্বলন্ত আগুনের উথলানো উদগ্র-উত্তাপ রূপে। অভিষেক বুঝতে পারল, অচলায়তন ও অপ্রকাশিত নির্জনতার মাঝে একটি সংসারকে বিসর্গ-বিসর্জন দেওয়া হচ্ছে, তবে সে জানে না এই পরিবারের মূল্য সমাজের কাছে কতটুকু; তাই হয়তো তার আত্মার মধ্যে একটি তীব্র আর্তনাদ সৃষ্টি হয়েছে, তবে মনে হচ্ছে, তার শরীর থেকে আত্ম যেন ছায়ার মতো বেরিয়ে গিয়ে স্থান করে নিয়েছে মদের গ্লাশে; কিন্তু গ্লাশটি বিচলিত হল না, হয়তো ওর জন্য ঘটনাটি কিছুই না। অভিষেকের দৃষ্টি দ্রুতগতিতে ঘুরে বেড়াতে লাগল গ্লাশের মধ্যেই; আর গ্লাশের মধ্যেই সিগারেটের ধোঁয়ার অঢেল অণু দৌড়াদৌড়ি করে বাদুড়ের মতো ঝাঁকে ঝাঁকে যেন পৃথিবীজোড়া অধিকারচ্যুত অভিমানী মানুষের অভিযোগ নিয়ে ঝুলে পড়ছে। অভিষেকের দৃষ্টি ধূসর, মুখও নিমিষে কেমন যেন শুকিয়ে উঠল। নিজেকে আয়ত্তে এনে বলল, 'না, তা ভেঙে যেতে পারে না।' জাবেদ তার দৃষ্টি নিচু করে, পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে, একটিতে আগুন সংযোগ করল। দীর্ঘটানে অনেকটা সিগারেট ক্ষয় করে বেণীর আকারে কুণ্ডলি পাকিয়ে মুখনিসৃত ধোঁয়া বাতাসে ছেড়ে দিয়ে বিষণ্নভাবে সেদিকে তাকিয়ে রইল—অদ্ভুত ভাবে ধূসর ধোঁয়া তার মাথার উপর উঠে শুঁড়িখানার বাতাসের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। হঠাৎ বলল, 'তা হবে! একজন বাঙালি পুরুষ ও একজন ইংরেজ নারীর হৃদয়পটে জমে থাকা প্রেমের উচ্চারিত-অনুচ্চারিত কথার আদানপ্রদানে যে মিলনসৌধ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা কিনা ইসলামিক শাস্ত্রের বিধানে বাঁধা পড়েনি। এরকম বরখেলাপ মৌলানা মেনে নিতে পারিনি। তাই তাদের সম্পর্ক বরবাদ না-হয়ে যায় কোথায়!' কোলাহলে ভরা শুঁড়িখানার পরিবেশে জাবেদের কণ্ঠস্বর ক্ষীণই শোনাল। তার

অন্তরঙ্গ নীল চোখে যেন ফুটে উঠেছে খুবই পরিচিত কিন্তু পরাজিত, নিরীহ এক নারীর ছবি। তিনি যেন সকল আঘাত, উপেক্ষা, শ্লেষ, বিদ্রুপ হজম করে স্তব্ধ-নির্বিকার পাথরমূর্তি। এই নীরবতার মধ্যে ঠিকই তার রক্তক্ষরিত অন্তরের দ্রোহ-ঘৃণা-প্রতিশোধ-স্পৃহা সগর্বে আত্মপ্রকাশ করছে। এই নারীর ছবিটির পাশেই ভেসে উঠেছে মানব মনের অঙ্গীকারহীন অবচেতনস্পর্শী এক নিষ্ঠুর মৌলানার মূর্তি; তার চোখেমুখে প্রকাশ পাচ্ছে ক্রুর, ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ আর একটি সুখী পরিবার ভাঙার বীরত্বসূচক দাপট; তার ঠোঁটে স্থান করে নিয়েছে অর্থহীন-আত্মপ্রতারক-বিস্বাদ-অস্তিত্বহীন আস্ফালনের হাসিটিও। এই হাসির আঘাতে জাবেদের ভ্রু-দুটো যেন কাঁপছে। সেদিকে তাকিয়ে অভিষেক বলল, 'আনুষ্ঠানিকতার চেয়ে রক্তমাংসের আন্তরিকতার মূল্য অনেক বেশি। মৌলানা তার ক্ষয়কারক দিকগুলো প্রকাশ করেছেন মাত্র। তবে তিনি ঠিকই জানেন, যে-কোনও শাস্ত্রের বিধান দেখিয়ে তোমার মা-বাবার সম্পর্ক বরবাদ করতে পারবেন না।' উচ্ছ্বাসময়, আবেগপ্রবণ ও একটু আড়ষ্টের ভাব অভিষেকের কণ্ঠে প্রকাশ পেল। সঙ্গে সঙ্গে জাবেদ সশব্দে নিশ্বাস ফেলে বলল, 'বলছিলাম, মৌলানার মতে বাপ-মায়ের এরকম সম্পর্কের জন্য তাদের ছেলেমেয়ে লজ্জায় মুখ ঢাকতে বাধ্য হবে।' জাবেদের নিরুপায় অক্ষমতার অকপট স্বীকারোক্তি প্রকাশ হতে-না-হতেই হঠাৎ যেন একরকম হিমেল বাতাস টেবিলের নিচে সৃষ্টি হয়ে, শুঁড়িখানার কোলাহলের সঙ্গে মিশে, দেওয়ালের একের-পর-এক ইটে আঘাত করে, উচ্চ থেকে উচ্চতর হতে হতে ছাদের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে; অন্যদিকে গ্লাশের গায়ে আঁকা হতে লাগল জাবেদের অপ্রকাশিত আর্তচিৎকার আর তার মনে ধরে রাখা তীব্র ব্যথার গোপন নকশাটি। ঝাপসা আলো-অন্ধকারের মধ্যেও অভিষেক স্পষ্টই অনুভব করছে জাবেদের যাতনা, তাই বলল, 'তোমার মন ব্যথায় ভরে আছে। দেখ, আমরা প্রত্যেকেই কোনও-না-কোনও সময় জীবন-নামের জটিল পথটি অতিক্রম করতে গিয়ে অবাঞ্ছিত-অনাকাঙ্ক্ষিত অপবাদের তারকাঁটার উপর দিয়ে খালি পায়ে হাঁটতে হয়, তাই দুর্যোগের সময় সহজেই হতাশ হয়ে পড়ি।' কথাগুলো বলেই অভিষেক হেসে উঠল, কিন্তু জাবেদ হাসল না, শুধু বলল, 'তুমি হাসছো কেন?' অভিষেকের বুক ছ্যাঁদ করে উঠল, বলল, 'মনে হচ্ছিল—তোমার মনে যে-লোকটি কষ্ট দিয়েছেন তিনি একজন গাধা। তোমার ঘাড়ে এরকম অপবাদ দেওয়া নেহাত মূর্খের কাজ।' তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে যোগ করল, 'আমার মা-বাপ যদি দুটো ভিন্নবর্ণের মানুষ হতেন তাহলে আমি গর্বই করতাম। কখনও লজ্জায় মাথা নত হতো না।' এর অর্থ খুঁজে না-পেয়ে জাবেদ বলল, 'কেন, বলো

তো?' অভিষেক বলল, 'অবিভক্ত বাংলার জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামই বলেছেন, মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান।' সঙ্গে সঙ্গে জাবেদ প্রশ্ন করল, 'কিন্তু, ধর্মগ্রন্থ—কিতাব?' অভিষেক জবাব দিল, 'নজরুল বলেছেন, মানুষ এনেছে গ্রন্থ কেতাব, গ্রন্থ আনেনি মানুষ কোনো। বুঝলে, মানবধর্ম ঠুনকো জিনিশ নয় যে, ব্যক্তি বিশেষের বা কোনও-এক ধর্মের জাঁতাকলে পিষ্ট হবে।' জাবেদের চোখে অপূর্ব আলো ফুটে উঠল, কোমল কিন্তু কঠিন, একগুঁয়েমির দীপ্তিও হতে পারে; কিন্তু কিছুই বলল না; বরং অভিষেকই বলে চলল, 'মৌলানার ফতোয়া কি ছিল?' সিগারেটের ধোঁয়ার কুয়াশায় নিমজ্জিত জাবেদকে আরও গম্ভীর দেখাচ্ছে, যেন তার চোখ থেকে আলো নিভে গেছে, সেখানে শুধুই নিথর অন্ধকারের রাজত্ব; হৃদয়ে যেন তীব্র ক্ষোভ ও প্রতিবাদ! জাবেদ বলল, 'একদিন তিনি আমার মাকে সুরা আবৃত্তি করার জন্য বলেছিলেন। মা যখন আবৃত্তি শেষ করলেন তখন মৌলানা বিরক্ত হয়ে বলেন যে, এভাবে ভুল উচ্চারণে আবৃত্তি করার অর্থই হচ্ছে আল্লাহর কালামের অবমাননা করা। এমতাবস্থায়, আপনাদের বিয়েই হয়নি, আর আপনাদের মিলনজাত সন্তানরা জারজ বলে গণ্য হওয়া ছাড়া উপায় নেই।' সঙ্কোচের ভারে জাবেদ আর মুখ তুলে তাকাতে পারল না। সে যেন অন্য মানুষ, অচেনা; তার স্বরও অন্যরকম, আগের চেয়ে গভীর কিন্তু নিচু—গমগমে; তার হৃৎপিণ্ডটি কঠিন দুঃখে কুঁকড়ে মোচড়ে ভেঙে যাচ্ছে যেন; তার গাল বেয়ে যেন নিঃশব্দে গড়াচ্ছে দুঃখের স্রোত; তার মন বিষাদে ভরপুর; তার দৃষ্টিতে অদ্ভুত এক অজানা ভয় যেন প্রকাশ পাচ্ছে; তাই হয়তো অভিষেকের মনে মমতার সৃষ্টি হয়েছে, এজন্যেই সে টেবিলের ওপর রাখা তার বন্ধুর হাত চুপচাপ তুলে নিল। তুলে নিতেই অভিষেকের হাতের মধ্যে দিয়ে সমস্ত শরীরে প্রবাহিত হতে লাগল জাবেদের অন্তরে সংগোপনে রাখা অব্যক্ত ব্যথাগুলো। অভিষেক মনে মনে বলল, মন যেখানে মিলেমিশে এক হয়ে গেছে, থাক না সেখানে ভিন্ন মত, হোক না কাজের ধারায় অমিল, এতে কী যায় আসে! আর প্রকাশ্যে বলল, 'মৌলানার অভিমতকে শ্রদ্ধা করতে গিয়ে নিজেকে আঘাত করার কোনও যুক্তি আমি খুঁজে পাই না। তার মত ও কর্ম তোমার জন্য বাইরের জিনিশ, বরং তোমার বাবা-মা'র মত ও কর্মই হচ্ছে আসল। তাদের অস্তিত্বই তো বাস্তব। তাদের রক্তমাংসের মিলনই তো সত্য। ধর্মীয় বাহ্যিকানুষ্ঠানে গরমিল থাকলেও কিচ্ছু যায়-আসে না, বরং রক্তমাংসের অনুভূতি ও বিশ্বাস সর্বদাই পাপমুক্ত ও ভ্রান্তিমুক্ত থাকে।' অভিষেক কথাগুলো শেষ করে, তার বন্ধুর হাত ছেড়ে দিয়ে, টেবিলে রাখা বাদাম তুলতে লাগল। কিন্তু অসচেতনতার কারণে কয়েকটি তার

আঙুলের ফাঁকে কার্পেটের উপর ছড়িয়ে পড়ল। একইসঙ্গে জাবেদের চোখ দিয়ে কয়েক ফোঁটা অশ্রুও ঝরতে লাগল। তারপর ভেজা চোখ-দুটো রুমাল দিয়ে মুছতে মুছতে জাবেদ বলল, 'কিন্তু ফতোয়া শোনামাত্র বাবা দিশেহারা, আর মা দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন।' অভিষেকের মুখ দিয়ে রাগে-দুঃখে বেরিয়ে এল, 'এসব অবাঞ্ছিত, অপ্রয়োজনীয়, অবান্তর, অশ্লীল, বিবেকহীন, মানবধর্ম-পরিপন্থী ফতোয়ার ভাঁওতাবাজি প্রগতিশীল সমাজ-ব্যবস্থায় অচল। বাস্তবে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের যুগ চলছে, ফতোরার নয়।' জাবেদ চমকে উঠল; যেন তার হৃৎপিণ্ডে আগুনের স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে তার শরীর জুড়ে। সুললিত সৌকুমার্যের প্রকাশের নিদর্শন তার চোখ-দুটোতে ঝলমল করছে একরাশ প্রশ্ন; তবে মুখের চিন্তিত পেশিতে একরকম কোমল-কঠিন বাস্তবতাই প্রকাশ পাচ্ছে। সে মৃদুভাবে চুল ঘষতে ঘষতে বলল, 'মৌলানা জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কথা জানবেন কীভাবে?' অভিষেকের মনে এক বিপুলকূলপ্লাবী আবেগের ঢল সৃষ্টি হল, চৈত্রের খারায় বৃষ্টি নেমে এলে যেমন হয়, ঠিক তেমনি তার অন্তর অভিষিক্ত হল; তাই বলল, 'এসব নিয়ে আলোচনা করে কোনও লাভ নেই। মৌলানাকে শত বকলেও তার কিচ্ছু হবে না। আমি বলি, জ্যাস্ট ফরগেট অল এ্যাবাউট ইট।' জাবেদের দৃষ্টিতে একইসঙ্গে বিমূঢ়তা ও শঙ্কা প্রকাশ পেল। তার আহত হৃদয়ের সবটুকু ব্যথা যেন গলে বেরিয়ে আসতে চাচ্ছে তার ঠোঁটের ফাঁকে, তবে সেখানে স্থান করে নিয়েছে একটি মৃদু হাসি, অসহায় মন যে আস্তেধীরে সচল হয়ে উঠছে এরই নিদর্শন যেন। শুঁড়িখানার পরিবেশও তার মনের অবস্থা বুঝতে পেরে রিমঝিম তাল তুলছে, চিমনির ভেতরের বাতাসও যেন উৎসাহে দিশেহারা। বাতাসের শোঁ-শোঁ আওয়াজের সঙ্গে দেওয়াল-ঘড়ির কাঁটাগুলোও টিকটিক শব্দে অদ্ভুতভাবে খেলা করছে। নিঃশব্দে একটি সচল তরঙ্গ জাবেদের দেহে চমকে উঠতেই সে বলল, 'ওয়াঞ্চ মোর প্লিজ।' টেবিলে সেরী পৌঁছতে দেরি হল না। গ্লাশে চুমুক দিয়ে একনিশ্বাসে শেষ করে জাবেদ বলল, 'দারুণ খেতে। স্বাদই আলাদা।' তার সেরীপানের তৃপ্তিই আলাদা, কিন্তু অভিষেকের মুখ দেখে কিছুই বোঝা গেল না, তবে সহজেই বোঝা যাচ্ছে তার অন্তরে যেন সৃষ্টি হয়েছে উত্তাল সমুদ্রের তরঙ্গ, বাতাসের একরকম উন্মাদ আলোড়নও; আর দৃষ্টিতে চৈত্রের ঝরাপাতার ওড়াউড়ি—হেমন্তের অপেক্ষায় উদাসী বাউলের একতারার টুঙ্কারই বেশি। হঠাৎ জাবেদ তার গভীর-গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'অভিষেক, সত্যি বলতে কী তোমার সঙ্গ আমাকে খুবই আনন্দ দেয়। তাই তোমাকে জোর করে আমার সঙ্গে নিয়ে এসেছি।' অভিষেক বলল, 'তোমার সঙ্গলাভে আমিও আনন্দিত।' এবার অভিষেককে আর জাবেদ হারাতে পারল

না। সেরী দিয়ে আবারও গ্লাশ পূর্ণ হল। অভিষেক ভেবে পাচ্ছে না, বিয়ার গ্লাশ ভর্তি সেরী কীভাবে তার পাকস্থলীতে স্থান করে নিল। সময় ঠিকই এগিয়ে চলল টিকটিক করে, সঙ্গে গল্পও। গল্পের রাজ্য হাতড়াতে হাতড়াতে একসময় নারীর প্রসঙ্গে আলাপ শুরু হল। বোঝা গেল মদের সঙ্গে নারীর কী নিবিড় সম্পর্ক! নারীদেহের অভাব পূরণের ব্যাপারে জাবেদ সত্যি ধন্বন্তরি। যুবক হয়ে-ওঠা পুরুষ কীভাবে নারীর অন্বেষণ করে, তার স্বপ্নে কীভাবে নারী আসে, ফুলের উপত্যকায় সে কীভাবে নারীকে হাত ধরে নিয়ে যায় সহবাসের আশায়—সবই জাবেদ তার বক্তব্যে অপার মহিমায় সাজিয়ে তুলল। নগ্ন নারীমূর্তির বর্ণনায় তার আকর্ষণীয় বাক্যজাল অপূর্ব, এই অন্ধকার রাতেও অভিষেক সন্ধান পেল প্রমোদচঞ্চল টেমস নদীর তীরে সূর্যস্নানের প্রত্যাশায় শুয়ে থাকা একদল অর্ধোলঙ্গ নারীর। জাবেদের মনে যে পুলকানন্দ সৃষ্টি হয়েছে তা উপলব্ধি করে নীরব বাতাসও, বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ ছাড়াই, উন্মত্ত উৎসাহে শুঁড়িখানার পরিবেশকে বিদীর্ণ করতে লাগল। এই পুলকানন্দে, পরিপূর্ণ হৃদয়ে, আত্মহারা জাবেদ বাথরুম গেল, আবার ফিরেও এল, তবে আগের মতোই তার মন পুলকের গাঢ়ছন্দে নাচতে লাগল, তাই হয়তো সে তার কণ্ঠে রবীন্দ্রসঙ্গীত মৃদুমৃদু ভাঁজছে, ভারি সুন্দর তার গলা, যদিও তার মুখ থেকে মদের গন্ধ ভেসে আসছে তবুও সে যে সুন্দরভাবে গান ভাঁজতে পারে তা অভিষেকের জানা ছিল না। আশ্চর্য! হঠাৎ জাবেদ বলল, 'চলো, আমরা নাচি।' জাবেদ তো এমন স্বভাবের যুবক নয়, সত্যি বলতে কী অভিষেকের ধর্য্য চরমে পৌঁছে গেছে, তাই হয়তো তার গালে-গলায় ঘাম দেখা দিয়েছে, তাই মরিয়া হয়ে বলল, 'আজ না হয় নাচটা থাক্।' জাবেদ দিশেহারা, চেয়ারে স্থির থাকতে পারছে না; তার ঠোঁট-দুটো একপ্রকার কাঁপছে, আনন্দে না কৌতূহলে অভিষেক ঠিক বুঝতে পারছে না; তবে তার দাঁতগুলো অগভীর স্বচ্ছজলের নিচে নুড়ি যেমনি চিকচিক করে তেমনি ঝিকঝিক করছে। 'তুমি তো আমার নাচ দেখনি?' জাবেদ তার শার্টের বোতাম খুলতে খুলতে যোগ করল, 'আই উইল ড্যান্স টুডে।' দু-হাত পাখির ডানার মতো ছড়িয়ে খালি গায়ে তার মাংসপেশি দুলিয়ে নাচতে লাগল। মদের প্রভাব সামলাতে না-পেরে একসময় হোঁচট খেয়ে পড়ল। অভিষেক তাকে তুলে নিল। জাবেদ তার গায়ে শার্ট জড়িয়ে বলল, 'চলো তার চেয়ে বরং নাচই দেখি।' মদবার থেকে বেরুতে পারলে অভিষেক হাঁপ ছেড়ে বাঁচে, তাই একমুহূর্ত বিলম্ব না-করে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। অভিষেক শুঁড়িখানা থেকে বেরিয়ে উপলব্ধি করল—হাঁটা ছাড়া গতি নেই; তখন তার শক্তির দশ-আনা ও ইচ্ছের ছয়-আনাই শেষ, তবে মুক্ত বাতাসের ছোঁয়ায় তার শরীরে কিছুটা হলেও

প্রশান্তি ফিরে এল। লন্ডনের পূর্ব-দিগন্ত ছেয়ে আস্তেধীরে রাত এগুতে লাগল চুপিচুপি, দশতলা-কুড়িতলা বাড়ির ছাদ ডিঙিয়ে; এতে কোনও চঞ্চলতা নেই, শুধু অন্ধকারের গভীরতাই উপলব্ধি করা যায়, ল্যাম্পপোস্টের আলোও ঝলসে উঠছে না। সামনের দিকে তাকাতেই অভিষেক দেখল, লম্বা রাস্তাটি গনগনে অন্ধকারে গলে যাচ্ছে, আর এই অন্ধকার ডিঙিয়ে দু-হাত ছড়িয়ে ছুটে চলেছে জাবেদ; মনে হচ্ছে, তার মনে নারীর কোনও কল্পনা নেই, তার কাছে অন্ধকারই যথেষ্ট, প্রয়োজন হলে সে বিলাতি বাতাস-বাতি, লরি-ল্যাম্পপোস্টের সঙ্গেই বন্ধুত্ব করবে। ওকে দেখে বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না যে, সে রাতের লন্ডনকে আপন করে নিয়েছে। জাবেদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাকে অভিষেক পড়তে লাগল—চোখমুখ উজ্জ্বল, ঠোঁটের কোণে একটুকরো হাসি, খেজুরপাতার মতো ঝুলে থাকা শূন্যতা যেন তার চুলের ভাঁজে ভাঁজে দুলছে, তবে এক এক সময় বড্ড উত্তাল হয়ে উঠছে তার দেহ। অভিষেকের ভুল ভাঙল, জাবেদের মন দোদুল্যমান, দোলক যেন; মৌমাছি যেমন ফুলের দিকে ধায় তেমনি তার দেহও পেতে চায় আর-একটি শরীরের সন্ধান; নারীর শরীর লাভের জন্যই তার দেহে দীর্ঘশ্বাস উঠছে; যদিও সে জানে—ইচ্ছে করলেই যে-কোনও নারীসম্ভোগে তৃপ্ত হতে পারে না, কত রকমের দেওয়াল চারপাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। দুটো রাস্তা অতিক্রম করে তৃতীয় রাস্তায় পড়া মাত্রই জাবেদ যেন আর নিজেকে সংযত রাখতে পারল না; নিদ্রাহীন রাস্তাগুলো মাড়াতে মাড়াতে সে একটি কথাই চিন্তা করে চলেছে—যে-করেই হোক একটি নারীর শরীর চা-ই-চাই; তার সমস্ত শরীর-মন আকুল হয়ে আছে একটি নারীদেহের স্পর্শ লাভের জন্য, যেন একটুকরো রঙ তার মনের মধ্যে মদির-মোহ জাগিয়ে তুলেছে। তৃতীয় রাস্তাটি পেরিয়ে চতুর্থ রাস্তায় যখন পড়বে তখনই সে জোর করে অভিষেককে নিয়ে একটি নাচের ক্লাবে প্রবেশ করল। অভিষেক দীর্ঘশ্বাস ফেলল। জাবেদ হেসেই চলল, এর বাণে আড়াল হয়ে গেল বিলাতি অন্ধকার। ক্লাবের টিকেটঘরে ঢুকে অভিষেক দেখল, চারদিকে ঝাপসা আলোর রাজত্ব, ভালো করে কিছুই দেখা যাচ্ছে না, তবে দেওয়ালের গায়ে ঝুলছে অনেকগুলো মাঝারি ধরনের নারীর পট। পটের সারি যেখানে শেষ হয়েছে সেখানেই একটি বিশাল দরজা। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকতে-না-ঢুকতেই জাবেদ বলল, 'তুমি আমাকে ঘৃণা করো? যদি তাই হয়, তো তুমি চলে যাও। আমি আর কখনও তোমার সামনে আসব না। তোমাকে আর আমার মুখ দেখাব না।' জাবেদের স্বরে এমন এক সিক্ত ঢঙ আছে যে অভিষেক মনে মনে হেসে উঠল; আর এ-সুযোগে সে আর-একবার তার বন্ধুর মুখটি দেখে নিল; সঙ্গে সঙ্গে তার মনে উদয় হল—বেমানান কিছু

বললে জাবেদের কষ্ট বাড়া ছাড়া কমবে না; তাই সে নিঃশব্দে নিশ্বাস ফেলে বলল, 'কী যে বলছো। আমি তোমাকে ঘৃণা করব কেন? আমারও তো কৌতূহল থাকতে পারে!' অভিষেক নিজের তালরক্ষা করে দ্রুতগতিতে জাবেদের পিছু পিছু এগিয়ে চলল। একটু পরেই সে থমকে দাঁড়াল নৃত্যমঞ্চের পাশে—শুরু হয়ে গেছে নাচ, ঠিক নাচ নয়, অর্ধোলঙ্গ অত্যাধুনিক নৃত্যনাট্য যেন। ক্ষণিকের মধ্যেই সে হতভম্ব হয়ে গেল। দুটো যুবতী বাদ্যের তালে, বেতালে দেহাবরণ খুলে যা আরম্ভ করল তা দেখে সে ভাবতে বাধ্য হল যে, কাহাতক পৌঁছাবে কে জানে। নৃত্যের ভঙ্গিতে যুবতী-দুটো ব্রা খুলে ছুঁড়ে মারল দু-দিকে। এই বুঝি শেষ! কিন্তু না, বেডৌল পয়োধর প্রদর্শনে মশগুল হতে থাকে নৃত্য-গীতপটীয়সী যুবতীদ্বয়। বাসশূন্য কটিদেশ প্রদর্শনপর্ব আরম্ভের ইঙ্গিতে দর্শকের আঁখিযুগল উন্মীলিত হল। অধিকাংশ দর্শকের বয়স মধ্যপ্রাঙ্গন পেরিয়ে গেছে। যুবতীদ্বয় ঊরুদ্বয়ের মধ্যস্থল থেকে নেংটি টেনে বের করে ছুঁড়ে যে-ই-না মারল অমনি দুটো বুড়ো দু-পাশ থেকে লুফে নিল; এরসঙ্গে প্রকাশ পেল, 'আহা! কী আনন্দ!' অন্যদিকে যুবতীদ্বয়, বাদ্যের তালে-বেতালে নিতম্ব দুলিয়ে দু-খানা তালপাতার পাখার আবরণে সামন-পিছন ঢেকে নৃত্য করে চলল। মাঝেমধ্যে নৃত্যের তালে তালে সামন-পিছন প্রায় উন্মুক্তভাবে উঁকিঝুঁকি দিলেও তালপাতার আবরণটিকে উৎসুক দর্শকের দৃষ্টি ভেদ করতে পারল না। মিষ্টিমধুর আলোতে মঞ্চটি অপরূপভাবে আলোকিত ও যুবতীদ্বয়ের সৌরভে ক্লাবটি আমোদিত হয়ে উঠেছে। একসময় শেষ হল নৃত্যনাট্য। নাচের ক্লাব থেকে দুই বন্ধু যখন বেরিয়ে রাস্তায় হাঁটছে, তখন বঞ্চনার দুঃখ থেকে দপ করে জ্বলে উঠল নারীবিহীন জীবনের মনোবেদনায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকা জাবেদের প্রাণের উষ্ণ নিশ্বাস। একটি নারীদেহ ছুঁয়ে দেখার আকাঙ্ক্ষায় ও অন্যরকম আনন্দে তার বুক যেন রেঙে উঠেছে, এ-সম্বন্ধে পৃথিবীর ক'টি পুরুষই-বা বুঝতে পারে! নারী দেখলেই যেন তার হৃদয় ক্ষুধার্ত হয়ে ওঠে। হৃদয়ই তো আত্মার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। অতৃপ্ত, বঞ্চিত, অপূর্ণ আত্মার মধ্যে জমে থাকা ক্ষোভ নিয়ে জাবেদ বলল, 'চলো পিক্যাডেলিতে যাই।' অভিষেক বুঝতে পারল—জাবেদের এখন কীসের প্রয়োজন; তাই সে বিরক্ত হয়ে বলল, 'দ্দতুর আর পারছি না।' জাবেদ জিভ দিয়ে নিজের ঠোঁট কয়েকবার চাটল; চোখ-দুটো অতিরিক্ত চকচক করছে; একইসঙ্গে তার গা থেকে একরকম অচেনা গন্ধ যেন বিলাতি বাতাসকে শীৎকারে চিরে আত্মহত্যা করতে লাগল। জাবেদ তার মনে কামাদ্রি-কুসুম-প্রহেলিকার ছবি ধারণ করে বলল, 'নারীবিহনী যামিনী কেমনে কাটিবে?' এ-যেন অন্য জাবেদ, আরেক অচেনা মানুষ। প্রচণ্ড ধমক দিয়ে

অভিষেক বলল, 'আর একদম ঝামেলা করবে না। চলো বাড়ি ফিরে যাই।' ধমক খেয়ে জাবেদ ফ্যালফ্যাল করে ক্ষণিকের জন্য তাকিয়ে রইল অভিষেকের দিকে। একটি ট্যাক্সি ব্রেক কষতেই অভিষেক ঠেলে ঢুকিয়ে দিল তার বন্ধুকে, একপাশে নিজেকেও। ট্যাক্সিওয়ালা স্টার্ট দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জাবেদের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল, তার চোখের আড়ালে অভিষেক ভাবতে লাগল, আবে-যমযমের জলে শরীর ধুয়ে নিলেও চরিত্রকে আর বোধ হয় পরিষ্কার করা যাবে না। কিন্তু আজ সকালে, এইমুহূর্তে, অভিষেক বিছানায় শুয়ে শুয়ে অন্যকথা ভাবছে। জাবেদ কান-কাঁধ ধুয়ে একটি শুকনো তোয়ালের সাহায্যে মুছে নিল। আফটার শেইভ মুখে মেখে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে আয়নার মধ্য-দিয়ে আড়চোখে দেখে নিল অভিষেককে। আপনা থেকে হঠাৎ দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে, উদাস দৃষ্টিতে আয়নার দিকে তাকাতেই জাবেদের চোখে অভিষেকের দৃষ্টি নিবদ্ধ হল। জাবেদ তার দৃষ্টি ফিরিয়ে বলল, 'গতরাতে কি হয়েছিল? কোনও গোলমাল করেনি তো?' হেসে উঠল অভিষেক, তারপর বলল, 'না।' জাবেদকে দেখতে দেখতে সে মনে মনে বলল, গতরাতের যে-বিরক্তি, যে-তিক্ততা আমার ভেতর নাড়া দিচ্ছিল—সবকিছুই যেন বিলাতি তুষারের মতো হাওয়া হয়ে উড়ে গেছে।

আ ত্ম ব্র ত

এপ্রিলের আবহাওয়ার উন্নতিতে বসন্ত এগিয়ে আসায় সবুজ পাতাগুলো পত্‌পত্‌ করতে লাগল, শুরু হয়ে গেছে ওউকের গায়ে একে-অন্যের বন্ধুত্বের জাল বোনা। ট্যারেস বাড়িগুলোর বাগানে ফুলের সমারোহ। স্বল্প শীতের জন্যে অষ্টাশির দিনগুলো আটরশি পীরের মতো প্রসিদ্ধ হয়ে থাকবে। এরকম এক দিনে, এলোখোঁপা বাঁধা, আটপৌরে শাড়ি পরা কাজীগিন্নী দরজা খুলতেই সামনে এসে দাঁড়ালেন দুশ্চিন্তার মূর্তি হাজী মজনু। তার চোখেমুখে যন্ত্রণার ছবি, তীব্র আহত যেন, যা সহজে দৃষ্টি কাড়ে। শরীর ভেঙে গেছে। কাঠামো ঠিক থাকলেও চেহারা রোগ্নশুকনো দেখাচ্ছে, মৃত প্রায়। অত্যন্ত করুণ ও বীভৎস হাজী মজনুর চেহারার দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না, তাই চোখ চলে যায় পোশাকে। এই পোশাকই পরিচয় দিচ্ছে তিনি পবিত্র হজ্ব পালন করে ফিরেছেন। কাজীগিন্নী বললেন, 'আসুন, ভেতরে আসুন।' অপ্রস্তুত হাজী মজনুর শরীর কাঠের মূর্তির মতো দরজায় কাৎ হয়ে পড়ে থাকতে চাচ্ছে, যেন তার কাঁধে চেপে আছে একটি অভিশাপের খড়্গ। সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে করিডোরের মাঝখানে বসা বিড়ালটি। এ-ধরনের বিড়াল সাধারণত সারাদিন ঘরের মধ্যে উড়াউড়ি করে না, বাইরে করে, জলে ঠ্যাঙ ডুবিয়ে মাছের সন্ধান করে। এ-ধরনের বিড়ালের পশম, সারাক্ষণ ছোটাছুটি দৌড়াদৌড়ি করে বলে, ময়লা ময়লা দেখায়। এ-ধরনের বিড়াল বাসা-বাড়িতে থাকার কথা নয়, আর যদি-বা থাকে তবে গম্ভীর ভঙ্গিতে করিডোরের মাঝখানে নিশ্চুপ বসে থাকার কথা নয়। কিন্তু এই পাহাড়ি বিড়ালটি সেরকম নয়। হাজী মজনু বিস্মিত চোখে বিড়ালটির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কাজীসাব আছেন?' মৃদুমন্দ পায়ে বিড়ালটি এগিয়ে এল কাজীগিন্নীর দিকে। তারপর তার শাড়ির পাড়ে মাথা গলিয়ে দিল। পাড়ের সঙ্গে বিড়ালের শরীরও দুলতে লাগল, কিন্তু তার স্থির দৃষ্টি হাজী মজনুর উপর। হাজী মজনুর বিস্ময় আরও যেন প্রবল হয়ে উঠল—বিড়ালটি কীসের সন্ধান করছে! বুকের ভেতর উত্তেজনা অনুভব করছেন বলেই হয়তো নিশ্বাস নিতে তার কষ্ট হচ্ছে। কাজীগিন্নী বিড়ালের ব্যবহারে অস্বস্তি বোধ করছেন, তাই একটি শিস দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে সে লেজ দোলাতে দোলাতে বসারঘরের দিকে ছুটে গেল, অভিমান যেন তার চলন-ভঙ্গিতে ফুটে উঠেছে, তার চলার গতিতেও একরকম অদ্ভুত নীরবতার সিঁড়ি ভাঁজতে লাগল। কাজীগিন্নী সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে হাজী মজনুর উপর স্থাপন করে, মনের কথা গোপন রেখে, বললেন,

'আপনার জন্যই তো অপেক্ষা করছেন। আপনি বসুন, আমি ডেকে দিচ্ছি।' বসারঘরে হাজী মজনু ঢুকলেন। বিড়ালের কোনও পাত্তা নেই, ফাঁকা ঘর, আশেপাশেও কেউ নেই। একটি আরাম কেদারা দেখিয়ে কাজীগিন্নী উধাও হলেন। হাজী মজনু দু-হাতে চেয়ারের হাতল চেপে, পা ছড়িয়ে বসলেন। বাইরে সূর্য তীব্র, তবুও আলো-অন্ধকারের একরকম রহস্যময় পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে ফিসট্যাঙ্কের পাশ ঘিরে, সেদিকে তাকাতেই তার চোখ গিয়ে ঠেকাল ফিসট্যাঙ্কের মধ্যে উঁচুনিচু কালো-লাল-ধূসর রঙের পাথরগুলোর উপর, কতগুলো সামুদ্রিক-উদ্ভিদ নিঃসঙ্গ প্রদীপের মতো নিস্তব্ধে দাঁড়িয়ে আছে, এর ওপর দিয়ে কয়েকটি রঙ-বেরঙের বিলাতিমাছ ঘোরাফেরা করছে। শব্দহীন পরিবেশে বসে থাকার কোনও অর্থ নেই ভেবে তিনি তার শরীর টেনে টেনে এগিয়ে গেলেন ফিসট্যাঙ্কের কাছে, গ্লাশে মৃদু শব্দ তুললেন, টুংট্যাং, সঙ্গে সঙ্গে মাছগুলো পাথর ও সামুদ্রিক-উদ্ভিদের আড়ালে চলে গেল, কিন্তু ভয় পেল না, ক্ষণিকের মধ্যে আবার বেরিয়ে এল। হাজী মজনু আবার মৃদু শব্দ তুললেন, মাছগুলো ছুটে পালাল আবারও, তবে বেশি সময়ের জন্য নয়, ফিরে এল। বারকয়েক এরকম চলল। হঠাৎ হাজী মজনু নিজের অজান্তেই চমকে উঠলেন, তার সমস্ত চৈতন্য যেন নড়ে উঠল। তার আর মাছের খেলা দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে না; তিনি বিশ্লেষণ করতে পারছেন না, অথচ এর উপস্থিতি তার মন থেকে সরতে চাচ্ছে না। দুরূহ চিন্তার সূত্র ধরে, ঠিকানাহীন আস্তানা খোঁজার মতো, মনহৃদয়ে এর সন্ধান করতে ফিরে এলেন চেয়ারে।

কাজীগিন্নী বেডরুমের দরজা খুলে স্বামীকে ঘুমোতে দেখে খুবই অবাক হলেন, এখন শীত পড়ার কথা নয়, কিন্তু স্বামীকে দেখে বোঝা যাচ্ছে—তার শরীর জুড়ে যেন দীর্ঘনিশ্বাসের পাল উড়িয়ে শীত ভর করেছে। আরামদায়ক আলস্য যেন কম্বলের ভেতর আস্তানা গেড়েছে। আর কাজী, দীর্ঘ ঘুমের পর শরীরে যেমনি আলস্যতা আসে ঠিক তেমনি ভাব নিয়ে উপলব্ধি করছেন কার্পেটের রোমে পা দিয়ে দ্রুতগতিতে কে যেন বিছানার দিকে এগিয়ে আসছে। চোখ খুলে দেখার ইচ্ছে তার নেই, কিন্তু হাঁটার ভঙ্গিতে তিনি ঠিকই বুঝতে পারছেন, তৃপ্তিতে তার অন্তর ভরে উঠল। সেই তৃপ্তি ভেঙে গেল যখন কাজীগিন্নী বললেন, 'আমাকে আগে বললেও তো পারতে, আজ হাজীসাব আসবেন।' কাজী আকাশ থেকে পড়লেন যেন, তার মনেই ছিল না আজ হাজী মজনুর আসার কথা। সেদিন হঠাৎ পার্কে দেখা... হাজী মজনুর মনমরা অবস্থা দেখে তিনি এগিয়ে এসে তার কাছে বসলেন। হাজী মজনু ওভারকোটের ভেতর থেকে হাত বের করে তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'সংসার ত্যাগ করে আজমীর শরিফে

চলে যাব। খাজাবাবার রওজায় বিবাগী বেশে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেব।' হাজী মজনুর পশমে কাজী দেখতে পেলেন বিলাতি সূর্যের ডুবে-যাওয়া আলো। সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে কাজী বললেন, 'ইসলামে কিন্তু বৈরাগ্য নেই।' গাছের ডাল থেকে একটি শুকনো পাতা টুপ করে পড়ে গেল হাজী মজনুর পায়ের কাছে। তিনি তার জুতো দিয়ে পাতাটিকে শুইয়ে দিতে দিতে বললেন, 'অলি-দরবেশ কেউ কি সংসারি ছিলেন?' পার্কের চারদিক ঝাপসা অন্ধকারে ছেয়ে যাচ্ছে, তবুও পাতা ঝরার খেলা আর পাতা মাড়ানোর শব্দ ঠিকই চলছে। গতবছর কাজী এরকম শব্দ প্রায় শুনতেই পাননি; সেই সময় হয়তো পার্কে তার আসা হয়নি, আসার প্রয়োজনও পড়েনি, শুধু পাশ দিয়ে হেঁটে চলে গেছেন। হাজী মজনুর জুতোর দিকে তাকিয়ে কাজী বললেন, 'কেউ কেউ ছিলেন না বটে, যদিও...।' কথা শেষ হল না। তার আনমনা চোখ আপনা থেকে হাজী মজনুর দিকে চলে গেল, বুঝতে পারলেন, তিনি তার দিকে দীর্ঘতর সময় ধরে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। তার দৃষ্টিতে যেন একরকম আশ্চর্য সংকেত লুকিয়ে আছে, নীরব উপাসনাই। কাজী খুব আস্তেধীরে, শান্ত গলায় বললেন, 'অলি-দরবেশের জীবন প্রশংসনীয়, তবুও অনুকরণীয় নয়।' হাজী মজনু তার দৃষ্টি সরিয়ে স্থাপন করলেন বেঞ্চের পায়ে জড়িয়ে থাকা একটি জং-ধরা পুরোনো টিনের কৌটোর ওপর; সমস্ত পৃথিবীর সমস্ত জঞ্জালই যেন এর মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে; সেদিকে তাকিয়েই, বিবর্ণ মুখে বললেন, 'অলি-দরবেশই ভারতবর্ষে ইসলাম ধর্ম প্রচার করেছিলেন।' অবিচলিত গভীর কণ্ঠে কাজী বললেন, 'সত্য বটে, তবে তারা পরগাছা।' অলি-দরবেশের পুণ্যরক্তপ্রবাহ যেন হাজী মজনু তার শিরা-উপশিরায় অনুভব করছেন, আর সেই রক্তসূত্রে কাজীর সঙ্গে তিনি এক ঐক্যসম্বন্ধ কল্পনা করে কিছুটা তৃপ্তি বোধ করতে চাচ্ছেন, যদিও বুঝতে পারছেন যে, তার সঙ্গে কাজীর দুস্তর দূরত্ব আছে, তবুও প্রাণপণ তা অস্বীকার করে বললেন, 'তবুও তো আমরা তাদের কাছে ঋণী।' স্বপ্নসম্ভবাকাঙ্ক্ষার আশ্চর্য প্রকাশ যেন। কল্পনাপ্রসূত আবেগ, বিচারবুদ্ধি বিবশ করা যুক্তি যেন। সর্বশক্তি দিয়ে কাজী নিজেকে দমন করার চেষ্টা করলেন। হাজী মজনু মাটির প্রতিমার মতো শক্ত হয়ে, স্থির নিবাত-নিষ্কম্প দৃষ্টিতে নিশ্চুপ বসে রইলেন। দৃষ্টি তীক্ষ্ণ নয়, সরলরৈখিকও নয়, সুদূর প্রসারিও নয়, নিজের ভালো কীসে হয় এরই প্রকাশ যেন। হাজী মজনু যতই চাচ্ছেন পৃথিবীর জঞ্জাল তার হৃদয় থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে ততই যেন বঞ্চনাযুক্ত কঠিন বাস্তবতা তার চোখ দিয়ে প্রবেশ করে আত্মাকে ধাতবাঘাতে নিঃশেষ করে দিচ্ছে। নিশ্বাসরুদ্ধ নির্বাণোন্মুখ চোখ-দুটোর দিকে তাকিয়ে কাজী বললেন, 'হ্যাঁ ঋণী, তবে সংসার-বিষয়ে অবশ্যই

নয়।' হাজী মজনুর মনের মধ্যে যেন অনেক দিনের নিরুদ্ধ অশ্রুরাশি উচ্ছ্বসিত উদ্বেলিত হয়ে উঠল; বেদনার অস্ফুট আর্তনাদ যেন বেরিয়ে এল তার কণ্ঠ দিয়ে, বললেন, 'অলি-দরবেশকে এমনভাবে অবমূল্যায়ন করা উচিত নয়।' হাজী মজনুর মুখে যেন আশ্রয় নিয়েছে তার জীবনের সমস্ত অনাদৃত ভক্তি আর একজন মাঝি যেভাবে তার জীর্ণক্ষুদ্র তরণী টেনে চলে তারই প্রতিচ্ছবি; এই মুখেই জীবনের বিপুল ক্লান্তিময় রেখাগুলো জেগে উঠেছে; এদের মাঝে চাঁদ আর যমুনা খেলা করতে ভয় পাচ্ছে যেন; বরং সকল দুঃখ, সকল কষ্ট, সকল অবমাননা, সকল অসহ্য সহবাস করছে। এই বাধ্যতামূলক কর্মহীন করুণ মুখের, যেখানে তীর ও তীর্থের সন্ধান পাওয়া অসম্ভব, রহস্য পড়তে পড়তে কাজী বললেন, 'অবশ্যই নয়।' তারপর নিজেকে সংযত করে বললেন, 'তবে তাদের নিয়ে বাড়াবাড়ি করা ঠিক নয়।' পার্কের গাছগুলো বেয়ে ঝাপসা অন্ধকার হাজী মজনুর চোখমুখ ছেয়ে যাচ্ছে। পাতা ঝরার শব্দগুলোও যেন ঘুরে ঘুরে তার কাছে এসে থমকে দাঁড়াচ্ছে। তার সর্বাঙ্গে ব্যাকুলতার তারকাঁটার তরঙ্গ উঠেছে। তিনি মৃত মানুষের মতো চোখ বন্ধ করে অতৃপ্ত অনুভূতিহীন একটি শব্দ প্রকাশ করলেন, 'যেমন?' সঙ্গে সঙ্গে কাজী বললেন, 'নিয়ত করে তাদের মোকাম জিয়ারত করা, বিপদোদ্ধারের উদ্দেশ্যে দরগায় শিরনি মানত করা ইত্যাদি ইত্যাদি।' পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে কাজীর মনে কোনও রকম ভক্তির চিহ্ন আছে কী তা হাজী মজনু সন্ধান করতে লাগলেন, কিন্তু পেলেন না; তাই নীড়হারা, দিশেহারা পাখির মতো বললেন, 'অলি-দরবেশের মেহেরবাণীতে ভক্তের মনোবাঞ্ছণা পূর্ণ হয়—একথা কী একবারও ভেবে দেখবেন না।' হাজী মজনুর ভঙ্গি ও ভাষাতে আকুলতা প্রকাশ পেল, যদিও সন্ধ্যার ঝাপসা অন্ধকারে তার মুখে ব্যথিত মনের একটি অস্বাভাবিক ভারসাম্য, বীভৎস ব্যঙ্গানুকৃতি, ভগ্নকাতর শরীরের কান্নার ছবি সুস্পষ্ট ভাবে ফুটে উঠেছে। কাজী বললেন, 'যাই হোক, অন্ধকার নেমে এসেছে, আমাকে এখন উঠতে হবে।' অন্ধকার ঠিকই ঘন হতে লাগল, তবে হাজী মজনু নিশ্চুপ বসে রইলেন; আর কাজী পার্ক ছাড়তে ছাড়তে বললেন, 'রোববার চলে আসবেন। গিন্নীর হাতে রান্না-করা দেশি-খাবার খেতে খেতে গল্প করা যাবে।'

কাজী এক লাফে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, তারপর ইতস্তত করে বললেন, 'কী করি বলো সব ভুলে বসে আছি। এখন তোমাকেই সামলাতে হবে লক্ষ্মীটি।' কাজীগিন্নী শব্দ করে হেসে উঠলেন। শব্দের বেগে তার শরীর কাঁপতে লাগল।

এই কাঁপন থামানোর জন্য তিনি মুখে আঁচল চেপে বিছানায় বসে পড়লেন, কিন্তু থামল না, যখন থামল তখন বললেন, 'তুমি বিপদে পড়লেই বুঝি আমাকে সামাল দিতে হয়, নইলে আমার কথা তোমার মনেই থাকে না।' আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে এলোমেলো চুলগুলো সামাল দিতে দিতে কাজী তার স্ত্রীর দিকে মিষ্টি হাসি ছুঁড়ে দিলেন। পাকা চুল কম হলেও একেবারে অল্প নয়, তবে এর মাঝেই যেন কেমন এক ব্যক্তিত্ব লুকিয়ে আছে। চিরুনি পরিষ্কার করতে করতে গিন্নীকে আরেকবার দেখে নিলেন। জানালা দিয়ে সূর্যের আলো ভেতরে প্রবেশ করে তার চুলকে নিয়ে ঝিলিমিলির হাট বসিয়েছে; তবে খোঁপাটি কৌশলে, নৈপুণ্যে, সুশৃঙ্খলে বাঁধা।

কাজীগিন্নীর খাবারঘরটি তার খোঁপার মতোই নিখুঁতভাবে সাজানো: বেতের সোফা, কাচের সেন্টার টেবিল, দেওয়ালে সৌখিন কাঠের নকশা; এদের সঙ্গে একটি শোকেসও। হাজী মজনুকে নিয়ে কাজী খাবার-টেবিলে পৌঁছতেই দেখতে পেলেন নানা রঙেঢঙে সাজানো বিভিন্ন রকম খাবার: চাটনি, শুক্ত, মুগডাল, বেগুন ভাজা থেকে শুরু করে কোরমা-পোলাও, মায়া মাছের কাটলেটও। কালো রঙের জলপাই, কৃষ্ণ রঙের কাঁচা-মরিচ, সবুজ রঙের লেবু ও নানা আকারে কাটা শশার টুকরোগুলো সালাদের শোভা বৃদ্ধি করেছে। কাজীগিন্নীর পরিবেশন-কৌশল দেখে চমৎকৃত হলেন হাজী মজনু, তার ঠোঁটের ফাঁকে যেন পাকা ধানের মঞ্জরী ফুটে উঠেছে, এবং তারই উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় ও কলহাস্যে শুরু হল খাবার, গল্পের বন্যা। একসময় হাজী মজনু বললেন, 'সৌদি এয়ারলাইনের জেটেটি সিটে বসতে নিতে-না-নিতেই, নির্দিষ্ট সময়ে, আকাশে উড়ল। যাত্রীদের জন্য ব্যবস্থাপনা বেশ ভালোই ছিল।' বিমানযাত্রা সম্বন্ধে জানার ইচ্ছে নেই কাজীগিন্নীর, তবুও কিছু একটা বলতে হয় তাই বললেন, 'যতসব ঝামেলা সবই যেন বিমানের বেলায়। সার্ভিস একেবারে জঘন্য।' প্রতিবার বাংলাদেশে যাওয়া-আসার সময় হাজী মজনুর যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তা থেকে তিনি বুঝতে পারছেন কাজীগিন্নী কী বললেন, তাই বললেন, 'ঠিকই বলেছেন ভাবী। ১১টার বিমান ছাড়ে ৪টায়। আবার কখনও কখনও পরদিন সকালে। যেমনি বিমানের ব্যবস্থাপনা তেমনি কর্মকর্তারাও।' কাজীগিন্নী নিরীক্ষা করে চলেছেন হাজী মজনুকে, খুঁজে বেড়াচ্ছেন তার জীর্ণ দেহের মধ্যে অন্যের চোখে পছন্দ করার মতো কিছু অবশিষ্ট রয়েছে কী। পেলেনও না। খাবারের থালা থেকে হাজী মজনু চোখ তুলতেই কাজীগিন্নীর আঁখিপল্লব অপ্রস্তুতভাবে কাঁপতে লাগল। সেদিকে

না-তাকিয়েই কাজী বললেন, 'খাবার কেমন ছিল?' হাজী মজনু বললেন, 'ভালোই। খাওয়া-দাওয়ার পর বিনা পয়সায় ছবি দেখার ব্যবস্থাও ছিল, কিন্তু আমার সিট থেকে ছবির পর্দা একটু দূরে থাকায় দেখা হয়নি।' কেমন যেন ছেলেমানুষি সরলতা প্রকাশ পেল, ঠোঁটে যেন পিঠ-চাপড়ানো হাসি ফুটে উঠেছে; তবুও মনের গভীরে বাস করা অস্বস্তি বিলুপ্ত হল না, শুধু নিষ্প্রভ চোখ-দুটো মিটমিটি করতে লাগল—মুখটি দাড়িতে ঢাকা থাকা সত্ত্বেও। হঠাৎ তিনি তার বাঁ-হাতে মাথার টুপি একটু পিছনে ঠেলে দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ পেল কপালের ওপর চা-গাছের গুঁড়ির মতো ঝুলে থাকা আলুথালু চুলগুলো, লজ্জায় কুঁকড়ে গেছে যেন; সেদিকে তাকিয়ে কাজীগিন্নী বললেন, 'আফসোস করার কোনও প্রয়োজন নেই। আপনার ছবি দেখা তো উদ্দেশ্য ছিল না, ছিল জেদ্দায় পৌঁছানো, তাই না! বলুন, জেদ্দা পৌঁছানোর পর কি হল?' হাজী মজনুর চোখে বিন্দু বিন্দু আনন্দ, যেন জেদ্দার স্মৃতি স্বর্গীয় সুখ হিশেবে বুকের তলায় চিরস্থায়ী করে রাখতে চান, বললেন, 'জেদ্দা বিমানবন্দরে, প্লেন থেকে নামার পর, পাসপোর্ট পরীক্ষা করার জন্যে লাইনে দাঁড়ালাম। ব্রিটিশ ও অ্যামেরিকান শাদাদের পাসপোর্ট নিয়ে তেমন ঝামেলা হল না। আমাদেরটা নিয়েই হল, ব্রিটিশ পাসপোর্ট সঙ্গে থাকা সত্ত্বেও। তাদের কাছে ভারত-পাকিস্তান-বাংলাদেশের মানুষ যেন ভিখারির দল। এরকম মনোভাব নিয়েই তারা আমাদের পাসপোর্ট ধীরগতিতে পরীক্ষা করল।' কাজীগিন্নী রান্নাঘরে যাওয়া-আসার পথে চোখ ও কান খোলা রেখে, উৎকর্ণ ও সচকিত হয়ে, অতিথির কথা শুনছেন। কাজী বললেন, 'তারপর।' তারপর তিনি কীভাবে আগত যাত্রীদের জন্য নির্ধারিত স্থানে উপস্থিত হলেন, সে-কথা জানালেন। 'দেখি একজন সেলসম্যান আমার দিকে ঘনঘন তাকাচ্ছে। সে বাঙালি। আরেক বাঙালিকে দেখলাম পোর্টারের কাজে ব্যস্ত। ঝাড়ুদারও বাঙালি ছিল।' প্রবাসী বাঙালির পাঁজরের নিচে যে গোপন অসন্তোষ গুমরে থাকে সেটা কাজীগিন্নী উপলব্ধি করলেন। এসব শ্রমিকদের মুখ ঝলকে উঠল তার চোখের সামনে, বললেন, 'মানুষ পেটের জন্য কিনা করে! হাজার মাইল দূরে এসে ঝাড়ুদারের কাজ করতেও তাদের আপত্তি নেই।' কাজীগিন্নীর কথার গভীর অর্থ আছে, তা কাজীর কাছে স্পষ্ট; তাই তার হৃৎপিণ্ডটি কে যেন উপড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল দূরে, তিনি তার ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হৃৎযন্ত্রটি সযত্নে তুলে নিয়ে বললেন, 'দেনার কবল থেকে মুক্তি পাওয়ার আশায় জমিজমা বিক্রি করে, লক্ষ টাকা খরচ করে, এসব ছেলেরা বাংলাদেশ থেকে সৌদিতে এসেছে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তারা রুটি যোগাড়ের জন্য ঝাড়ুদারের কাজ করছে। কিন্তু সেই ঋণের টাকা কি

সে উদ্ধার করতে পারবে?' হাজী মজনু তার চিন্তান্বিত চোখ-দুটো তুলে সন্ধানী দৃষ্টিতে কাজীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মনে হয় না। এরকম এক ছেলের সঙ্গে আমার কথা হয়ে ছিল। সে বলে যে, চুক্তিতে ছিল হাজার বারো শ' মাত্র, এখন দিচ্ছে পাঁচ শ' রিয়াল। কিচ্ছু বলার উপায় নেই। দেশে ফিরে যাওয়ার পথও নেই। শুধু একটিই সান্ত্বনা—দেশে চাকরি নেই, চাকরি থাকলে বেতন নেই, এখানে অন্ততপক্ষে খেয়েপরে বাঁচা যায়।' 'বাঁচা'-শব্দটি উচ্চারিত হতেই কাজীর মন যেন নড়ে উঠল। তিনি ভেবে চললেন, যে-সমাজ শ্রমিকদের দেখে বেহায়া চোখে, যে-সমাজের শাসকগোষ্ঠী তাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য শ্রমিকদের উপর নৈতিক যতরকম দাসত্ব আছে সবকিছু চাপিয়ে দিয়ে নির্মম অত্যাচার চালায়, সে-সমাজে যতদিন শ্রমিকের অধিকার আদায় করার ক্ষমতা সৃষ্টি না-হবে ততদিন মানুষের আবার বেঁচে থাকা! মানুষের মতো মানুষ হয়ে বাঁচতে হলে প্রয়োজন মনের দাসত্ব, চিন্তার দাসত্ব, দৈহিক দাসত্ব সমাজ থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার ক্ষমতা অর্জন করা। আর একাজটি করতে হলে শ্রমিকদের জানতে হবে তাদের ভূমিকা কী। ওরা যদি এ করতে না-পারে তো মিথ্যা বেঁচে লাভ কী! কাজীগিন্নী রুদ্ধ নিশ্বাসে তাকিয়ে আছেন হাজী মজনুর দিকে, তার মুখের ভঙ্গি অদ্ভুত, তবে চোখ-দুটো যেন অদ্ভুতভাবে বিঁধে রয়েছে কাজীগিন্নীর স্বর্ণের বালা-দুটোর উপর। দৃষ্টিতে প্রকাশ পাচ্ছে এক ধরনের লুব্ধ লোভের আগুন যেন। কাজীও সেদিকে তাকিয়ে আছেন, হঠাৎ বললেন, 'শুনেছি সৌদিতে স্বর্ণ খুবই সস্তা।' হাজী মজনুর চোখ-দুটো জ্বলজ্বল করে উঠল, যেন এরকম দুটো বালা দিয়ে তিনি তার সংসারকে নতুনভাবে ঝালিয়ে নিতে চান; তাই হয়তো দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, 'তা বলতে পারব না, তবে যতসব দোকান দেখেছি তাদের মধ্যে স্বর্ণের দোকানই বেশি ছিল। একইসঙ্গে দেখেছি, নতুন ডিজাইনের অসংখ্য অট্টালিকা।' কাজীগিন্নী তার ভ্রূজোড়া উঁচু করে বললেন, 'নতুন টাকা এলে নতুন কল্পনা তো মনে জাগাই স্বাভাবিক।' একথার উত্তর না-দিয়ে হাজী মজনু বললেন, 'যেখানে আগে খেজুরগাছের মতো একটি গাছ একা দাঁড়িয়ে থাকত, নিঃসহায়ের মতো, সেখানে আজকাল বিজ্ঞানের বদৌলতে ও অ্যামেরিকার সহযোগিতায় সারিবদ্ধ গাছ স্থানে-অস্থানে দাঁড়িয়ে আছে; ফলে মরুভূমিতে ফুল ফুটছে।' কাজীগিন্নী তার প্রতিকৃতি দেখছিলেন খাবারঘরের ঝুলন্ত দর্পণে। আয়নার চারপাশ জুড়ে জমে ছিল ঝাপসা অন্ধকার, তাই হয়তো একবার আয়নার কাছে গিয়ে কর্নার-ল্যাম্প জ্বালিয়ে ফিরে এলেন। কর্নার-ল্যাম্পের আলোতে ঠোঁটের হালকা লিপস্টিক, গলার সরু হার ও কানের কানফুল-দুটো তার চেহারাকে কোমল করে তুলেছে। 'মরুভূমিতে ফুল ফুটছে'

শোনা মাত্র তিনি দ্রুত চোখ ফিরিয়ে নিলেন আয়না থেকে, তারপর বললেন, 'তিন হাজারেরও বেশি রাজপুত্র দ্বারা পরিচালিত সৌদিরাজ্যে কিছুই অসম্ভব নয়।' হাজী মজনু বাঁ-হাত টেবিলের উপর রেখে ডান-হাতের আঙুলগুলো ভাতে অদ্ভুতভাবে ডুবিয়ে নাড়াচাড়া করছেন। একঝলকে এই দৃশ্য ভেঙে গেল যখন তিনি বললেন, 'হ্যাঁ।' তারপর তিনি বাঁ-হাত তুলে মুঠো করে দাড়ি বুলাতে লাগলেন। কাজী সে-দৃশ্য কিছুক্ষণ চুপ করে দেখে নিয়ে বললেন, 'শুনেছি ওদের ছেলেরা বিয়ে করার সময় ভাবী শ্বশুরকে অনেক টাকা উপহার দেয়।' মাথা নেড়ে, মুঠো থেকে দাড়ি ছেড়ে, টেবিলের উপর আবার আগের মতো হাত রেখে বললেন, 'ঠিকই বলেছেন। তবে আজকাল সরকারই প্রত্যেক সৌদি পুরুষকে বিয়ে করার জন্য হাজার হাজার রিয়াল দিয়ে সাহায্য করে।' নারীর প্রতি এমন অপমান কাজীগিন্নীর অনুভূতিকে জর্জরিত করল, তিনি ভাবলেন, নারীকে বন্ধুর আসনে বসানোর পরিবর্তে ভোগ্যপণ্য মনে করা হচ্ছে। নারীকে শুষে, জুলুম করে ক্রীতদাসীর চেয়ে অধম ও হীন ভূমিকায় নামিয়ে পুরুষ শাসিত সমাজ আনন্দ উপভোগ করছে। পুরুষ শাসিত সমাজ-ব্যবস্থা যেন মানবিকতার উপর ধর্ষণ চালিয়ে নারীকে কিছুটা আর্থিক ও সম্পত্তির অংশ দিয়ে কেড়ে নিয়েছে তার অধিকার; এরইসঙ্গে একজন স্বামীকে, টাকার বিনিময়ে, স্ত্রী লাভের সহজ পন্থাটি বাতিয়ে দিয়েছে। পুরুষরা নারীকে পরিণত করেছে পশুতর জীবে। নারী তো আর পুরুষের ক্রীতদাসী নয়। তারপর প্রকাশ্যে অবিচলিত স্বরে বললেন, 'সেদিন খবরের কাগজে সৌদির নারীদের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করতে দেখলাম। পৃথিবীর বিভিন্ন মুসলিম দেশে নারীরা বাইরের কাজে অংশ নিচ্ছে, কিন্তু সৌদির সমাজ-ব্যবস্থায় তাদের কিনা পর্দার আড়ালে বন্দী হয়ে থাকতে হচ্ছে।' হাজী মজনু বললেন, 'নিজের ইচ্ছেয় নয়, বরং রেখে দেওয়া হচ্ছে। তবে দেখেছি, হজ্বের সময় নারী-পুরুষের লোকারণ্য। শাদা, কালো, বাদামি, পীত বর্ণের নারী-পুরুষের অপূর্ব সমাবেশ। আমি অভিভূত হয়েছি। আনন্দে বিস্ময়ে আপ্লুত হয়েছি। সেলাই ছাড়া শাদা পোশাক পরা মানুষের শুভ্রসমুদ্রে হারিয়ে যাওয়া আমার তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে বেজে উঠেছিল—লাইলাহা ইল্লালাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ।' 'শাদা পোশাক' আর 'শুভ্রসমুদ্রে হারিয়ে যাওয়া' কথাগুলো কাজীগিন্নীর অন্তরকে কাঁপিয়ে দিল। তিনি আঁতকে উঠলেন। তার চোখে আতঙ্ক সৃষ্টি হল। বন্ধ হয়ে গেল অতিথির কথা শোনার সব দরজা। তার মগজে স্থান করে নিল মৃত্যুকে ঘিরে অজস্র অর্থহীন কল্পনা—শাদা কাফন, মৃত্যুর পোশাক, উড়ন্ত পাখি, স্বামীর প্রেম, ছেলেমেয়ে, ঘরসংসার, নিঃসঙ্গতা, স্বামীবিহীন জমিন, কান্না-চিৎকার।

কাঁসার থালায় এলোমেলো ভাবে পড়ে থাকা কয়েকটি কাটলেট থেকে একটি তুলে হাজী মজনুর পাতে দিতে দিতে কাজীগিন্নী বললেন, 'আরবের লোকগুলো কি আমাদের মতো ভাত-মাছ খায়?' হাজী মজনু বললেন, 'মাছ নয়। তবে বাঙালির মতোই ভাত পছন্দ করে। মরিচ ছাড়া, অল্প মসলাযুক্ত, প্রচুর ঘি-বাদাম-পেস্তা ব্যবহার করে রান্না করা মাংস ও তরকারির ঝোল। সঙ্গে অবশ্য থাকে মসলাহীন সস, রুচিবর্ধক চাটনি, সিরকাযুক্ত ফুলকপি, গাজর, পেঁয়াজের আচার এবং টমেটো, লেটুশ ও শশার সালাদ। উটের দুধের বিভিন্ন রকমের পনিরও থাকে।' খাবারঘরের জানালা খোলা, তারই সামনে কাজীগিন্নী দাঁড়িয়ে আছেন। শাড়ির বাদামি রঙের আঁচলে জানালা দিয়ে গলিয়ে আসা বিলাতি রোদ আশ্রয় পাচ্ছে। তার দৃষ্টিতে এক ধরনের মুগ্ধতা, কারণ হয়তো তিনি অল্পসময়ে অতিথির জন্য বিপুল আয়োজন করতে পেরেছেন। সযত্নে অতিথিকে পরিবেশন করতে করতে বললেন, 'আপনি কিছুই খাচ্ছেন না। আপনার জন্যেই তো সব তৈরি করা হয়েছে।' একরকম আত্মতৃপ্তিতে হাজী মজনু বললেন, 'বলেন কী ভাবী। খাচ্ছি তো। ভালো হয়েছে বলেই তো শেষ করতে ইচ্ছে হচ্ছে না। স্বাদকে যত সময় ধরে রাখা যায় ততই ভালো, তাই তো গল্প বলাও শেষ করছি না।' সঙ্গে সঙ্গে কাজীগিন্নী বললেন, 'ইস্; তোষামোদ করতে হবে না। খান তো, উদর পূর্তিতে হৃদয়ে ফূর্তি আসে।' একটু থেমে কী যেন কী ভেবে যোগ করলেন, 'কাবার প্রবেশদ্বারে দাঁড়িয়ে তো আর ভাবীর কথা ভাবছিলেন না?' 'না, না আপনার কথা...।' হাজী মজনুর কথা শেষ করতে না-দিয়ে কাজীগিন্নী বললেন, 'আমার কথা তো আর বলছি না, বলছি রেখা ভাবীর কথা।' হৃদয়ে অনিচ্ছের ছোঁয়া লাগল। সৌদির মরুরসনা যেন হাজী মজনুর চোখে লিকলিক করে উঠল। কনকন শীতে পেনশন নির্ভর বিলাতি বৃদ্ধার বেপরোয়া হালত যেন তার চোখেমুখে ফুটে উঠেছে। 'রেখা' শব্দে তিনি যেন খুঁজে পেলেন তাকেই যে সাপ-দংশনে তার অন্তরকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিল। পুরাতন আঘাতই আবার তার মনে টনটন করে উঠল। তিনি যার কারণে নারীজাতির প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ছিলেন ও তাদের প্রতি বীভৎস মনোভাব পোষণ করছিলেন। তবে রেখা জানে, সে মার্জিত ও অহঙ্কারী একজন নারী; তার সুরূপ ও অহঙ্কার হাজী মজনুর দিকে তাকে ফিরতে দেয়নি। হৃদয়ে অনিচ্ছের ছোঁয়া থাকা সত্ত্বেও রেখার মুখ আবারও হাজী মজনুর চোখে ভেসে উঠল, হয়তো তাই বললেন, 'সে তো মিথ্যাবাদী, ফাঁকিবাজ।' পাশ্চাত্ত্যসমাজে রেখার ভালোমন্দ গ্রহণ করার ক্ষমতা ছিল; তবে এই তো নিয়ম যে-কোনও সমাজের মন্দই সহজে মানুষের মনে দাগ কাটে, কারণ জলকে অবনমনে প্রবাহিত হতে মোটেই বেগ পেতে হয় না; শুধু

বাধাগুলো সরিয়ে দিলেই ব্যস্, বইতে থাকে নালায়, তারপর নদীতে; খরস্রোতা হলে তো কথাই নেই! হাজী মজনু বলতে লাগলেন, 'যে আমার মনের আসন ছেড়ে, আমার কথা না-ভেবে ধুলোয় গড়াগড়ি দিতে একটুও গড়িমসি করল না তাকে আপন করে রাখার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা নয় কী!' কাজীগিন্নী নিশ্চুপ, উত্তর কী দিবেন, শুধু ভাবতে লাগলেন, ছোট্ট-বড়ো বাধা-নিষেধ উপেক্ষা করে প্রণয়ডোর যখন স্বাধীনতা নামক স্বাদটিকে বর্ধিত করে তখন শৃঙ্খলতায় আঘাত তো আসবেই; আর প্রণয়ডোর যখন ছিঁড়ে যায় তখন উচ্ছৃঙ্খলতার রাজত্ব সহজেই সৃষ্টি হয়। এই স্বাধীনতার স্বাদকে তরান্বিত করতে রেখা হয়ে উঠল খরস্রোতা। হাজী মজনু ও রেখার মধ্যে প্রথমে সৃষ্টি হয়েছিল ঝগড়া, প্রণয় ভাগ, মনোমালিন্য। তারপর নিজের গৃহে হাজী মজনু হলেন পরবাসী। সন্তান-দুটো নিয়ে মা চিন্তিত, পিতা বিপাকে। এই ব্যর্থতা দুঃসহনীয় বটে, তবে ব্যর্থতা যখন প্রগাঢ় তখনই কোর্টের নির্দেশে মায়ের কাছেই আশ্রয় পেয়ে গেল সন্তান-দুটো। পিতা গাঙচিলের মতো হু-উ-উ করে কাঁদতে কাঁদতে কোর্টের দরজায় মাথা কুটলেন। হাজী মজনুর অন্তর রেখার প্রতি ঈর্ষায় উত্তাল হলেও সন্তান-দুটোর জন্য দ্বিতীয়বার রেখাকে নিয়ে বাস শুরু করলেন। তখনই দেখা দিল আশা ও আনন্দ উছলে পড়া, কূল-অকূল প্লাবিত, ভাদ্রের ভরা নদী যেন। রেখা ড্রাইভ করে নিয়ে যাচ্ছে হাজী মজনুকে নজরুল সেন্টারে, বাঙালি-কৃষ্টি শিক্ষা দিতে। কিন্তু হায়! কয়লাখনিতে পতিত শ্রমিককে যদি উদ্ধার করা হয় তবে কী তার আগের শ্রী ফিরে পাওয়া যায় বা প্যারকিনসন রোগে আক্রান্ত মানুষের দেহকে কী ব্রেন আর নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে। না, পারে না। কাশি দিয়ে মজনু বললেন, 'অদৃষ্টের ভুল।' কাজীগিন্নী ভেবে চললেন, হায় অদৃষ্ট নামীয় জীব। তোমাকে ভীমরতি ধরেছে কিনা ঠিক জানি না। তবে এটুকু জানি, তুমি হঠাৎ বেঁকে না-বসলে দুটো প্রাণী মানসিক যন্ত্রণা থেকে রেহাই পেত। তোমাকে প্রসন্ন দৃষ্টিতে দেখত। ধন্যবাদ দিত। কিন্তু তুমি এতে সন্তুষ্ট ছিলে না। তোমার আর সাধ ছিল না কলুর বলদের মতো ঘানি টানতে। তাই তো তুমি বেঁকে বসলে। সত্যি কি তাই? না, তুমি পরচিত্তরঞ্জন শেখ মুজিব, সকলের আবদার রাখতে গিয়ে কাউকে খুশি করতে পারলেন না। আসলে মানুষ নিজের ব্যর্থতার বোঝা তোমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে হালকা হয়ে 'ভু' বাজিয়ে চলতে চায়, তাই তারা নিজের প্রয়োজনে তোমাকে সৃষ্টি করে গোলাম খাটছে নিজে। তারপর কাজীগিন্নী আশ্চর্য থমথমে গলায় বললেন, 'নতুন ভাবীর কথাও ভাবেননি?' হাজী মজনুর হৃদয়ে ঝলমল করে ভেসে উঠল দুধশাদা এক নারীর ছবি। সন্ধ্যার ঘনান্ধকারে, দূর বিস্তীর্ণ প্রান্তরে যেমনি তারারা ঝলমল করে ওঠে তেমনি তার চোখে

মরুমর্ত্যের আনন্দের একটি অপরূপ রঙধনু দেখা দিল। নিজেকে সংবরণ করে বললেন, 'সেই পবিত্র স্থানে একমাত্র পরামাত্মা ব্যতীত আর কারো কথা ভাবার সুযোগ ছিল না।' কাজীগিন্নী কিছুই বললেন না; হাজী মজনুর মুখ দেখে কাজী অবশ্যি বুঝতে পারলেন যে, মরুসন্ধ্যার ঘোরেও তার হৃদয়ে ঠিকই বসত করছিল এক 'লাইলি'র ঝাপসা ছবি; প্রভুর ধ্যানের বদলে প্রিয় বিশেষ এক মানবীর মুখ, যা মনে করে তিনি তার বিচ্ছেদ-যন্ত্রণার উপশম অনুভব করছিলেন, হয়তো তার বুদ্ধিবোধ তখন মরুভূমির তপ্ত বাতাসে ঘুলিয়ে গিয়েছিল, শরীর তো আগেই ছিঁড়ে গিয়েছে; তবে কাজী তার মনের কথা গোপন রেখে হাতের গ্লাশটি টেবিলের ওপর শব্দ করে রাখলেন। এই শব্দে কাজীগিন্নীর মন চলে গেল অতীতে, নতুন সংসার পাতার ইন্ধন যুগিয়ে ছিলেন হাজী মজনুর আম্মা, দেশ থেকে বিলাতে আসার পর। তিনি গরলরস ঢাললেন ছেলের কানে। মিথ্যা সান্ত্বনায়, অলীক কল্পনায়—মা গড়তে থাকেন ছেলের ভবিষ্যৎ; তিনি তার ছোটছেলের সপ্তম শালীর সঙ্গে বড়ছেলের মঙ্গলশাঁখা বাঁধার চেষ্টায় প্রলুব্ধ হলেন। মায়ের আশা এতে ছোটছেলের সংসারকে সমৃদ্ধ করবে বড়ছেলে। তিনি রেখার বিরুদ্ধে বিরূপ সমালোচনায় ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, ফলে ছেলের মন বিস্বাদে ভরে উঠল। নিজের মনের বাসনা পূরণের জন্য ছেলেকে পাঠিয়ে দিলেন হজ্বে, আর নিজে চলে গেলেন বাংলাদেশে। পুণ্যসঞ্চয় পর্ব সমাধান করে ভাইয়ের শালীর স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকা মজনু যখন দেশে এলেন তখন তিনি তাকে লাভ করার জন্য বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন। দেখতে দেখতে চাকুরির তাড়নায় তিনি আবার লন্ডন ফিরে এলেন, তবে তার নব শ্বশুরবাড়িতে কাশ্মিরি শাল আর বেনারসি শাড়ি পাঠানো বহাল রইল। হঠাৎ কাজীগিন্নী শুনতে পেলেন হাজী মজনু বলছেন, 'কাউকে পরিপূর্ণ রূপে পেতে হলে নিজেকে সমর্পণ করতে হয় অন্তরের সব জঞ্জাল জলাঞ্জলি দিয়ে। তাকে উদাত্তভাবে আহ্বান করতে হয় একক অভিলাষে।' কাজীগিন্নী স্থির, স্তব্ধ, নিশ্চুপ। তার মনের পর্দায় ভেসে বেড়াচ্ছে জৈন্তা পরগনার মেয়ে রেখার কাহিনী। তার দাবি ছিল ভীমরতির দোষে বিয়ে করা ছোট-ভাইয়ের শালীকে ত্যাগ করতে হবে অবিলম্বে। এই সিদ্ধান্তে তিনি পৌঁছতে অক্ষম হওয়ায় শুরু হল আবার মতানৈক্য, কথা কাটাকাটি, শেষ অবধি রাগারাগি; আর রাগের পরিণতিতে যা হওয়ার কথা তাই ঘটল। যুবদলের সঙ্গে বহির্বিশ্বে বিচরণ করতে লাগল রেখা। এতে হাজী মজনুর দেহাভ্যন্তরে দাবানল জ্বলে উঠল। রেখার সঙ্গে সহবাস করা হয়ে ওঠে অসহ্য, অসম্ভব। পুড়ে গেল রেখার সঙ্গে দ্বিতীয়বার সাজানো সাধের সংসারটি। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে পুরোপুরি ছেদ ঘটল। এক সন্ধ্যায়, সন্তান-দুটো নিয়ে রেখা

এক নবীন এঞ্জিনের সাহায্যে ও যুবক-পাখায় ভর দিয়ে উড়ে গেল; নতুন প্রেম লাভের, ঘর বাঁধার এবং পুরুষচিত্ত জয় করার আশায়। কাজীগিন্নীর অনিচ্ছে সত্ত্বেও ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এল, 'সত্যি রেখা ভাবীর আচরণে আশ্চর্য না-হয়ে পারা যায় না। এমন সোনার সংসার...।' বাধা দিয়ে হাজী মজনু বললেন, 'থাক্ ভাবী এসব কথা। ক্ষত স্থানে আঁচড় কেটে নিজেকে আবার নতুন করে আহত করতে চাই না।' তার মুখে এমন কথা প্রকাশ পেতে পারে, তা ভেবে কাজীগিন্নী সংকোচ বোধ করলেন। আর স্ত্রীর ভুল বুঝতে পেরে কাজী তাড়াতাড়ি বললেন, 'আপনি আসায় আজ চমৎকার খাবার হল। চলুন হাত-মুখ ক্লিন করে আসা যাক।' খাবার শেষে হাজী মজনু বাথরুমে গেলেন, ফিরেও এলেন, কিন্তু গল্প আর জমে উঠল না; শুধু একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'বর্তমান অবস্থায় আমার কি করা উচিত?' হঠাৎ বিড়ালটি খাবারঘরে এসে উপস্থিত হল। ঘন কুয়াশা যেন নেমে এসেছে তার পশমে। তারই ওপর একঝলক জড়বৎ রোদ যেন অভিশাপের বোঝা হয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে কাজীগিন্নী দাঁড়িয়ে রইলেন প্রস্তরবৎ। আর হাজী মজনুর প্রশ্নের উত্তরের সন্ধান করার চেষ্টা করলেন কাজী, কিন্তু তার মগজ ক্রিয়াহীন; অনুভূতি নিস্তেজ, নিশ্চল। সময় নিজের নিয়মেই এগুতে লাগল।

নী লা

স্বাভাবিক বাঙালি শ্যামলা-উজ্জ্বল আভায় উদ্ভাসিত মুখাবয়ব, বাঙালিসুলভ লাজনম্র স্বভাবপ্রকৃতির মেয়েটি অপরিচিত পুরুষের মুখোমুখি বসতে পারছে না, শালীনতায় বাধে, আবার পেছন ফিরেও না, ভদ্রতা বলে একটা কথা আছে না, তাই বসেছে পাশ ফিরে। মুখমণ্ডলের দক্ষিণপাশ মদচ্ছির আলীর নজরে পড়ল: নাকে সোনার ফুল, বড় হওয়া সত্ত্বেও বেমানান মনে হচ্ছে না, বরং আলোকিতই দেখাচ্ছে। বাঙালির নাক আর্যদের মতো উন্নত নয়, আবার চীনের মতো চাপা-বেঁটেও না, বরং মাঝামাঝি একটি আকার বেছে নিয়েছে; এই বাঙালি নাকে মেয়েটিকে মানিয়েছে বেশ। তার মাঝারি আকৃতির মুখ, প্রায় গোলগাল, তবে মেইকাপ ক্রিমের সুরভি ঠিকই প্রকাশ পাচ্ছে। তার কানে সোনার দোল, এতে দৃষ্টি নন্দিত হয়, ভালোই লাগে। গোলগলার হাফহাতা ব্লাউজের সঙ্গে তার মণিপুরী তাঁতের শাড়ি চয়নে ও পরনে রুচির পরিচয় পরিস্ফুটিত, মানিয়েছে চমৎকার। বাস্তবিকই সে সুন্দরী। কিছুক্ষণ ধরে কাচের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে মেয়েটি—অর্থাৎ নীলা, যাকে ঘিরে বসারঘরে একরকম অদ্ভুত নিঃস্তব্ধতার তরঙ্গ বইছে। তারই পাশে এবং মদচ্ছির আলীর মুখোমুখি বসা বশর খান—কিন্তু কেউ কারো দিকে তাকাচ্ছেন না, কোনও কথাও নয়। বশর খানের চাউনি যেন অপহৃত গৃহস্থের গৃহের মতো শূন্য, তবে এলোমেলো; তিনিই একসময় নীরবতা ভাঙলেন, 'বড়ো আশা নিয়ে ভাতিজিকে কলেজে ভর্তি করেছিলাম। কিন্তু পড়া হল কই! তার বাবা প্রলোভনে পড়ে আমাকে না-জানিয়ে বয়স্ক একজন লন্ডনির কাছে রাতারাতি বিয়ে দিয়ে দিলেন। উদ্দেশ্য ছিল মেয়ের স্বামীর বদৌলতে ছেলেকে বিলাত পাঠিয়ে টাকার আফসোস মিটিয়ে নেবেন। আমি তো আর আগের মতো তার মিষ্টি কথায় আঁটি বেঁধে টাকা পাঠাতে পারি না তাই।' নীলার চাচা বশর খান দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন, হৃতসর্বস্ব পথচারীর মতো। তিনি বলে যেতে লাগলেন তার কথা, কখনও তিনি রেগে আগুন, কথা নয় যেন স্ফুলিঙ্গ, প্রতিপক্ষকে কাছে পেলে হনুমানকাণ্ড বাঁধিয়ে দিতে পরোয়া করবেন না; আবার কখনও দুঃখভরা অন্তরে ভেঙে পড়ছেন, যেন আলসারের ব্যথায় মোচড় দিয়ে উঠছেন। তার বক্তব্যের গভীরতা ও গাম্ভীর্যতা লক্ষ্য করে মদচ্ছির আলী থমকে গেলেন, কিছুই বলতে পারলেন না। মদচ্ছির আলী নিশ্চুপ বলেই হয়তো বশর খান তার ডান-পকেট থেকে সিগারেটের একটি প্যাকেট বের করে বাঁ-পকেটে হাত ঢুকিয়ে একমুহূর্ত স্থির হয়ে কী যেন খুঁজতে লাগলেন,

দিয়াশলাইয়ের বাক্সই হবে, কিন্তু তার হাত বেরিয়ে এল না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর যখন তার খালি হাতটি বেরিয়ে এল তখন তিনি বললেন, 'যে-মেয়ে বংশের মুখ উজ্জ্বল করবে বলে আশা ছিল আজ তার কারণেই ইজ্জত যায় যায়, যেটুকু ছিল সবটুকু।' চাচার কথায় নীলা নিজেকে ভীষণ অসহায় মনে করল, তবে সে ঠিকই বুঝতে পারছে তার চাচার অন্তরের ব্যথা ও যন্ত্রণা কতটুকু গভীর ও ব্যাপক, তাই হয়তো মুখের মতো তার চোখ-দুটোও লাল হয়ে উঠেছে। নীলার ভিতরে অনেক বিক্ষোভ অভিমান আর ঘৃণা পুঞ্জীভূত হয়ে আছে। সে যেন কোনও দিনই কারো কাছ থেকে ভালোবাসা পায়নি; তার স্বামীর কাছ থেকেও না, না পেয়েছিল, ঠিক বুঝতে পারছে না। স্বামী কী কোনও দিন তার জন্য অপেক্ষা করেছিল, তার মনে পড়ছে না, হয়তো সারা জীবন সে-ই তার স্বামীর জন্য অপেক্ষা করেছে। মেঘ ও জ্যোৎস্নার খেলার মতো, বোবার কথা বলার ইচ্ছের মতো সে তাদের দাম্পত্য-জীবনের অন্তরঙ্গ মুহূর্তগুলো হৃদয়ে সযত্নে ধরে রেখেছে। মদচ্ছির আলী, অল্প সময়ের মধ্যেই, নীলার মনের কথা অনুমান করে এবং তার পরিবর্তন লক্ষ্য করে বললেন, 'মেয়েটি ভুল করেছে তবে সর্বনাশ কিছুই করেনি। ভুলকে বিস্মৃতির অতলে ফেলে, সৎসাহসে, সংশোধন করে নিলেই হয়।' মদচ্ছির আলীর দৃষ্টি নীলাকে পেরিয়ে জানালায় গিয়ে স্থির হল। বিলাতে শীতের সন্ধ্যা আসে খুব দ্রুত, চারটে সাড়ে চারটের মধ্যেই প্রকৃতি যেন অন্ধকারের দখলে চলে যায়। তিনি জানালার পাশে গিয়ে ভারি পর্দা টানতে-না-টানতেই তার দৃষ্টি চলে গেল বাইরে, অন্ধকার আর বৃষ্টিতে, বৃষ্টি আর অন্ধকারে। দূরে দু-একটি আলো জ্বলছে। সেদিকে তাকিয়ে তিনি যোগ করলেন, 'কী বলো গো মা!' হঠাৎ এমনি ধরনের প্রশ্নের জন্য নীলা প্রস্তুত ছিল না। আচমকা এই প্রশ্নে সে চমকে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে সচেতন হতে চাইল, তাই ঠোঁটের ফাঁকে ছোট্ট একটি শব্দ অস্ফুটভাবে বেরিয়ে এল, 'জি।' শব্দটি সম্মতিসূচক বা প্রশ্নবোধক বা দুয়ের মধ্যকার একটি অর্থ বোঝানোর জন্য সংক্ষিপ্ত উচ্চারণ হতে পারে। সে নিজেই বুঝতে পারেনি কী বলতে চেয়েছিল, কিন্তু কিছু একটা না-বললেই নয়, তাই এ-ধরনের 'জি' তার কণ্ঠে প্রকাশ পেল। মদচ্ছির আলী বললেন, 'তুমি হয়তো ভাবছো স্বামীর স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে, পিতার স্বার্থপরতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে প্রতিশোধ নেবে, কিন্তু এ-যে হবে নিজের নাক কেটে অন্যের যাত্রা ভঙ্গ করা!' একথায় নীলা ধাক্কা খেল, বুকের মধ্যে গভীর দাগ কাটল। সে অবাক! এতদিন যাকে ভুলে থাকার জন্য শুধু স্মৃতির পাতা নাড়াচাড়া করেছে, কাজীর এই সামান্য কথায়, এইমুহূর্তে তার বুকের মধ্যে তোলপাড় শুরু হল কেন? তার মুখ জুড়ে কেন চাপাছায়া ঘনিয়ে

উঠল? এই মুখ দেখে মদচ্ছির আলী দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, 'আমি একথা একমুহূর্তের জন্যও বিশ্বাস করতে পারি না যে, তুমি অন্যকে ভালোবেসে বিংশ শতাব্দীর জোলেখার অভিনয় করছো! বরং বলবো সেই লোকটি, যাকে তুমি আপন মনে করছো, তার কুমতলব হাসিল করার জন্য তোমার অতৃপ্ত মনে ইন্ধন যুগিয়ে তোমাকে আসক্ত করার চেষ্টা করছে। তাই বলি, তোমার কী উচিত স্বামীকে শায়েস্তা করার লক্ষ্যে শয়তানের আশ্রয় নেওয়া।' নীলার মনে শর নিক্ষিপ্ত হল, যেন এইমুহূর্তে সে তার স্বামীকে দেখতে এবং দেখা দিতে চায়। তার ডাগর অবাক পলকহীন চোখ-দুটোতে মদচ্ছির আলী দেখতে পেলেন, স্মৃতির এক আশ্চর্য তরঙ্গ, যেখানে মাথাখুঁড়ে মরছে লজ্জা, অভিমান, হয়তো-বা কিছুটা অপমানের ছায়াও। মদচ্ছির আলীর অন্তর নড়ে উঠল, অবাক লাগল তার—মেয়েটি অসহায় অবস্থার শিকার; তাই হয়তো সে ভেবে বসেছে, জীবনের কাছে হেরে গেছে। অথচ...। রান্নাঘর থেকে ভেসে আসা কেতলির ফোঁস ফোঁস শব্দে, সরু মুখ দিয়ে হয়তো-বা ধোঁয়া বেরোচ্ছে, মদচ্ছির আলী চা-নাস্তার তাগিদ দিয়ে নীলার তকদির তলিয়ে দেখার তদবীরে লেগে যাওয়ার জন্য মনস্থির করলেন। তিনি নীলার মুখের দিকে তাকাতেই দেখতে পেলেন, সে কী যেন বলতে চাচ্ছে, কিন্তু পারছে না, গলায় আটকে যাচ্ছে। একটি নারী এ-জীবনে কীই-বা পেতে পারে! তার বুকের মধ্যে কেমন যেন এক ব্যথা কনকন করছে। ফেলে-আসা স্বামীর কথা, সহস্র দীর্ঘশ্বাস, লুকানো কান্না, অসহ্য যন্ত্রণা, তীব্র অভিমান—সবকিছু মিলে তার অন্তর যেন পাথরবৎ। অন্যদিকে আসবাবপত্রের উপর চোখ বুলাচ্ছেন বশর খান : দামি কার্পেটে মোড়া মেঝে, ভারি পর্দায় ঢাকা জানালা, সারি সারি বইতে ভরা আলমারি; কিন্তু প্রকাশ্যে কিছুই বলছেন না, তাই হয়তো মদচ্ছির আলী বললেন, 'তোমাকে বোঝাতে চাচ্ছি যে, ভুল আমরা সবাই করি, তুমিও হয়তো করেছো। এখন শোধরে নিলেই হয়।' মদচ্ছির আলীর কাছে মন উজাড় করে নিজের কথা বলতে চায় নীলা, কিন্তু পারছে কই, তাই হয়তো মাথা নত করে আছে। ক্ষতবিক্ষত মন ও দেহ নিয়ে সে যেন ডুবে-যাওয়া জীবের মতো খড়কুটো আঁকড়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা করছে। সে মাথা যখন তুলল তখন দেখা গেল ভিজে গেছে তার শাড়ির আঁচল। সে নিশ্চুপ। হয়তো তার মন ছুটে বেড়াচ্ছে স্বামীর উদ্দেশ্যে। তার মাথায় যথেষ্ট ভাবনা, কিন্তু মগজ শূন্য, বুদ্ধি বিকল। মানুষ কী তার রক্তমাংসকে ভুলতে পারে, তবে নীলার মাঝে কোনও রক্তমাংসের অহঙ্কার নেই, সে রক্তমাংসকে চিনতে চায় না, চাইলেই বরং কষ্ট বাড়ে, গোপনে হৃদয়ে আঘাত লাগে; কাকে সত্য বলবে, নিজেকে না স্বামীকে। অদ্ভুত ব্যাপার! মদচ্ছির আলী

চশমার ফাঁকে দেখে নিলেন নীলাকে আর একবার; তার ললাটে ঘাম লেপটে আছে, ভ্রুতে অদ্ভুত শিশির, কপালের ভাঁজে বিচিত্রময় রেখার সমাবেশ, দৃষ্টিতে জীবন-যুদ্ধে অপরাজিত হওয়ার তীব্র দাহ, যেন তার অন্তর জুড়ে স্বামীরই রাজত্ব চলছে। নীলার স্বামী আলী আহমদ। তিনি পঞ্চশের কোঠোয় পা দিয়ে স্পষ্টই দেখতে পেলেন তার অর্ধেকের চেয়ে কম বয়সের স্ত্রীর কান ও চোখ খুলে গিয়েছে; অবশ্য অনেক আগেই খুলে ছিল, পাশ্চাত্ত্যকৃষ্টির বাহ্যাড়ম্বরের বাদ্যধ্বনি শ্রবণে ও বিলাতি সংযমহীন স্বাধীনতার চোখ-ঝলসানো চাকচিক্যে। একসময় আলী আহমদ তার স্ত্রীর ভারসাম্য রক্ষায় অপারগ হয়ে উঠেন। তাদের দাম্পত্যজীবন কতটুকু গরলতায় স্থাপিত তা উদ্‌ঘাটিত হয় যখন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার প্রীতিপর্দা অপসারণে নীলার চুপিসারে সম্পাদিত কার্যাবলী সম্বন্ধে তিনি অবগত হন। তবুও তিনি নীলাকে বিশ্বাস করতেন, অবিশ্বাস করার মতো তার সাহস ছিল না, যদিও এসব অবলোকনের জন্য দিব্যদৃষ্টির প্রয়োজন ছিল না। পারিবারিক শান্তি রক্ষার জন্যে স্ত্রীর ওপর আস্থা রাখা উচিত—এমন কথাই তিনি বিশ্বাস করতেন; আর বিশ্বাস করতেন নিজ কানে শোনা সবকিছু, যদিও এতে লোকে তাকে স্ত্রৈণ বলত। তিনি ভাবতেন তার দুর্বলতার কথা, মাথায় থাকত জগতের চিন্তা। নিজের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করা ছাড়া আর কীই-বা করার ছিল তার! কখনও কখনও ত্রুটিপূর্ণ সম্পর্কের ফাঁক পূরণের জন্য বন্ধুজনের শরণাপন্ন হতেন, কিন্তু তাদের অশোভন উপদেশ উপেক্ষা করে নিজের মন ও আত্মাকে আত্মশক্তি দিয়ে শাসন করতেন। লেবার-মার্কেট সঙ্কুচিত করার অভাবনীয় কলাকৌশল অবলম্বন করে ম্যার্গারেট থ্যাচারের টোরি-সরকার ক্রমশ যে বেকারসংখ্যা বাড়িয়ে ছিল তা সবার আগে আঘাত করে আলী আহমদের মতো প্রবাসী বাঙালিকে। বেকারজীবনের গ্লানি থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্য তিনি কাজ নিয়েছিলেন বদরুলের রেস্তোরাঁয়। সেই থেকে তার বাসায় বদরুলের আসা-যাওয়া শুরু হয়। কিন্তু আলী আহমদের দুর্বলতার সুযোগ নেহাত বদ উদ্দেশ্যে সে নিয়েছিল। সে প্রথম প্রথম আসত ফলমূল নিয়ে, হাসিমুখে তুলে দিত নীলার হাতে। আশকারা পেয়ে কোথাকার জল কোথায় গড়াল, আল্লাহ মালুম। বদরুলের শঠের হঠকারিতা ছিল সীমাহীন। কোকিলবেশে সে কাউন্সিল ওয়েলফেরার অফিসারকে অয়েল লাগিয়ে নীলাকে গৃহহীন শো করিয়ে স্থান করে দেয় বেড-এ্যান্ড-ব্রেকফাস্টে। তারপর হাউজিং অফিসার দ্বারা নোটিশ দিয়ে আলী আহমদকে বাড়ি-ছাড়া করে। তিনি সর্বহারা হলেন, মাথাগুঁজোর স্থানটুকু হারিয়ে ফেললেন, সঙ্গে সম্মানটুকুও। গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টিতে ঢালু রাস্তা সহজেই পিচ্ছিল হয়, অসাবধানে পা ফেললে তো আর রক্ষা নেই!

চা যে বরফ হয়ে যাচ্ছে সেদিকে খেয়াল নেই নীলার। মদচ্ছির আলীও তন্ময় হয়ে দেখছেন তাকে, তার মুখ কখনও দুঃখের মেঘে আড়াল হয়ে যাচ্ছে, আবার কখনও শ্রবণের অজস্র-বৃষ্টিকণা যেন দখল করে নিচ্ছে তার চোখ-দুটোকে, আবার কখনও ধূসর রঙে রাঙিয়ে উঠছে তার দৃষ্টি। চমকে উঠলেন মদচ্ছির আলী। নীলার জীবনের ওপর দিয়ে যে ঝড় বইছে, এতে তার দেহমন তছনছ হয়ে গেছে, যেন বাতাসে দুল-খাওয়া বাবুইপাখির বাসার মতো দোদুল্যমান; তার সাধের সংসার শেষকালে গরলে ভরিয়ে দিল বদরুল। তার অন্তরসিন্ধুতে যে স্বর্ণমুদ্রা সযত্নে রক্ষিত ছিল, সংগোপনে, তা মেকি বলে আচমকা প্রমাণিত হল; যে-বিশ্বাসের ভিত্তিতে তার অট্টালিকা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এর যেন আকস্মিক পতন ঘটল। সে এখন দিশেহারা। ধ্বংসস্তূপের ওপর অবস্থানরত নীলার মানসিক অবস্থা ভেবে শিউরে উঠলেন মদচ্ছির আলী। তার কেন যেন মনে হচ্ছে বিলাতের অনেক পরিবারেই এরকম গল্পের চল আছে, কিছু কিছু মানুষের মুখের ওপর এরকম গল্পের শুদ্ধকিরণ আপন লীলায় খেলা করে। যদিও গল্পের স্বাদ তাদের মুখ দেখে বোঝা যায় না, তবুও চোখ দেখে পান করা যায়, এ-যে লাঞ্ছিত প্রবাসী বাঙালির জীবনের দুঃসহ বাস্তবতা, একলা বয়ে বেড়ানো ছাড়া উপায় কী! মদচ্ছির আলীর চোখে যেন সহানুভূতি ও সাহায্যের প্রতিশ্রুতির রেখা ফুটে উঠেছে, এ-যেন নীলার শুষ্কপীড়িত জীবনের জন্য একপশলা বৃষ্টি। এ-যেন নীলার হৃদয়কে করেছে মেঘাবৃত ব্যাঙডাকা বিকালের প্রস্ফুটিত ঝিঙেফুল। তাই হয়তো নীলার ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটে উঠেছে। বৃষ্টির দাপটে ভেজানো কপাটের ফাঁকে একটুকরো হিমেল হাওয়া ফুরুৎ করে ঘরে প্রবেশ করল। তারপর দেওয়ালে টাঙানো বাংলার জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের তৈলচিত্রটির ওপর আঘাত করল, সঙ্গে সঙ্গে সেটি ঝনাৎ করে ভূপতিত হল। ত্বরিৎ বেগে নীলা চিত্রটি তুলে নিয়ে জলদগম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'বর্তমান অবস্থায় আমার করণীয় কী ভেবে পাচ্ছি না, তাই আমি আপনার খেদমতে হাজির হয়েছি।' মদচ্ছির আলী বুঝতে পারলেন, নীলা তার অন্তরের গোপন কথা প্রকাশ করে তার হৃদয়ে সৃষ্টি হওয়া প্রচণ্ড চাপ থেকে মুক্তি পেতে চায়, কিন্তু তার জীবনে এমন কোনও মরমী লোক নেই যাকে সে এসব কথা শোনবে। নীলা অস্বাভাবিক অস্বস্তি বোধ করছে। তার যন্ত্রণাময় জীবন যেন এক কাঁটাওয়ালা বিষাক্ত ফুল, পৃথিবীর পরিত্যক্ত বস্তু। গভীর অরণ্যে, কাঁটাঝোপে যেন তার বসতি। নীলার জীবনের সীমানা তার কাছে অজানা থাকলেও সে কারো কাছে নতজানু হয়ে ক্ষমা চাইতে পারে না, এমনকি তার বুকে স্বামীবিহীন জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত হাপর মারলেও না; বেদনার ঝাপটে হৃদয় ছিঁড়ে একাকার

হয়ে গেলেও না; নিশিথে যদিও সে তার স্বামীর সঙ্গে যৌনস্পৃহার সময়গুলো উপলব্ধি করে সর্বাঙ্গময় তবুও না। এসব কথা কাউকে বুঝিয়ে বলতে পারে না নীলা, তাই হয়তো ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে মদচ্ছির আলীর দিকে। তার দৃষ্টি করুণ। এই করুণ দৃষ্টির কারণেই মদচ্ছির আলীর অন্তরের ঠিক মাঝখানে, অদ্ভুত চাপাপড়া একটি পাথর ভেদ করে, মুখে বলা যায় না এমন এক যন্ত্রণা আঁচড় কাটতে লাগল। যন্ত্রণা যখন তার নিয়ন্ত্রণে এল তখন বললেন, 'তোমার স্বামী যে-ভুল করেছে তা সে সংশোধন করে নেবে। তুমি যা চাও তাকে বুঝিয়ে বললে অবশ্যই তিনি তা দেবেন। তার কাছে তোমাকে না-দেওয়ার কিছুই থাকতে পারে না।' সঙ্গে সঙ্গে নীলা মনোনিবেশ করল তার অতীতে। তখন সে তার স্বামীর সামনে ছিল ভিখারিণী। নিজেকে ভেবেছে বঞ্চিত, দুঃখী, নিঃসঙ্গ নারী হিশেবে। সে তার বিক্ষুব্ধ অন্তরের অসহ্য দাহকে শীতল করতে যেন জানালার পর্দার ফাঁকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করল দূরে—অন্ধকার আর বৃষ্টিতে, বৃষ্টি আর অন্ধকারে। অন্ধকার শুধু ভয় দেখায় না, এর মধ্যে নিরাময় শক্তিও নিহিত থাকে, সাধারণ দৃষ্টিতে তা ধরা পড়ে না, বোঝানোও যায় না, বোঝা শ্রমসাধ্য, অনুমোদিত ব্যবস্থা সাপেক্ষ, প্রকৃতির নিগূঢ় সত্তার জটিলতায় আবদ্ধ; তবে এর সাধনে মানুষ শান্তি পায় এবং পরমানন্দের অবস্থানে উত্তীর্ণ হয়, কারণ অন্ধকার হচ্ছে মহাসত্যের সোপান, শৃঙ্গের অবারিত প্রহরীমুক্ত দ্বার। এই অন্ধকারই নীলাকে শক্তি দিল; অভিজ্ঞতা মানুষকে বিবেচক ও সত্য-সন্ধানে অনুসন্ধানী করে তুলে। আগামীতে সে তার স্বামীর সামনে ভিন্নরূপে দাঁড়াবে। নীলা তাকাল মদচ্ছির আলীর দিকে, আঁচল আঙুলে জড়িয়ে নিশ্চপে মনে মনে বলতে লাগল, আমরা যেখানে থাকি, দেশে বা প্রবাসে যেভাবেই থাকি, মনের অবস্থা যাই হোক সেটাই আমাদের দেশ, আমাদের বাড়ি, আমাদের আবাস—আমাদের জীবনই এরকম! রান্নাঘর থেকে থালা-বাটির টুংটাং আওয়াজ ভেসে এল। সেই শব্দের মাঝেই সে খুঁজতে লাগল, এক যুগের ব্যবধান নিয়ে দুটো জীবন একসঙ্গে বসবাস করলে কী হয়! প্রতিনিয়ত ছোট-বড়ো বাধাবিপত্তি থাকেই। সামান্য আপত্তিতে দুর্বলভিত্ত উত্তাপিত হয়ই। সংসার অঙ্গনে উত্তাপ সৃষ্টি হয়ই। নিশ্বাস নেওয়া কষ্টকর হয়ে ওঠেই। এরসঙ্গে যদি একজন চায় লায়লী-মজনুর খেলা আর অন্যজন ফকিরী মেলা, অমিলের অংশই বেশি, তখন দাম্পত্যজীবন সহজলভ্য হয় না, বরং জটিলই হয়। নীলার অন্তরাকাশে এমুহূর্তে মেঘের কোনও চিহ্ন না-থাকলেও ফাল্গুনের কোকিল ডাকা মনোরম মলয়ানীল সকালের আহ্বানের কোনও ইঙ্গিত পাওয়া গেল না। মদচ্ছির আলীর মন্তব্যে তার আহতান্তরে নব জীবন রচনা করার স্পৃহা জেগে না উঠলেও ঠিকই তার হৃদয়ের

একাংশ নবদীপ্তিতে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হতে লাগল।

সংযোজন

১.

আধুনিক ছোটগল্পের জন্ম বিংশ-শতাব্দিতেই। ফরাসি দেশে সূচনা হওয়ার পর ইংরেজি হয়ে বাংলায় এর উদ্ভব ঘটে। পাশ্চাত্যের আধুনিক ছোটগল্পের গুরুগোষ্ঠী হচ্ছেন: হেনরি জ্যামস, ও. হেনরি, ই. টি. এ্যা. হফম্যান, এ্যানটন চেখোভ, ক্যাফকা, ডি. এইচ. ল্যাওরেন্স, ক্যাথেরিন ম্যান্সফিল্ড, শেরউড এ্যান্ডার্স, অ্যারনেস্ট হেমিংওয়ে, ক্যাথেরিন অ্যান পোর্টার, জন ও'হ্যারা, ফ্যানেরি ও'কোর্ণর, জে. জি. স্যালিংগ্যার, জন চীভার, জন আফদিকে, ডোন্যাল্ড ব্যার্থেল্মে ও র‍্যায়মোন্ড ক্যার্ভের, এ্যডগ্যার অ্যালান পো, গ্যাই ড্যা ম্যাপাসেন্ট।[১] এ্যডগ্যার অ্যালান পো ইংরেজি ভাষায় ছোটগল্পের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন ছোটগল্প হবে 'শর্ট প্রোজ ন্যারেটিভ'; আকৃতি[২] হবে ছোট, এক 'বসায়' যাতে সম্পূর্ণ গল্পটি শেষ করা যায়। ছোটগল্পে থাকবে একক উপলব্ধির সঞ্চার, থাকবে আখ্যান ও ঘটনা। প্রকৃতি নির্মিত হবে একটি বিশিষ্ট বা একক অভিব্যঞ্জনার মাধ্যমে।[৩] এ্যডগ্যার অ্যালান পো প্রধানত সংরূপ-প্রকরণের কথাই বলেছেন; অন্যদিকে ব্রান্ডার ম্যাথিউজ ছোটগল্প সম্বন্ধে একটি স্বচ্ছ ও যুক্তিগ্রাহ্য সংজ্ঞা দিতে গিয়ে চারটি লক্ষণ বিকল্পহীনভাবে আবশ্যিক বলে উল্লেখ করেছেন, 'একক চরিত্র, একক

1. Henry James, O. Henry, E. T. Hoffmann, Chekhov, Kafka, D. H. Lawrence, Katherine Mansfield, Sherwood Anderson, Ernest Hemingway, Katherine Anne Porter, John O'Hara, Flannery O'Connor, J. D. Salinger, John Cheever, John Updike, Donald Barthelme, Raymond Carver; Edgar Allan Poe and Guy de Maupassant.
2. 'If any literary work is too long to be read at one sitting, we must be content to dispense with the immensely important effect derivable from unity of impression for, if two sittings be required, the affairs of the world interfere, and every thing like totality is at once destroyed.' Edgar Allan Poe, The Philosophy of Composition, April 1846, Graham's Magazine.
3. 'We need only here say, upon this topic that, in almost all classes of composition, the unity of effect or impression is a point of the greatest importance. It is clear, moreover, that this unity cannot be thoroughly preserved in productions whose perusal cannot be completed at one sitting. We may continue the reading of a prose composition, from the very nature of prose itself, much longer than we can persevere, to any good purpose, in the perusal of a poem. This latter, if truly fulfilling the demands of the poetic sentiment, induces an exaltation of the soul which cannot be long sustained. All high excitements are necessarily transient. Thus a long poem is a paradox. And, without unity of impression, the deepest effects cannot be brought about. Epics were the offspring of an imperfect sense of Art, and their reign is no more. A poem too brief may produce a vivid, but never an intense or enduring impression. Without a certain continuity of effort - without a certain duration or repetition of purpose - the soul is never deeply moved ... Extreme brevity will degenerate into epigrammatism; but the sin of extreme length is even more unpardonable.' Edgar Allan Poe, The Philosophy of Composition, April 1846, Graham's Magazine.

ঘটনা, একক অনুভূতি বা প্রতীতি ও একক পরিবেশ'[৪]; কিন্তু এ-সংজ্ঞার সমস্যাটি হচ্ছে, এক-চরিত্রের সঙ্গে অন্য-চরিত্রের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সংঘাতে যে অনুভূতি জেগে ওঠে তা সৃষ্টি করা কঠিন বা অসম্ভব প্রায়। এ্যানটন চেখোভের 'ডার্লিং' একটি একক চরিত্র বিশিষ্ট সার্থক ছোটগল্প। রুডিয়ার্ড কিপলিং ছোটগল্পের একটি চমৎকার সংজ্ঞা দিয়েছেন, '[...] লণ্ঠনের আলো যেমন চারিদিকের অন্ধকারকে অক্ষুণ রেখে একটিমাত্র স্থানকে বা দ্রব্যকে দেখায়, ছোটগল্প তেমনি একটি মাত্র ঘটনা বা ভাবকে প্রকাশ করে।'[৫] অন্যরা বলেছেন, ছোটগল্প সাধারণত একটি শৈল্পিকভিত্তিক বর্ণনাধর্মী, চিত্রধর্মী সাহিত্যকর্ম বা 'গতিময় জীবনযাত্রার পথের একটি ক্ষণিক বৈচিত্র্যপূর্ণ চমৎকার দৃশ্যের মনোরম চলচ্চিত্র'[৬]। বাংলা ছোটগল্পের সংজ্ঞাগুলো হচ্ছে:

১. 'অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ্গ করি মনে হবে/ শেষ হয়ে হইল না শেষ।'[৭]

২. 'ছোটগল্প প্রথমত ছোটো হওয়া চাই, তারপর তা গল্প হওয়া চাই।'[৮]

৩. 'ছোটগল্পের উদ্দেশ্য জীবনের একটা বিশেষ ঘটনা, মনের একটি স্বতন্ত্র ভাবনাকে পূর্ণ বিকশিত করিয়া স্বল্প পরিসর স্থানের মধ্যে স্বাভাবিক পরিণতি সংঘটন সাধন।'[৯]

৪. 'ছোটগল্প হচ্ছে প্রতীতিজাত একটি সংক্ষিপ্ত গদ্যকাহিনী যার একতম বক্তব্য কোনও ঘটনা বা কোনও পরিবেশ বা কোনও মানসিকতাকে অবলম্বন করে ঐক-সংকটের মধ্য দিয়ে সমগ্রতা লাভ করে।'[১০]

এসব সংজ্ঞা থেকে একটি সার্থক ছোটগল্প নির্ণয়ের 'পঞ্চতন্ত্র' নিষ্কাশন করে নেওয়া

4. 'A true short-story is something other and something more than a mere story which is short. A true short-story differs from the novel chiefly in its essential unity of impression. In a far more exact and precise use of the word, a short-story has unity as a novel cannot have it [...] A short-story deals with a single character, a single event, a single emotion, or the series of emotions called forth by a single situation.' The Philosophy of the Short-Story, Brander Mathews, Lippincott's Magazine, 1885.
৫. আমিনুল ইসলাম, সময় ও সাহিত্য, ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ।
6. 'In its various stages of development the short story has frequently been compared with some other literary form, sometimes with some artistic form outside literature. It is thus declared to have affinities with the drama; with the narrative ballad; with the lyric and the sonnet. In the last thirty years it has shown itself, as in fact much other writing has, to be pictorial rather than dramatic, to be more closely allied to painting and the cinema than to the stage. Mr A. E. Coppard has long cherished the theory that short story and film are expressions of the same art, the art of telling a story by a series of subtly implied gestures, swift shots, moments of suggestion, an art in which elaboration and above all explanation are superfluous and tedious.' H. E. Bates, The Modern Short Story, London, 1941.
৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বর্ষাযাপন', সোনার তরী, ১৮৯৩।
৮. প্রমথ চৌধুরী, ছোটগল্প, রচনা– ১৯১৮।
৯. নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, 'ভূমিকা', বাংলা ছোটগল্প, ১৯৫০।
১০. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সাহিত্যে ছোটগল্প, ১৯৫৬।

যায় :

১. ব্যক্তিমনের নিজস্ব অনুভূতি, গ্রন্থি বা সংকটবোধকে ব্যক্ত করতে একক প্রতীতির উদ্ভাসন ও ব্যঞ্জনাকে ধারণ করা।

২. ন্যূনতম চরিত্র সংখ্যায় একটি চলিষ্ণু ও গতিশীল ঘটনাকে অবলম্বন করে, বাস্তবের সত্যস্পন্দন ধারণ করে, কাবিত্বমণ্ডিতোপাদানের সার্থক মিশ্রণ ঘটানো।

৩. অল্প পরিসরে সুনিশ্চিত বাস্তবধর্মী জীবনভিত্তিক একটি ক্ষণের বৈচিত্র্যপূর্ণ চমৎকার দৃশ্যের মনোরম চলচ্চিত্র।

৪. ছোটগল্প ও কবিতার মধ্যে একটি সুগভীর অঙ্গসংস্থান স্থাপনের মাধ্যমে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উদ্ভাস।

৫. বাহুল্যবর্জিত এবং লক্ষ্যাভিমুখী ঋজুগতি।

বাংলাসাহিত্যের সর্বপ্রথম আধুনিক ছোটগল্পের অনুসন্ধান করলে দৃষ্টিনিবদ্ধ হয় ক্ষুদ্রাকার-গদ্যকাহিনীর ওপর। বাংলা-সাময়িকপত্রের প্রথম যুগের প্রথম-পর্ব (১৮৩২-৩৩) ও দ্বিতীয়-পর্ব (১৮৭০-৭২) থেকেই ক্ষুদ্রাকার-গদ্যকাহিনীগুলো প্রকাশ পায়। পাঠক-চিত্তবিনোদন, লেখকের নাম না-থাকা এসব ক্ষুদ্রাকার-গদ্যকাহিনী বা 'চূর্ণক'গুলোই বারো-তেরো ছত্রে রচিত ছোটগল্প, প্রকাশিত হয় 'সমাচার দর্পন', 'বিবিধার্থ সংগ্রহ', 'উপদেশক' ও 'রহস্যসন্দর্ভ' সাময়িকপত্রে। তারপর প্যারীচাঁদ মিত্রের 'মদ খাওয়া বড় দায়, জাত রাখার কি উপায়' গ্রন্থের দু-একটি কাহিনীর মধ্যে 'পূর্ণদেহ' ব্যাঙ্গাত্মক ছোটগল্পের সন্ধান পাওয়া যায়।[১১] দীনবন্ধু মিত্রের 'যমালয়ে জীয়ন্ত মানুষ' (বঙ্গদর্শন, ১২৭৯ বঙ্গাব্দ, ১৮৭২) গল্পটি হচ্ছে, আর-কোনও আধুনিক বাংলা ছোটগল্প আবিষ্কার না-হওয়া পর্যন্ত, বাংলাসাহিত্যের প্রথম সুনির্মিত ও নিপুণ আধুনিক ছোটগল্প। 'যমালয়ে জীয়ন্ত মানুষ' গল্পে লেখকের ব্যক্তিত্বনিঃসৃত ঐক্যপ্রতীতি, সমকালীন বাস্তব ধারণা, একমুখী গতি, চমৎকার চলিষ্ণুতার প্রচেষ্টা, আখ্যানের বিকাশ ও সঙ্গতি বর্তমান। শ্রী পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'মধুমতী' (বঙ্গদর্শন, ১২৮০ বঙ্গাব্দ, ১৮৭৩) বাংলাসাহিত্যের আর-এক অপূর্ব ছোটগল্প। ব্যক্তিমানুষের সংকটবোধ, নীতির সঙ্গে নীতির দ্বন্দ্ব ও বর্ণনার বিস্তারে নির্মিত একটি চমৎকার ছোটগল্প; কিন্তু আখ্যানটি মৌলিক নয়, টেনিসনের 'ইনোক আর্ডেন' (১৮৬৪) কাব্যকাহিনীর সঙ্গে সাদৃশ্য লক্ষণীয়। বাংলাসাহিত্যের ছোটগল্পের জগতে, তারপরই, পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ঘাটের কথা' (ভারতী, ১২৯১ বঙ্গাব্দ, ১৮৮৪), 'গল্পগুচ্ছ'-এর প্রথম গল্প।

১১. ক্ষেত্র গুপ্ত, বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস, ২০০০।

গল্পটি সুখরঞ্জন রায়ের মতে 'লিরিক ও ছোটগল্পের সীমান্তদেশের রচনা'[১২] ও 'ছোটগল্পের স্ফুটগৌরবে'[১৩] অপ্রকাশিত; সুকুমার সেনের ভাষায় 'গল্পচিত্র'[১৪]; প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্যে 'গল্পাভাস'[১৫]; ভূদেব চৌধুরীর কথায় 'উপাখ্যান'[১৬]; আর শিশিরকুমার দাশের মন্তব্য, 'সুরচিত গদ্যে অনুচ্ছেদের পর অনুচ্ছেদ গেঁথে চলেছেন রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু কাহিনীর আরম্ভ করতে পারেননি। [...] স্বল্পপরিসরে, স্বল্পকথায় জীবনের একটি গভীর মুহূর্ত কিংবা একটি ব্যঞ্জনাভরা ইঙ্গিতে ঘটনার অতর্কিত অবসানকে লেখক কাহিনীর মধ্যে ধরতে শেখেননি।'[১৭] অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'দেনাপাওনা' (হিতবাদী, ১৮৯১) হচ্ছে বাংলাসাহিত্যের একটি নিটোল ছোটগল্প, সন্দেহাতীত। 'রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের প্রধান সঙ্কলন তিন খণ্ডে 'গল্পগুচ্ছ' এবং 'তিনসঙ্গী'। প্রথম স্তরে নিটোল রসপুষ্ট কাহিনী, গল্পগুচ্ছের প্রথম দুই খণ্ডে। দ্বিতীয় স্তরে [...] বুদ্ধির অতিরেক এবং তত্ত্বপ্রাধান্য—গল্পগুচ্ছের তৃতীয় খণ্ড। 'তিনসঙ্গী'—তৃতীয় স্তর। অতি আধুনিক মননপ্রধান জীবনধারার সমস্যা। তাঁর ছোটগল্প প্রকৃতিরস, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের নিবিড় সম্বন্ধ এবং মানবমনের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতায় পূর্ণ।'[১৮] স্বতন্ত্র মেজাজের শিল্পী ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের গল্পগুলো প্রকাশিত হয় ১২৯৮-১৩০০ বঙ্গাব্দে। তার গল্পের আকার অনির্দিষ্ট হলেও ভিন্ন ধরনের এক জীবনচেতনার সূচক, পরিবেশ—আড্ডা, সেখানে হরেক লোকের সমাবেশ, সমাজমনের সম্মিলিত সৃষ্টি। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের লিখনশৈলীতে লোকায়ত সাহিত্যের পন্থাগ্রহণ করেছেন অনেকটা। তার গল্প গ্রন্থগুলো হচ্ছে 'ভূত ও মানুষ' (১৮৯৬), 'মজার গল্প' ও 'ডমরু চরিত' প্রভৃতি।

বিংশ শতকের তৃতীয় দশকের আগেই বাংলাসাহিত্যে আধুনিক ছোটগল্পের বাঁকপরিবর্তন হয়; আর এই নবতর বাঁকটি চিহ্নিত করতে অবদান রেখেছেন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী, জলধর সেন, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাজী নজরুল ইসলাম প্রমুখ।

সহজ রসের রসিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় শতাধিক ছোটগল্প লিখেছেন, যেমন 'নবকথা' (১৮৯৯), 'ষোড়শী' (১৯০৬), 'দেশী ও বিলাতী' (১৯০৯), 'গল্পাঞ্জলি' (১৯১৩), 'গল্পবিথী' (১৯১৬), 'পত্রপুষ্প' (১৯১৭) প্রভৃতি। শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অত্যন্ত আবেগপ্রবণ শিল্পী; পারিবারিক জীবনের রূপাঙ্কন, পল্লীজীবনের বাস্তবচিত্র তাঁর

১২. সুখরঞ্জন রায়, রবীন্দ্র কথা-কাব্যের শিল্প-সূত্র, ১৩৮৩।
১৩. সুখরঞ্জন রায়, রবীন্দ্র কথা-কাব্যের শিল্প-সূত্র, ১৩৮৩।
১৪. সুকুমার সেন, বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস (তৃতীয় খণ্ড), ১৩৫৩।
১৫. প্রভাতকুমুর মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী (১ম খণ্ড), ১৩৭৭।
১৬. ভূদেব চৌধুরী, বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রযুগের ইতিকথা, ১৮৯২।
১৭. শিশিরকুমার দাশ, বাংলা ছোটগল্প, ১৯৯৫।
১৮. ক্ষেত্র গুপ্ত, বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস, ২০০০।
১৯. Prosper Merimee, Le vase étrusque, 1830.

রচনায় সুলভ। প্রমথ চৌধুরী একটি ফরাসি গল্পের[১৯] অনুবাদ 'ফুলদানি' (সাহিত্য, ১২৯৮) দিয়েই আধুনিক ছোটগল্পের একটি অভিনব অনুপম বাঁক সৃষ্টি করেছেন; কিন্তু গল্পটি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আপত্তি তোলেন, 'বর্ণিত ঘটনা এবং পাত্রগণ বড় বেশি য়ুরোপীয়—ইহাতে বাঙালী পাঠকদের রসাস্বাদনের বড়ই ব্যাঘাত করিবে। এমন কি সামাজিক প্রথার পার্থক্যহেতু মূল ঘটনাটি আমাদের কাছে সম্পূর্ণ মন্দই বোধ হইতে পারে।'[২০] তবুও একথা অস্বীকার্য যে, বাংলা আধুনিক ছোটগল্পের নতুন ধারার স্রষ্টা প্রমথ চৌধুরী 'নতুন বাঁকের আর নতুন মর্জির'[২১] আধুনিকতা নিজের মৌলিক প্রতিভায় একাই সৃষ্টি করেছেন। প্রমথ চৌধুরী তার 'চার ইয়ারি কথা' বা 'নীললোহিত'-এর গল্পগুলোর মাধ্যমে পাঠকের কাছে আবেদন রেখেছেন। 'চার ইয়ারি কথা'-র গল্পের পটভূমি—প্রথমটিতে কলকাতার গঙ্গার ঘাট, দ্বিতীয় ও তৃতীয়টিতে ইংল্যান্ড, চতুর্থটি কলকাতায় বসে বিলাতের স্মৃতিচারণা; বিষয়বস্তু—'সমাজ ও পরিবারের চাপের বাতাবরণ-বিচ্ছিন্ন, মুক্ত নারী ও পুরুষের পারস্পরিক মনঃসম্পর্কের ঝড়-বৃষ্টি-বিদ্যুৎ-সূর্যতাপ এবং সেইসঙ্গে মন্দ সমীরণ, জ্যোৎস্নালোক আর অশ্রুতপূর্ব সুরের রেশ। এই সম্পর্কের চিত্ররূপে কোনও ন্যায়-অন্যায়, ভালো মন্দের অনুশাসন নেই। নেই কোনও তথাকথিত নৈতিকতা।'[২২] জলধর সেনের গল্পে গ্রাম্যজীবনের চিত্র ও ঘরোয়া পরিবেশ ফুটে উঠেছে। তার গল্পগ্রন্থগুলো হচ্ছে 'নৈবেদ্য' (১৯০০), 'পরাণ মণ্ডল' (১৯০৪), 'নূতন গিন্নী' (১৯০৭), 'আমার বর' (১৯১৩) প্রভৃতি। কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পসংগ্রহগুলো হচ্ছে 'পাথেয়' (১৯৩০), 'দুঃখের দেওয়ালী' (১৯৩২), 'মা ফলেষু' (১৯৩৫) প্রভৃতি।

নজরুল বাংলাসাহিত্যের জগতে শুধু কবিতার জন্যেই নয়, ছোটগল্পের জন্যেও যুগস্রষ্টা। তাঁর ছোটগল্পে কবিতার মতো শক্তি ও স্বাতন্ত্র্যের স্বার বহন করে। প্রতিষ্ঠিত মানদণ্ডে অর্থাৎ প্রচলিত ছোটগল্পের আঙ্গিক ও রূপনীতির কাঠামোতে ফেলে কিংবা রচনা-সৃষ্টির প্রচলিত শিল্পরূপে বিচার করতে গেলে নজরুলের ছোটগল্পের প্রকৃতি ও চরিত্রের নির্ণয় বা মূল্যায়ন খুবই দূরুহ। নজরুল তিনটি ছোটগল্পের গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন—'ব্যথার দান'[২৩], 'রিক্তের বেদন'[২৪] ও 'শিউলিমালা'[২৫]। তিনটি গ্রন্থে মোট আঠারোটি গল্পের মাধ্যমে প্রেম, বিচ্ছেদ, বিরহ, প্রেমকর্তব্যের সংঘাতে সৃষ্ট ট্র্যাজেডি, মৃত্যু, যুদ্ধযাত্রা, দেশের প্রতি প্রবল আকর্ষণ, দেশ ও জাতির মুক্তি—অর্থাৎ রোমান্টিকতা প্রকাশ পেয়েছে। নজরুল ছিলেন সকল অবিচার, অত্যাচারের বিরুদ্ধে আপসহীন দ্রোহী। একইসঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর মাতৃঋণ, স্বদেশের ঋণ শোধ করার

২০. সাধনা, অগ্রহায়ণ ১২৯৮ বঙ্গাব্দ।
২১. সুমিতা চক্রবর্তী, ছোটগল্পের বিষয়-আশয়, ২০০৪।
২২. সুমিতা চক্রবর্তী, ছোটগল্পের বিষয়-আশয়, ২০০৪।
২৩. প্রথম প্রকাশ: ফাল্গুন ১৩২৮ বঙ্গাব্দ (মার্চ ১৯২২)।
২৪. প্রথম প্রকাশ: পৌষ ১৩৩১ বঙ্গাব্দ (জানুয়ারি ১৯২৫)।
২৫. প্রথম প্রকাশ: কার্তিক ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ (অক্টোবর ১৯৩১)।

উন্মাদনা ও আদর্শায়িত একটি মাতৃমূর্তির অন্বেষণ, যা ছিল কবির কাছে 'জগজ্জননীস্বরূপা মা'।

বিভূতিভূষণের আত্মমগ্ন প্রকৃতিদৃষ্টি, তারাশঙ্করের রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতির সম্মিলিত প্রেক্ষিতে দেশের পরিবর্তনশীল রূপ, প্রেমেন্দ্র মিত্রের জীবনের অচেনা পটভূমি থেকে গল্পের বিষয়বস্তু নির্বাচন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় ফ্রয়েডিয় ও মার্কসীয় তত্ত্বের প্রয়োগপরীক্ষা, বনফুলের উপরিতলের জীবনের চঞ্চল ঝিকিমিকি ও অণুগল্পের সূচনা, সতীনাথ ভাদুড়ির রাজনৈতিক বীক্ষা, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইতিহাসপ্রয়ান—এসবই বাংলাসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। করেছে পরশুরামের গল্পগুলোও—'গড্ডলিকা' (১৯২৪), 'কজ্জলী' (১৯২৭), 'হনুমানের স্বপ্ন' (১৯৩৭), 'নীলতারা' (১৯৫০), 'দুস্তরী মায়া' (১৯৫২), 'কৃষ্ণকলি' (১৯৫৩) প্রভৃতি।

বাংলা গল্পের 'প্রকৃতি' বদলাতে ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ থেকে পত্র-পত্রিকায় গল্প লিখতে শুরু করেন স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, নবেন্দু ঘোষ, ননী ভৌমিক। প্রকাশিত হয় অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের গল্পসংকলন 'পলায়ন' (১৯৪০) ও 'প্রজাপতয়ে' (১৯৪২), সোমেন চন্দের বিখ্যাত ছোটগল্প 'ইঁদুর' (বৈশাখ ১৩৪৯), সঞ্জয় ভট্টাচার্যের 'ফসল ও অন্যান্য গল্প' (১৯৪২), সোমনাথ লাহিড়ীর '১৯৪৩' (১৯৪৩), শান্তি ভাদুড়ীর 'কিউ' (বৈশাখ ১৩৫০), সমরেশ বসুর 'আদাব' (১৯৪৬), রমেশচন্দ্র সেনের 'সাদা ঘোড়া' (১৯৪৭), কমলকুমার মজুমদারের 'জল' (১৯৪৮) প্রভৃতি। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে বাঙালির জীবন-নীতি ও জীবন-ভাষ্য অবলম্বনে নতুন এক সামাজিক গল্পের ধারা সৃষ্টি করতে শুরু করেন নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সন্তোষকুমার ঘোষ, শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিমল মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী প্রমুখ। ক্রমে এই ধারার পথ বদলে ফেলেন সুবোধ ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিমল কর, রমাপদ চৌধুরী, আশাপূর্ণা দেবী, প্রতিভা বসু, বাণী রায় প্রমুখ। পঞ্চশের দশকের মাঝামাঝি থেকে 'নতুন রীতির গল্প' লিখতে শুরু করেন দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, দেবেশ রায়, অমলেন্দু চক্রবর্তী, কার্তিক লাহিড়ী প্রমুখ। ষাটের দশক থেকে গল্প প্রকাশ করেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, সমরেশ মজুমদার, দিব্যেন্দু পালিত, বুদ্ধদেব গুহ প্রমুখ। পরবর্তীতে এলেন বাণী বসু, সুচিত্রা ভট্টাচার্য প্রমুখ। এরই মাঝে শিল্প-ভুবনের অদ্ভুত আলো উদ্ভাসিত হয় শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, আবুল বাশার প্রমুখ লেখকদের গল্পে।

বর্তমান বাংলাদেশের বাংলা ছোটগল্পের যে-অর্জন, যে-অবস্থান বা যে-ধারা নির্মিত হয়েছে তা বিগত সময়েরই ধারাবাহিকতার ফসল। পূর্ববাংলার পুরোনো লেখক মাহ-বুব-উল আলম, আবুল মনসুর আহমেদ, আবুল ফজল। প্রধান কথাকার শওকত ওসমান, আবু রুশদ, হাসান হাফিজুর রহমান, শহীদুল্লাহ কায়সার, সত্যেন সেন। এছাড়াও আছেন আবু জাফর শামসুদ্দিন, সরদার জয়েনউদ্দিন, আবু ইসাক,

আলাউদ্দিন-আল আজাদ, জহির রায়হান, সৈয়দ শামসুল হক, আল মাহমুদ, শওকত আলী, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, হাসান আজিজুল হক, সেলিনা হোসেন প্রমুখ।

মাহবুব-উল আলমের মোট চারটি গল্পগ্রন্থ—'মফিজন' (১৯৪৬), 'তাজিয়া' (১৯৪৬), 'পঞ্চঅন্ন' (১৯৫৩), 'গাঁয়ের মায়া' (১৯৫৫)। তাঁর গল্পগুলো জৈবিকতা ও মনস্তত্ত্ব, বাৎসল্য রস, অতিপ্রাকৃত ভাবকল্পনা ও মানব অনুভূতির বৈচিত্র্য সরস উপাদানে ভরপুর। আবুল ফজলের গল্পগ্রন্থ—'মাটির পৃথিবী' (১৯৪০), 'আয়ষা' (১৯৫১), 'শ্রেষ্ঠগল্প' (১৩৭১ বঙ্গাব্দ) ও 'সপ্তপর্ণা' (১৯৬৪)। তাঁর যে গল্পগুলো শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখে সেগুলো হচ্ছে 'রহস্যময়ী প্রকৃতি', 'মা', 'মাটির পৃথিবী', 'পরদেশিয়া', 'হাকিম', 'দুই রাত্রি', 'জয়', 'জনক', 'সংস্কারক', 'বিবর্তন', 'রাহু', 'সাক্ষী' ও 'সিতারা'। 'তাঁর গল্পে আছে জীবনের খণ্ড পরিসরের ছবি যাতে প্রতিফলিত হয়েছে (ক) বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবন ও প্রকৃতি, (খ) আঞ্চলিক পরিবেশের একটি স্বচ্ছ রূপ, (গ) সামাজিক অসাম্যজনিত দুর্ধশা ও দারিদ্র্য, (ঘ) কৌতুকপ্রিয়তা, (ঙ) অন্ধ ধর্ম সংস্কার থেকে মুক্তির উদ্‌বোধন।'[২৬] হাসান হাফিজুর রহমানের 'আরো দুটি মৃত্যু' ও 'মানুষের মন' উল্লেখযোগ্য। শওকত ওসমানের আটটি গল্পগ্রন্থ—'পিঁজরাপোল' (১৯৫০), 'জুনু আপা ও অন্যান্য গল্প' (১৯৫১), 'সাবেক কাহিনী' (১৯৫২), 'উপলক্ষ্য' (১৯৬২), 'প্রস্তর ফলক' (১৯৬৪), 'নেত্রপথ' (১৯৬৮), 'উভশৃঙ্গ' (১৯৬৯), 'শ্রেষ্ঠ গল্প' (১৯৭৪)। আবু রুশদের চারটি গল্পগ্রন্থ—'রাজধানীতে ঝড়' (১৯৩৯), 'প্রথম যৌবন' (১৯৪৮), 'শাড়ী বাড়ী গাড়ী' (১৯৬৩), 'স্বনির্বাচিত গল্প' (১৯৭৯)। আবু রুশদ মুসলিম মধ্যবিত্ত জীবনের রূপকার। তাঁর গল্পে ভিন্ন ভিন্ন স্বাদ পাওয়া যায়, যেমন—মনোবীক্ষণ, জীবনের অন্তিম মুহূর্তের উপলব্ধি, সামাজিক অবক্ষয় ও নৈতিক চেতনার সংঘর্ষ, মুসলিম দাম্পত্য জীবনের জটিলতা, দেহজ অনুভূতির বৈচিত্র্য বিকাশ, বাৎসল্যরস, বয়সন্ধিকালে দ্বন্দ্ব ও চেতনা ইত্যাদি। আলাউদ্দিন-আল আজাদের সাতটি গল্পগ্রন্থ—'জেগে আছি' (১৯৫০), 'ধানকন্যা' (১৯৫১), 'অন্ধকার সিঁড়ি' (১৯৫২), 'মৃগনাভি' (১৯৫৪), 'উজান তরঙ্গে' (১৯৬২), 'যখন সৈকত' (১৯৬৮) ও 'নির্বাচিত গল্প' (১৯৮৫)। তিনি সংগ্রামমুখর জীবনকেই অবলম্বন করেছেন।

প্রবাসে বাস করে বাংলায় ছোটগল্প যাঁরা সৃষ্টি করেছেন তাঁরাও মূলধারার বাংলাসাহিত্যের ধারাবাহিকতা অনুসরণ করেছেন। প্রবাসে বসে ও জীবনের বেশির ভাগ সময় কাটিয়ে যে তিনজন প্রয়াত বাংলা ডায়াস্পোরার সাহিত্যিক ছোটগল্প রচনা করেছিলেন—সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (১৯২২-১৯৭১), শামসুদ্দিন আবুল কালাম (১৯২৬-১৯৯৭) ও আবদুর রউফ চৌধুরী (১৯২৯-১৯৯৬)—তাঁদের কথাই ধরা যাক। এই তিনজন প্রয়াত বাংলা ডায়াস্পোরার সাহিত্যিক জন্মসূত্রে ভিন্ন ভিন্ন সময়ের হলেও তাঁরা তিন-সময়ের পৃথক পৃথক বাংলা ডায়াস্পোরা ছোটগল্পের সৃষ্টিকর্তা,

২৬. খালেদা হানুম, বাংলাদেশের ছোটগল্প (১৯৪৭-১৯৭০), ১৯৯৭।

তথাপি বর্তমান প্রবাসপ্রহরেও তিনজনই সম্মানে লালিত হওয়ার যোগ্য, আর তাঁদের রচনাবোধ, বিষয় নির্বাচন, ভাষারীতি ও প্রতীক ব্যবহার এই প্রমাণ করে তাঁরা ও তাঁদের সৃষ্টিকর্ম—ছোটগল্পকার ও ছোটগল্প—উজ্জ্বল ধারাবাহিকতায় পূর্ণিমার চাঁদ হয়ে ধরা দেয় সচেতন পাঠকের কাছে।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ও তাঁর সৃষ্টিকর্ম সম্বন্ধে খালেদা হানুম বলেছেন, 'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহকে কারো সমগোত্রীয় রাখিনি। কেননা তিনি অনন্যতার দাবী রাখেন। নৈর্ব্যক্তিক মননশীল জগতে তাঁর পদচারণা। তিনি নিরীক্ষাবাদী জীবনশিল্পী।'[২৭] তাঁর দুটো গল্পগ্রন্থ—'নয়নচারা' (১৯৪৫), 'দুই তীর' (১৯৬৪)। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে 'গল্প সমগ্র' নামে একটি গল্পসংকলন প্রকাশিত হয় কলকাতা থেকে, এতে উভয় গ্রন্থের সতেরটি গল্পসহ তিরিশের বেশি গল্প সংকলিত হয়। শামসুদ্দিন আবুল কালাম ও তাঁর সৃষ্টিকর্ম সম্বন্ধে ড. রফিকউল্লাহ খান বলেছেন, 'শামসুদ্দিন আবুল কালাম ছিলেন মূলত রোম্যান্টিক জীবনশিল্পী। দারিদ্র-পীড়িত, উন্মূলিত-অস্তিত্ব মানব-মানবীর জীবনের সংকট ও সংগ্রাম রূপায়ণে কঠোর-কঠিন বাস্তবতার পরিবর্তে তিনি দুঃখ, বেদনা ও রক্তক্ষরণকে বিলাসের সামগ্রীতে পরিণত করেছেন।'[২৮] আবদুর রউফ চৌধুরী ও তাঁর সৃষ্টিকর্ম সম্বন্ধে আবদুল মান্নান সৈয়দ বলেছেন, 'লেখক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (১৯২২-১৯৭১) বা শামসুদ্দিন আবুল কালাম (১৯২৬-১৯৯৭)-এর যে-যুক্ততা ছিল ঢাকার সঙ্গে, তা তাঁর [আবদুর রউফ চৌধুরীর] ছিল না।'[২৯] তবে 'চল্লিশের দশকে আমাদের গল্পে-উপন্যাসে যে-আধুনিকতা শুরু হয়, আবদুর রউফ চৌধুরী তারই উত্তরসাধক। পঞ্চাশের দশকের কথাসাহিত্যিকদের—আলাউদ্দিন আল আজাদ, সৈয়দ শামসুল হক, জহির রায়ান, রাবেয়া খাতুন, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, আহমদ মীর, হুমায়ুন কাদির, মুর্তজা বশীর প্রমুখ—সমসাময়িক হিশেবে তাঁকে [আব্দুর রউফ চৌধুরীকে] বিচার করা যায়।'[৩০] এই তিনজন প্রয়াত বাংলা ডায়াস্পোরার সাহিত্যিকের কথা উল্লেখ করা হল এজন্যই যে, তাঁদের সৃষ্টিনিদর্শনে একটি বিশেষ আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক এবং নৈসর্গিক মেজাজ ও বৈশিষ্ট্য পরিদৃষ্ট হয়। তাঁরা বাংলা ভাষার ছোটগল্পের পরম্পরা সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল কেন্দ্রীয় ধারা থেকে অনেকটাই স্বতন্ত্র। তাঁরা বিশেষ কোনও মতাদর্শ বা মতবাদের অনুসারী নন বরং তাঁরা চিরায়ত মানবিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী।

২.

আবদুর রউফ চৌধুরী একজন দ্রোহী কথাসাহিত্যিক। একদিকে যেমন তিনি শিল্পী অন্যদিকে তেমনি প্রতিবাদী। মন্ময় সাধনায় যেমন তাঁর কৃতিত্ব আছে তেমনি তিনি

২৭. খালেদা হানুম, বাংলাদেশের ছোটগল্প (১৯৪৭-১৯৭০), ১৯৯৭।
২৮. ড. রফিকউল্লাহ খান, বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ, ১৯৯৭।
২৯. আবদুল মান্নান সৈয়দ (ভূমিকা-সম্পা.), নতুন দিগন্ত সমগ্র, ২০০৫।
৩০. আবদুল মান্নান সৈয়দ (ভূমিকা-সম্পা.), নতুন দিগন্ত সমগ্র, ২০০৫।

তাঁর সৃষ্টিজগতেও সিদ্ধহস্ত। পাশ্চাত্ত্য-সাহিত্যের ঐশ্বর্যভাণ্ডার ছিল তাঁর সামনে উন্মুক্ত। তাঁর ছোটগল্পে আছে শৈলীর অবাধ প্রয়োগ; কারণ তাঁর মন ছিল এক প্রগাঢ় রূপশিল্পীর মন। তাঁর ছোটগল্পে শুধু দৃশ্য-রূপই নয়, উপলব্ধি ও মননের নব-রূপ যেন অবয়ব পরিগ্রহণ করে। ব্যক্তির স্বার্থপরতা বা সুবিধাবাদেরও একটি শিল্পরূপোজ্জ্বল চেহারা তাঁর ছোটগল্প থেকে অনুভূত হয়, যা সবসময়ে জীবন নৈতিকতা-নির্ধারিত পথে চলে না; তাই নির্দ্বিধায় বলা চলে যে, তিনি সাহিত্যের মাধ্যমে সর্বাত্মকভাবে এক দ্রোহী মানসিকতাকে অবলম্বন করে তাঁর শিল্পকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর চেতনা কোনও কোনও সময় অস্থিরতা ও দ্বিধাদ্বন্দ্বে জর্জরিত হলেও তাঁকে জীবনবিমুখ করেনি, বরং তাঁর শিল্পে বৈভব বর্ধিত হয়েছে। তাঁর বেশির ভাগ গল্পই দীর্ঘ। তিনি ছোটগল্প রচনায় প্রথাসিদ্ধ নিয়মকেই অনুসরণ করেছেন। সামগ্রিক বিচারে বলা যায় রবীন্দ্রনাথের প্রবর্তিত ধারারই তিনি উত্তরসাধক; তবে বৈচিত্র্যগুণে ও নিজস্ব রূপদৃষ্টির নির্মাণ-কুশলতায় তাঁর ছোটগল্প অন্যরকম। সচেতনভাবে তিনি কোনও গোষ্ঠীর মতবাদ বা তত্ত্ব তাঁর ছোটগল্পের চরিত্রে-ঘটনায়-সংস্থাপনে আরোপ করতে না-চাইলেও তাঁর যুগের যুবমানসের মনোবিশ্লেষণের ভাবটি কোনও কোনও গল্পের বিষয়ধর্মে কার্যকরী প্রভাব ফেলেছে; তবে এই ভাবের প্রবাহ এসেছে ছোটগল্পের প্রয়োজনে, চরিত্রের অনিবার্য কারণে। তাঁর গল্পের ভূমি নির্মিত হয়েছে ভারতবর্ষ বিভাজনের পর, বাংলাদেশ সৃষ্টিসহ, কিছু তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাকে ঘিরে। যেমন :

১. পাকিস্তান আমলের সামাজিক প্রেক্ষাপট, অর্থনৈতিক সংকট ও রাজনৈতিক নৈরাজ্য;

২. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ;

৩. রাজনৈতিক উত্থান-পতন;

৪. অধিকার থেকে বঞ্চিত মানুষের ক্ষোভ।

তাঁর ছোটগল্পের ভেতর আছে অন্যরকম স্বাদ; এসব গল্পে এসেছে লেখকের বাসস্থান– ইংল্যান্ড, ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ। এখানে ভৌগলিক ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও একজনের ভালোবাসা, বেদনা, হাসি, কান্না সবকিছুই এক, রক্তের রঙও এক– কাজেই একটি বড় ক্যানভাসে মানুষের গল্প চিত্রিত করেছেন গল্পকার। মানুষের মনের বিচিত্রতা, মনস্তাত্ত্বিকতা সবই যেন স্থান করে নিয়েছে তাঁর গল্পে। যেখানে মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা নিয়ে গল্প লিখেছেন সেখানে চরিত্রের বিন্যাস হয়ে উঠেছে অনিবার্য শিল্পরীতি। মুক্তচিন্তাও তাঁর গল্পের ভাববস্তুর অবলম্বন। তিনি সমাজের সাধারণ নিম্ন ও মধ্যবিত্তের চিন্তার যেমনি আশ্রয় নিয়েছেন তেমনি উচ্চবিত্তের দৃষ্টিতে দেশ ও তাঁর সমাজকে পর্যবেক্ষণ করেছেন। বঞ্চিত মানুষের মর্মবাণী যেমনি তাঁর গল্পে স্থান পেয়েছে তেমনি তিনি সাধারণ মানুষের জীবন-সংগ্রামকে সুষ্ঠুশিল্পের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। তাঁর

গল্পে শ্রেণী সচেতনা এসেছে মূলত জীবনের সত্যকে উদ্ভাসিত করার লক্ষ্যে। সত্যানুসন্ধানী আবদুর রউফ চৌধুরী সমাজ-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন কামনা করেন, তবে সেই নবজন্ম আসুক বাস্তবতার ভিত্তিতে—সুখ-দুঃখ, কঠিন বাস্তবতার বিভিন্ন পর্যায়, সংকেত, সৌন্দর্য ও জীবন-দর্শন সবকিছুই—অলীক কোনও আশ্বাস-বিশ্বাস দ্বারা নয়। জীবনের সঙ্গে দুঃখ, সংগ্রাম এবং ভালবাসার সৃষ্টি সবই তাঁর চেতনায় পাশাপাশি প্রবাহিত হয়েছে। এদের নিয়েই পরিপূর্ণ জীবন সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। তিনি সমন্বয় সাধনে প্রয়াসী। তিনি সংগ্রামমুখর, তবে শিশিরস্নাত রৌদ্রকরোজ্জ্বল পৃথিবীর অধিবাসী। তিনি যেমনি মানুষের জীবনের দুঃখ-অভাব-বঞ্চনাকে উপজীব্য করেছেন তেমনি জীবন থেকে কখনও পলাতে চাননি। তাঁর শিল্পচেতনা গভীর জীবনঘনিষ্ঠ। তাঁর গল্প-বিষয় ভাবনায় এসেছে বিচিত্রতা। তাঁর গল্পের আবহে প্রেরণা জাগিয়েছে রাজনৈতিক চেতনা, প্রতিবাদ, শ্রেণী সচেতনতা, মানবতাবাদী চিন্তা ও প্রভাব। তাই তিনি বাস্তব জীবনের রূপকার, দ্রোহী কথাসাহিত্যিক।

আবদুর রউফ চৌধুরীর ছোটগল্পের বর্গীকরণ করলে তাঁর গল্পগুলোর একটি সুষ্ঠু কাঠামো পাওয়া যাবে এবং মূল্যায়নেও সহায়ক হবে।

ক. দাম্পত্য জীবনের জটিলতা: নীলা, আত্মব্রত।

খ. সামাজিক সমস্যা ও প্রতিবাদ: জিন, নেশা।

গ. মনস্তাত্ত্বিক: রানী, সৃষ্টিতত্ত্ব।

ঘ. মুক্তিযুদ্ধের চেতনা: অপেক্ষা, পিতা।

ঙ. বাৎসল্য রস: উপোসী, স্নান।

আবদুর রউফ চৌধুরীর গল্পের এই বিভাজন অবশ্য পাথর খণ্ডের মতো স্থির কিছুই নয়; এক বিভাগের গল্পের সঙ্গে অন্য-বিভাগের লক্ষণও এসে জুড়ে যায়, তবুও আলোচনার সুবিধার্থে এরকম একটি শ্রেণীকরণকে সহায়ক সারণী রূপে গ্রহণ করা যায়।

ক. দাম্পত্য জীবনের জটিলতা

'প্রত্যেক সৃষ্টিশীল লেখকের অন্তরালে একটি বক্তব্য আত্মগোপন করে থাকে। গভীর জীবনবোধ দ্বারা অনুপ্রাণিত লেখক এই বক্তব্যকে পাঠকের প্রত্যক্ষ গোচরে আনতে চান না। সেই বিশেষ কথনটি আঙ্গিক বা ভাববস্তুতে এমনভাবে উপস্থিত করেন যাতে শিল্পরসটি ক্ষুণ্ন না হয়।'[৩১] সমাজের সমস্যা ভারাক্রান্ত অবস্থা আবদুর রউফ চৌধুরীর বিবেকী সত্তাকে আলোড়িত করেছে, আর এই প্রতিক্রিয়ার সফল শিল্পরূপ ফুটে উঠেছে

৩১. আবুল ফজল, ১৯৭৪।

তাঁর 'নীলা', 'আত্মব্রত' প্রভৃতি গল্পের আবহে। মানুষের জীবনে প্রতিদিন নানা ঘটনা ঘটে। সংসারের নানা সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্য দিয়ে মানুষকে চলতে হয়। জীবনকে মোহগ্রস্তভাবে নয়, নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখেছেন আবদুর রউফ চৌধুরী; ভেবেছেন মানুষের সুখ-দুঃখ, ভালো-মন্দ, দ্বন্দ্ব-সংঘাতের কথা। ক্ষয়, শীর্ণতা, গ্লানি, চরম বৈষম্য থেকেই জন্ম নেয় মহৎ সত্য—জীবনের সংঘাত ও দ্বন্দ্ব। এরই সন্ধান মিলে তাঁর ছোটগল্পে, যার আবেদন পাঠকের চিত্তে মহৎ সত্যকে জেনে নেওয়ার একটি প্রবল আগ্রহ সৃষ্টি করে, আকর্ষণ তো বটেই। 'নীলা', 'আত্মব্রত' দুটো গল্পে দাম্পত্য-জীবনের জটিলতা এসেছে, এসেছে প্রীতিতে, স্নেহে, কল্যাণ-কামনায় এবং অকথিত পারস্পরিক আকর্ষণে ভালোবাসার সম্পর্কও; অনিবার্য কারণে বিচ্ছেদের সুনিশ্চিত আভাস থাকলেও আরও কিছু কথা যেন থেকে যায়, সবই নিঃশেষে সমাপ্ত হয় না। গল্প দুটোতে কামনা, প্রেম, ঈর্ষা-বিরাগজড়িত জীবন বর্ণনাংশের বিন্যাস-কুশলতায় সত্য হয়ে উঠেছে মহাসত্য।

নীলা

একজন বিবাহিত নারীর প্রতি তার স্বামীর অকথিত অবহেলা এ-গল্পে চমৎকারভাবে, সার্থকভাবে ফুটে উঠেছে:

> নীলার ভিতরে অনেক বিক্ষোভ অভিমান আর ঘৃণা পুঞ্জীভূত হয়ে আছে। সে যেন কোনও দিনই কারো কাছ থেকে ভালোবাসা পায়নি; তার স্বামীর কাছ থেকেও না, না পেয়েছিল, ঠিক বুঝতে পারছে না। স্বামী কী কোনও দিন তার জন্য অপেক্ষা করেছিল, তার মনে পড়ছে না, হয়তো সারা জীবন সে-ই তার স্বামীর জন্য অপেক্ষা করেছে। মেঘ ও জ্যোৎস্নার খেলার মতো, বোবার কথা বলার ইচ্ছের মতো সে তাদের দাম্পত্য-জীবনের অন্তরঙ্গ মুহূর্তগুলো হৃদয়ে সযত্নে ধরে রেখেছে।

স্বামীকে ছেড়ে স্ত্রীর অন্যত্র চলে যাওয়াটা যে, একজন স্বামীর চিত্তের হতাশা তা আবদুর রউফ চৌধুরী নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করেছেন, এবং তিনি এই ব্যথাতুর চিত্তের হাহাকার পাঠকের অন্তরে পৌঁছোতে সক্ষম হয়েছেন, এখানেই তাঁর কৃতিত্ব। 'নীলা' গল্পে যেমন করা হয়েছে :

> নিজের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করা ছাড়া আর কীই-বা করার ছিল তার! কখনও কখনও ত্রুটিপূর্ণ সম্পর্কের ফাঁক পূরণের জন্য বন্ধুজনের শরণাপন্ন হতেন, কিন্তু তাদের অশোভন উপদেশ উপেক্ষা করে নিজের মন ও আত্মাকে আত্মশক্তি দিয়ে শাসন করতেন।

গল্পরস ঘনীভূত করার জন্য যে পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে হয় তা আবদুর রউফ চৌধুরীর অজানা নয়। 'নীলা' গল্পে যেমন করা হয়েছে :

> নীলা অস্বাভাবিক অস্বস্তি বোধ করছে। তার যন্ত্রণাময় জীবন যেন এক কাঁটাওয়ালা বিষাক্ত ফুল, পৃথিবীর পরিত্যক্ত বস্তু। গভীর অরণ্যে, কাঁটাঝোপে যেন তার বসতি। নীলার জীবনের সীমানা তার কাছে অজানা থাকলেও সে কারো কাছে নতজানু হয়ে ক্ষমা চাইতে পারে না, এমনকি তার বুকে স্বামীবিহীন জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত হাপর মারলেও না; বেদনার ঝাপটে হৃদয় ছিঁড়ে একাকার হয়ে গেলেও না; নিশিথে যদিও সে তার স্বামীর সঙ্গে যৌনস্পৃহার সময়গুলো উপলব্ধি করে সর্বাঙ্গময় তবুও না। এসব কথা কাউকে বুঝিয়ে বলতে পারে না নীলা, তাই হয়তো ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে মদচ্ছির আলীর দিকে। তার দৃষ্টি করুণ। এই করুণ দৃষ্টির কারণেই মদচ্ছির আলীর অন্তরের ঠিক মাঝখানে, অদ্ভুত চাপাপড়া একটি পাথর ভেদ করে, মুখে বলা যায় না এমন এক যন্ত্রণা আঁচড় কাটতে লাগল।

আবদুর রউফ চৌধুরী এ-গল্পের বিষয়ের মূলভাব উদঘাটনে যে পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন তা যথাযথ হয়েছে। বর্ণনাভঙ্গি ও বাক্য বিন্যাসে সম্পূর্ণ কৃত্রিমতা বর্জিত। এর বর্ণনায় স্বাভাবশিল্পী আবদুর রউফ চৌধুরীর জীবনদৃশ্য প্রকাশিত হয়েছে, যার সঙ্গে রয়েছে সহজ-বাস্তব সাধারণ জীবনচর্যার একটি নিবিড় সম্পর্ক।

আত্মব্রত

আবদুর রউফ চৌধুরীর এ-গল্পে শিল্প-দৃষ্টির প্রধান শক্তি মধ্যবিত্ত সমাজকে জানা ও চেনার রঞ্জন-রশ্মি প্রকাশ করা। এখানে তাঁর অতলস্পর্শী দৃষ্টির স্বচ্ছতা বিস্ময়কর। সত্যিকারের মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে সাফল্যে তিনি চিত্রিত করতে পেরেছেন। হাজী মজনুর যৌনতৃষ্ণা অপরিসীম ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। ধারণাটি হচ্ছে, নারীর এক-পুরুষগামিতা আর পুরুষের বহু-নারীগমন সম্পর্কিত বিধি। সন্তানের জননী হওয়া সত্ত্বেও হাজী মজনু তার প্রথম স্ত্রীকে ব্যক্তি-স্বাধীনতার জন্য দায়ী করে সম্পর্ক ছিন্ন করেন।

> তবে রেখা জানে, সে মার্জিত ও অহঙ্কারী একজন নারী; তার সুরূপ ও অহঙ্কার হাজী মজনুর দিকে তাকে ফিরতে দেয়নি। [...] ছোট্ট-বড়ো বাধা-নিষেধ উপেক্ষা করে প্রণয়ডোর যখন স্বাধীনতা নামক স্বাদটিকে বর্ধিত করে তখন শৃঙ্খলতায় আঘাত তো আসবেই; আর প্রণয়ডোর যখন ছিঁড়ে যায় তখন উচ্ছৃঙ্খলতার রাজত্ব সহজেই সৃষ্টি হয়। এই স্বাধীনতার স্বাদকে তরান্বিত করতে রেখা হয়ে উঠল খরস্রোতা।

আজকের পৃথিবীর বহু সামাজিক অশান্তির মূলে কিন্তু এই স্বাধীনতার উচ্ছৃঙ্খল আকাঙ্ক্ষাই দায়ী। এই আধুনিক কালের স্বাধীনতায় কেউ কারো সম্পত্তি নয়, কেউ

কারো অধীন নয়—একথাই প্রকাশ করেছেন লেখক। সোজা কথায় পুরুষ নারীকে নিজস্ব সম্পত্তি করে রাখতে চায় নিজের স্বার্থে—এরই প্রতিবাদ করেছেন গল্পকার।

> কাউকে পরিপূর্ণ রূপে পেতে হলে নিজেকে সমর্পণ করতে হয় অন্তরের সব জঞ্জাল জলাঞ্জলি দিয়ে। তাকে উদাত্তভাবে আহ্বান করতে হয় একক অভিলাষে।

নারী প্রেম চায়, ঘর চায় এবং পুরুষকে জয় করতে চায়—এই তিনটি রূপেই আবদুর রউফ চৌধুরীর নারী-চরিত্রটি দেখা দিয়েছে তাঁর এই গল্পে।

> এক সন্ধ্যায়, সন্তান-দুটো নিয়ে রেখা এক নবীন এঞ্জিনের সাহায্যে ও যুবক-পাখায় ভর দিয়ে উড়ে গেল; নতুন প্রেম লাভের, ঘর বাঁধার এবং পুরুষচিত্ত জয় করার আশায়।

খ. সামাজিক সমস্যা ও প্রতিবাদী গল্পসমূহ

জিন

কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাসের কাছে বিচারবুদ্ধি সমর্পণ করলে মানুষের পরিণাম ঘটে অনিবার্যভাবে অপমানে। সেই অপমান দেখা দিয়েছে 'জিন' গল্পে।

অবয়ববাদী সমালোচকরা গল্পজাতীয় রচনায় 'বয়ন' ও 'গল্প' এই দুটো বিষয়ে যে একরকম ভাগ করে থাকেন, সে বিভাজনে আবদুর রউফ চৌধুরীর মতো গল্পকাররা সংকট তৈরি করেন। তাঁর মতো লেখকরা মনে করেন যে, বয়ন ছাড়া যেমন গল্প হয় না তেমনি গল্পকে সরিয়ে নিলে বয়নের ভিত্তি থাকে না, তাই তাঁর মতো লেখকরা বিশেষ যত্নে কাহিনীকে মূল ভিত্তি করে ভাষা ও কারুকাজে গল্প-নির্মাণের কাজটি ফুটিয়ে তুলেন। সমগ্র গঠন এবং ক্ষুদ্রতম অংশ—দুটোই তখন চিহ্নিত পরিচর্যা হিশেবে প্রকাশিত হয়। আবদুর রউফ চৌধুরীর এই গল্পে এর প্রমাণ মিলে, যা প্রকাশ করতে তিনি গ্রামেই আশ্রয় নিয়েছেন। এই গল্পে গ্রামের মানুষ সমন্ধে তাঁর মমতা ও বেদনার পরিচয় ব্যাপক। গ্রামের মানুষের জীবনের উল্লাস ও বেদনা, সুখ ও কেদ, বঞ্চনা ও লাঞ্ছনার ছবি যেমনি প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি তাদের মুখের ভাষা তাঁর কলমের আঘাতে এক অসাধারণ বিশ্বস্ত ছবি ফুটে উঠেছে, যা মানবিক সহানুভূতির পরিচয়-প্রকাশই বটে। এ-গল্পে লেখকের দেখার দৃষ্টি মনে হয় দূর থেকে নয়, বরং একেবারে কাছ থেকে দেখা। এ-গল্পের চরিত্রগুলোর ভাবনা ও বেদনাকে ঘিরে মনস্তত্ত্ব প্রাধান্য পেলেও গ্রামের মানুষের জীবন-আচরণ ও পরিবেশের তথ্যনিষ্ঠ ও জীবন্ত বিশ্বস্ত চিত্রই ফুটে উঠেছে। পরিবেশ সম্বন্ধে কয়েকটি উদাহরণ তুলে দেওয়া যাক :

> ১. [...] গোপাটের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা নিঃসঙ্গ কলাগাছটি নীরবে আঁকড়ে রয়েছে মাটি ও পানি।

> ২. চাঁদ উঁকি দিল আবার, সঙ্গে সঙ্গে চাঁদকে নিয়ে বাঁশবনের ফাঁকে কচুরিপানাগুলো লুকোচুরি খেলতে শুরু করল...।
>
> ৩. ঘর নিঝুম, আকাশ নিঝুম, বাঁশপাতা নিঝুম, তবে বাঁশবনে ব্যাঙের দল সুর তুলেছে আবার, ঘ্যাঙোর ঘ্যাঙোর; ডুবাজলে মাছের লাফালাফি চলছে সফাৎ সফাৎ...।
>
> ৪. পুকুরের পাড় ডুবুডুবু করে পৃথিবী শান্ত হল, পাড়ার ছাগলপাল কান্না থামাল...।
>
> ৫. [...] সিদ্দিক আলীর দাওয়ার চাল উড়ে গিয়েছে, হা-হা করছে, যদিও ছনের কোনও দোষ ছিল না, দিন কয়েক আগেও সে শক্তহাতে মেরামত করেছিল, বেঁধেছিল ঝাউবেত দিয়ে, তার ওপর ছেঁড়া মাছধরার জালটিও ছড়িয়ে দিয়েছিল।

গল্পটি মনস্তত্ত্ব প্রধান, জীবনের সফলতা-ব্যর্থতা প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি নিয়ে আমেনা নিজের অন্তরকে শূন্যতায় বিষণ্ন করে রাখে। সিদ্দিক আলী মমতা ও স্নেহ দিয়ে আমেনাকে আরোগ্য করে তুললেও পীরের অত্যাচারের কোনও প্রতিবিধান করতে পারেনি, বরং পীর যখন 'বিদায় নিতে উদ্যত' হন তখন 'গায়ের রক্ত পানি-করা' অনেক দিনের প্রচেষ্টায় যে ক'টি টাকা জমিয়েছিল, তা সে নিঃশব্দে মোল্লাজির হাতে তুলে দেয়।

'জিন'-গল্পে আবদুর রউফ চৌধুরী রূপ-কলা-কৌশল গভীর মানসিকতায় সমৃদ্ধ করে গল্পনির্মাণের এক অসামান্য দৃষ্টান্ত তৈরি করেছেন; তিনি গল্পের নির্মাণকলা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। একটি ভূতকে চিহ্নিত করে পরম যত্নে মানুষের ব্যবহার ও অপব্যবহারে গল্পটির আখ্যান রচিত হয়েছে। ভূতে-ধরা এবং পরে আবার ভুতে-ছেড়ে যাওয়ার মধ্যে মানুষের গল্প থেকে একটু সময়ের জন্য নজর সরিয়ে আবার মানুষের আরও গভীরতর গল্পে ফিরিয়ে নিয়ে গেছেন—এতে বাংলার অবহেলিত নারীজাতির সবচেয়ে দুঃখের বা অপমানজনিত ইতিবৃত্তিটি গ্রথিত হয়েছে। গল্পের রূপ-কলা-কৌশল যেমন শক্তিশালী তেমনি কাহিনীও। উপসংহারে একটি ঘটনা অতিক্রম করে আরেকটি ব্যাপ্ত ব্যঞ্জনার সন্ধান পাওয়া যায়। আমেনার প্রত্যাশাপূর্ণ প্রশ্ন—'গেছি তো ভালাই করছি। তুমি অত ভাবীর কথায় নাচ কিয়র লাগি কওছান হুনি?' এখানেই যেন মূল গল্পটি শুরু হয়। স্ত্রীর মুখে কী সিদ্দিক আলী সন্ধান করে তার নিজস্ব জীবনভূগোল, তার এতদিনের অস্তিত্ব ও অবস্থানের সূত্র, তার বন্ধন—এসবই ভাবতেই থাকি। ভাবতে থাকি এ-গল্পের রস মোপাসাঁ বা ও'হেনরির রচনার চমক সম্বন্ধে, যা অলক্ষিতই থেকে যায়। আবদুর রউফ চৌধুরীর গল্পের বিষয়ে যেমন মানুষের আত্মার টান আছে ঠিক তেমনি নির্মাণকলাও বিস্ময়কর ও স্বতন্ত্রভাবে ফুটে উঠেছে।

নেশা

মানুষের জীবনের মৌল রূপটি যতই আদিম হোক, কী তার আসল রূপ—এই ভাবনা থেকেই রচিত হয়েছে 'নেশা' গল্পটি। এ-গল্পের কাহিনী হচ্ছে এরকম: জাবেদ নামের এক প্রবাসী বাঙালির এক-রাত ও এক-সকালের ঘটে-যাওয়া ইতিবৃত্ত। তার সূত্র ধরে গল্পকার চরিত্র ছাড়িয়ে মানব স্বভাবের আদিমতম বৃত্তি—যৌনতা, ধার্মিকের নির্দয়তা, বিদেশির ক্রুরতা, বন্ধুর প্রতি বিশ্বাস প্রভৃতি বিষয়ের সমন্বয়ে বেঁচে থাকার প্রয়াসগুলো অতি নিপুণতার সঙ্গে পরিবেশন করেছেন। শত বাধা-প্রতিকূলতার মধ্যেও জাবেদ পরাজয় মেনে নেয় না, সর্বদাই সে যেন অপ্রতিহত ও অনবদমিত। সবকিছুর মধ্যে জীবন উপভোগের এক প্রবল বাসনা তার ভেতর সক্রিয় থাকে। এই গল্পের প্রথম ঘটনাস্থলরূপে নির্দিষ্ট হয়েছে ব্রিকলেন, পরে অক্সফোর্ড স্ট্রিট; আর শেষ হয়েছে আবার প্রথম ঘটনাস্থলে। নারীর সঙ্গবিহীন এক নিরুৎসাহ জীবনের জ্বলন্ত ছবি লেখক এঁকেছেন কাহিনী-বিন্যাসে ও বর্ণনার রঙে-রসে। তিনি জাবেদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে ফুটিয়ে তুলতে উপকাহিনীর সাহায্য নিয়েছেন। বর্ণনার বাস্তবগুণ, বাস্তবতার অভ্যন্তরে প্রবাহিত লেখকের স্মৃতি, বৃহত্তর সামাজিক ও গভীরতর মনস্তাত্ত্বিক ইঙ্গিত—সবই যেন প্রকাশিত হয়েছে এ-গল্পে।

বর্ণনায় ব্যবহৃত হয়েছে চলিতগদ্য, লেগেছে কাব্যের স্পর্শ। বর্ণনার মাধ্যমেই অনেকটা খোলাখুলিভাবে প্রকাশ পেয়েছে নারীর সঙ্গবিহীন পুরুষের জীবনের চিত্রটি। এতে গল্পের রসহানি হয়নি বরং গল্পের প্রাণে সাড়া জাগিয়েছে, কাঠামোতে প্রাণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে গড়া জীবনের পরিপূর্ণ ছবি অনাবিষ্কৃত থেকে যায় যদি না এতে থাকে মানুষের গোপন ইচ্ছার প্রকাশ। দেহের বাসনাকে অস্বীকার করলে জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ দেখানো অসম্ভব। দ্রোহীশিল্পী এ-থেকেই উপকরণ খুঁজে নেন, খণ্ড পরিসরে সৃষ্টি করেন মানুষের পূর্ণাবয়ব চিত্রটি। এই গল্পের গঠনে লেখক প্রচলিত পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছেন। বর্ণনার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন সংলাপ, যার ভাষা স্বতন্ত্র। গল্পের কেন্দ্রীয় ভাব একেবারে গল্পের শেষতম অনুচ্ছেদে ফুটে উঠেছে :

> জাবেদ তার দৃষ্টি ফিরিয়ে বলল, 'গতরাতে কি হয়েছিল? কোনও গোলমাল করেনি তো?' হেসে উঠল অভিষেক, তারপর বলল, 'না।' জাবেদকে দেখতে দেখতে সে মনে মনে বলল, গতরাতের যে-বিরক্তি, যে-তিক্ততা আমার ভেতর নাড়া দিচ্ছিল—সবকিছুই যেন বিলাতি তুষারের মতো হাওয়া হয়ে উড়ে গেছে।

পাঠক রুদ্ধশ্বাসে গল্পটি শেষ করবেন কিন্তু পাঠ শেষে তার অন্তরে অনেক জিজ্ঞাসার জন্ম নিবে; এখানেই গল্পকারের কৃতিত্ব। বাংলাদেশের ছোটগল্পে এরকম গভীর ভাবদ্যোতক প্রেরণা বিরল।

গ. মনস্তাত্ত্বিক

মানুষের মনের লীলা-বৈচিত্র্যকে প্রধান্য দিতেই হয়তো আবদুর রউফ চৌধুরী 'রানী', 'সৃষ্টিতত্ত্ব' প্রভৃতি গল্প সৃষ্টি করেছেন। পাঠকচিত্তকে আন্দোলিত করতে, বিক্ষুব্ধ করতে এসব গল্পের বিষয়বস্তু হয়তো নির্বাচন করেছেন তিনি। তাঁর তুলিতে উদয় হয়েছে অনুভূতির বিচিত্র প্রতিক্রিয়া, এ যেন প্রদীপের আলোর মতোই ক্ষণস্থায়ী, যা পাঠক-মনকে আকৃষ্ট করে, পাঠক-হৃদয়ে কল্লোল জাগায়। আবদুর রউফ চৌধুরী যা সৃষ্টি করেছেন তার মূল সুর গভীর তত্ত্বের নয়, সাধারণ মানুষের মনের পাতায় যে দু-চারটি সূক্ষ্ম অনুভূতির রেখা ফুটে ওঠে তাই যেন।

রানী

'রানী' গল্পের ভাবসম্পদে 'রেলস্টেশন' প্রতীক হিশেবে ব্যবহার করে হৃদয় আবিষ্কারের প্রয়াসকে ব্যক্ত করা হয়েছে। রানীর হৃদয়ের বিকাশ লক্ষ্য করার মতো। এই বিকাশ সাধনে লেখক যে স্বাভাবিক গতি দান করেছেন এতে গল্পটি রসসিক্ত হয়ে উঠেছে। কাহিনীর পটভূমি করাচির সেনানিবাস। এই সেনানিবাসের মানুষগুলোর প্রকৃত রূপ চর্মচক্ষে ধরা পড়ে না, এর দর্শনের জন্য প্রয়োজন অভিজ্ঞতাসঞ্জাত উপলব্ধি। সাধারণ দর্পনে প্রতিবিম্বত হয় যে চেহারা সেটা মানুষের অন্তরলোকের নয়, ঘনিষ্ঠ-সম্পর্ক থেকে যা উন্মুচিত হয় সেটাই সঠিক চিত্র। মোটামুটি এই বিষয়টির উপরই গুরুত্ব আরোপ করেছেন গল্পকার। স্বামীর চরম অবহেলায় রানীর মনে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় তা লেখক দেখিয়েছেন, তিনি জানেন, নারীর সম্ভ্রম বিনষ্ট হয়ে গেলেও গল্পে সৃষ্টি করতে হয় নতুন আলোর ঝর্ণাধারা, যা জীবনমুখী ও মহৎ আবেদনমুখী। আফসারের বন্ধু কায়সারকে কেন্দ্র করেই এ-কাহিনীর সূত্রপাত।

> কায়সারের বুকের ভেতর শিরশির করে উঠল, এই সম্পর্ক সে প্রাণপণ অস্বীকার করতে চায়, ঠেলে দিতে চায় মাথা থেকে, তারপর নিজেকে সংযত করে বলল, 'না মানলে কি করবে?' কায়সার সম্পর্কটিকে না-মানলে রানীর মনের অব্যক্ত কথাগুলো উচ্ছ্বসিত জলাশয়ের মতো ঢেউয়ের পর ঢেউ তুলে হৃৎপিণ্ডের গভীরে হারিয়ে যাবে; যেখানে বনমোরগের ডাক চলছে—অনিয়মিত, বর্ণশূন্য, রুক্ষ; ঘরের বাতাসের মতো অনিশ্চিত; অনিশ্চিত ঘাসহীন, কাদাহীন রোদভেজা মরুবালুর মতো, অনিশ্চিত সিন্ধুনদের উপর বয়ে চলা লবণাক্ত লু-হাওয়ার মতো—কখনও হিম, কখনও শীতল, কখনও বরফঠাণ্ডা, আবার কখনও রঙচটা নিস্প্রাণ বস্তুর মতো ফ্যাকাশে। কায়সার জানে, অব্যক্ত হৃদয়ের কথাগুলো কঠিন জটলায় ডুবে গেলে সেখানে জন্ম নেবে লাল-নীল রক্তের জটিল মোহনা, আস্তেধীরে ক্ষতস্থানটি শুকিয়ে উঠলেও বিবর্ণ মরা হৃদয়ের অব্যক্ত কথাগুলো বঞ্চিত ঘটঘটে হতে হতে একসময় বিলীন হয়ে যাবে, সঙ্গে হৃদয়ের শেষ

> আকাঙ্ক্ষাটিও; কিন্তু অব্যক্ত কথাগুলো ব্যক্ত করতে পারলে হৃদয়াঘাতপ্রাপ্ত জায়গাটি ছেঁড়া কাগজের মতো শুকোবে, জীবনবৃক্ষে সজীবতা লাভ করবে, শরীর প্রেমকামের তৈলাক্ত রসে ঋজু হবে।

ঘটনার উন্মোচনে রয়েছে নাটকীয়তা, বিকাশে দুর্ধমনীয় সংশয়, উপসংহারে স্বস্তির আবরণে মোড়া অতৃপ্তির রেশ—ফলে ছোটগল্পের সব গুণই এতে প্রকাশিত, বিকশিত। এ-গল্পের নামও যেন রূপকার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। লেখক এ-গল্পে একটি বাস্তব সমস্যা তুলে ধরায় উদ্দেশ্যমূলকতার সীমাবদ্ধ গণ্ডী অতিক্রম করে এর আবেদন পাঠকের মর্মমূলে স্পর্শ করেছে।

সৃষ্টিতত্ত্ব

একটি মনোবিশ্লেষণধর্মী গল্প, যার কেন্দ্রীয় চরিত্র শরিফসাবের বিচিত্র অনুভূতির শৈল্পিকরূপ লেখক নিপুনতার সঙ্গে অঙ্কন করেছেন। হৃৎ-আক্রমণ থেকে শরিফসাবের মনে জন্ম নেয় একরকম অনিশ্চিয়তা।

> স্বল্প সময়ের ভূমিকম্পে যেমনি একটি শহরের চেহারা বদলে যায় তেমনি কয়েক সেকেন্ডের বিশ্বাসে জীবন সম্বন্ধে শরীফসাবের ধারণাগুলো উলটেপালটে গেল।

এই ক্ষণিকের আক্রমণ তার মস্তিষ্ক থেকে অন্তর্হিত হলেও আবির্ভূত হয় নানা উপসর্গের। উপসর্গরূপে দেখা দেয় ধর্মের প্রতি ক্ষোভ ও ধর্মীয় অনুভূতির বিপরীতে বিজ্ঞানের জয়গান।

> উঠতি বয়সী এক মুছল্লির গোঁফের নিচে ফুটে উঠেছে মৃদু নাচন। সে তার বন্ধুর কাছে শোনেছিল, 'বিজ্ঞানের মতে বিবর্তনের পথ ধরে মাত্র ৩০ হাজার বছর আগে আধুনিক মানুষ এই পৃথিবীতে এসেছে। রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে প্রথমে সৃষ্টি হয় হাইড্রোজেন; তারপর নানা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অণু-পরমাণু, রেপ্লিকেটিং মলিকিউল, জীবন্ত প্রোটোপ্লাজম; একসময় গঠনহীন প্রোটিন থেকে নিউক্লিয়াস আর কোষঝিল্লি, কৌষিক আর অকৌষিক প্রটিস্টার অসংখ্য প্রজাতি, প্রাথমিক উদ্ভিদ তারপর প্রাথমিক প্রাণী, তারপর প্রাণী-জগতের অগণিত শ্রেণী-বর্ণ-বংশের প্রকার আর প্রজাতি, শেষপর্যন্ত মেরুদণ্ডী প্রাণী এবং শেষত মানুষ। প্রাণের মূলবীজ হচ্ছে ডিএনএ, যার অণু দেখতে মোচড়ে কুণ্ডলিপাকানো মইয়ের মতো, এর ধাপগুলোতেই রয়েছে জৈবসংকেত।' এসব কথা মনে পড়াতেই তার গোঁফের নিচে ফুটে উঠেছে মৃদু নাচন।

বিচিত্র অনুভূতির সমাবেশ শরিফসাবের চিন্তাচেতনাকে জটিল করে তুলে। শারীরিক

বিপর্যয় থেকে যে ভীতি নামক উপাদানের জন্ম, জীবনের আপাত তুচ্ছ সমস্যার সম্মুখবর্তী হয়ে সেই ভীতি রূপান্তরিত হয়েছে বিভিন্ন ভাবে।

> গল্প আর জমে উঠল না। গল্পের লেখকও এতে নিরাশ হলেন। ঘটনাটি যদি ঘটে যেত তাহলে তিনি পাঠককে নিয়ে কল্পনার রথে চড়ে স্বর্গে চলে যেতে পারতেন, স্বর্গের বর্ণনা দিতে তখন অসুবিধা হতো না, কিন্তু তা আর পারলেন কই!

লেখক এ-গল্পে বাংলা সাধুগদ্য ও চলিতগদ্য দুটোই ব্যবহার করেছেন। গল্পে বর্ণিত চরিত্র ও ঘটনার সঙ্গে সচেতন শিল্পীর যে মমত্ব ও নিরাসক্তি-সমন্বিত সঠিক অবস্থান থাকা দরকার তা লেখক আয়ত্ত করেছেন।

ঘ. মুক্তিযুদ্ধের চেতনা

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা যে কয়েকটি গল্পকে বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত করেছে 'অপেক্ষা' ও 'পিতা' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উভয় গল্পের প্রেরণার মূলে সন্ধান পাওয়া যায় রাজনীতি সচেতনতা ও স্বদেশপ্রেম।

অপেক্ষা

'অপেক্ষা' ছোটগল্পের প্রেরণার মূলে পাওয়া যায় রাজনৈতিক সচেতনতা ও স্বদেশপ্রেম। গল্পটি একজন দেশপ্রেমিক কর্মীর দেশের প্রতি নিরবচ্ছিন্ন ভালোবাসার বিমূর্ত প্রকাশ। আবদুর রউফ চৌধুরীর সাধারণ মানুষের প্রতি গভীর অনুরাগ এখানে তীব্রভাবে উপস্থিত; কারণ, রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক বিপর্যয়ের মধ্যেও জেগে থাকে সত্যের উদবোধন। এ-গল্পের মৌল চেতনায় রয়েছে আত্মপ্রবঞ্চনার মধ্যে বসবাস করা কাপুরুষ ও স্বার্থপর শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে সুউচ্চ প্রতিবাদ। গল্পটি রচিত হয়েছে বাংলাদেশ সৃষ্টির ক্রান্তিলগ্নে। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ নিঃসন্দেহে জাতীয় জীবনের বিশেষ মুহূর্ত—জাতির ভাগ্যাকাশে একটি নক্ষত্র উদিত হওয়ার সময়ে প্রবাসীর মনে কোনও দ্বিধা থাকা অসম্ভব। গল্পের ভাবধর্মে এই বিশেষ চিন্তা ব্যবহৃত হয়েছে। এরসঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে পুঁজিবাদী সমাজের নিচতলার জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক সংকট ও সামাজিক নিরাপত্তার অভাবে সাধারণ মানুষের মনে যে জটিল মানসক্রিয়ার উদ্ভব ঘটে তা। এই সাধারণ মানুষেরই একজন নাসিম, গল্পের নায়ক। নাসিম চরিত্রের আশ্রয়ে এক অন্তর্প্রবাহী প্রতিবাদী চেতনা মূর্ত হয়ে উঠেছে। নাসিম চরিত্রটি অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই লেখকের ব্যক্তিত্বের ধারক। ব্যক্তিগত জীবনে লেখকের সংযোগ ছিল শ্রমিক-সংগঠনের সঙ্গে; আর তাঁর মতোই গল্পের নায়কের আছে মানবেতর মানুষের প্রতি মমতা ও শ্রদ্ধা। গল্পকার পাকিস্তান আমলের সামাজিক পটভূমিতে বাংলাদেশে যে নতুন জীবনাদর্শের উন্মোচন ঘটছিল এর অন্তর্গত সমস্যাগুলোকে তত্ত্বগতভাবে নয়, সরেজমিনে বিচরণ করে, তাঁর অভিজ্ঞতায় চিহ্নিত করে সার্থকভাবে রূপ দিতে সক্ষম

হয়েছেন। এক্ষেত্রে তিনি রহস্যকার নন, রহস্যভেদী। মনন ও অভিজ্ঞতার এমন মিলন বাংলা ছোটগল্পের ক্ষেত্রে বিরল।

> ফোঁস ফোঁস আওয়াজে প্রতি নিশ্বাসে ধূমোদ্‌গার করে যে রেলগাড়িটি করাচি অভিমুখে ছুটে চলেছে তারই তৃতীয়শ্রেণীর এক কামরায় বসে থাকা নাসিম আহমেদ জানালা দিয়ে বাইরে তাকাতেই দেখতে পেল, এঞ্জিনের নির্গত ধূম্ররাশি আকাশের নীলের সঙ্গে মিলেমিশে ধূসর বর্ণ ধারণ করে যেন বাজপাখির মতো ডানা মেলে আছে।

নাসিম রেলগাড়িতে করে করাচি যাচ্ছে। গল্পের ভাবসম্পদে 'রেলগাড়ি' প্রতীক হিশেবে ব্যবহৃত হয়েছে, যা হয়ে উঠেছে মূল্যবোধকে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখার ঐকান্তিক প্রতিজ্ঞা। এ-যেন দরিদ্রবর্গের জীবন এবং তাদের বাঁচবার সংগ্রাম, প্রতিরোধ, দেশ-সমাজ-শ্রেণী রক্ষার বিপ্লবী ভাব। নাসিমের রেলগাড়ির যাত্রা এবং তার স্মৃতিচারণের মাধ্যমে জাতীয় ও স্থানীয় জীবনের সংকটকে বোঝানো হয়েছে। যেমন :

> ১. সেপাইদ্বয় যদি ইতরপ্রাণী না হতো তাহলে মানুষের এত ভিড়ে অসভ্যের মতো সটান শুয়ে থাকত না; [...]।
>
> ২. সীমান্তপথে জিনিশ ও মানুষ যাতে বে-আইনিভাবে পারাপার হতে না-পারে সেজন্য প্রহরী মোতায়েন করেছে সরকার; কিন্তু উপরি রুজি ছাড়া তার মতো গরিবের সংসার চলে না।
>
> ৪. [...] পরাধীনতার জগদ্দল পাথর যে-কোনও বিদেশির নামে আপনি বহন করেন না কেন, পরাধীনতার তীব্রতা দিনদিন বাড়েই, [...]।
>
> ৫. নাসিম বিস্ময়ানন্দে চিৎকার করে উঠল, 'ইউরেকা! ইউরেকা!'

নাসিম তার সময়ের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির পরিবর্তন চায়, তাই তার কল্পনায় থাকে একদিকে অতীত ও বর্তমান জীবনের গ্লানি অন্যদিকে ভবিষ্যতের সজীব প্রাণপ্রাচুর্য ভরা জীবনের স্বপ্ন। সে নতুন রাষ্ট্র গড়ার জন্যই চায় দেশের আমূল পরিবর্তন। নতুন দেশ তৈরি করার কিছু কারণ সে স্পষ্ট করে; যেমন :

> পরীক্ষানিরীক্ষার অজুহাতে ঢাকা-দেহ-ধমনীর রক্ত শাসকগোষ্ঠী শোষণ করে এনে করাচির শিরা-উপশিরায় নবজীবন সঞ্চার করছে। ক্লাইভের খঞ্জর তারা উত্তরাধিকারের সূত্রে পেয়েছে বলেই হয়তো এমন করছে! তারা এর উপযুক্ত জবাব পাবে যদি বাঙালি জাতি একদিন জেগে ওঠে।

একটি নতুন দেশ রচনার দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় গল্পের সমাপ্তি ঘটে। এখানেই গল্পের আসল আবেদনটি সৃষ্টি হয়েছে। সংগ্রামী অগ্রগতি বা জাগরণকে অবশ্যম্ভাবী করার লক্ষ্যে

লেখকের মানবতার আদর্শ স্থাপিত হয়েছে। এখানেই তিনি তারাশঙ্কর, ননী ভৌমিক, মনোজ বসু, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, পূর্ণেন্দু পত্রী বা আজাদ থেকে পৃথক। এই জাগরণ তাঁর মার্কসবাদী চিন্তার ফসল নয়, তবে শোষণহীন সমাজ-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হোক এই তাঁর চেতনার মূল সুর। নাসিম বাংলা সাহিত্যে নতুন নয়, কিন্তু সে লেখকের হাতে আরও বিস্তৃত। গল্পকারের সহজাত দ্রোহী চেতনা এখানে সক্রিয়।

পিতা

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমিতে রচিত আর একটি গল্প। নিম্নবিত্ত মানুষের মধ্যে যে চেতনা বিরাজ করে সেই সময়ের বিশেষ মুহূর্তগুলো এ-গল্পের প্রাণধর্মে ব্যবহৃত হয়েছে। এ-গল্পের নায়ক একজন পিতা। তিনি তার প্রিয়তমাকে হারালেও তার একমাত্র সম্বল তার মেয়েকে নিয়ে একটি নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখেন। তার প্রিয়তমা না-থাকলেও তার আছে স্বদেশপ্রেম, আছে সন্তান। পিতা বুঝতে পারেন তার জীবন দিয়ে সন্তানকে রক্ষা করাই হচ্ছে এই ক্রান্তিলগ্নে দেশমাতৃকার বৃহত্তর কর্মকাণ্ডে নিজেকে নিয়োজিত করা। কারণ, একজন পিতার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে তার সন্তানের মঙ্গলময় ভবিষ্যৎ স্থাপন করা। প্রত্যেক পিতাই তার জীবনের সমস্ত কিছু উজাড় করে সন্তানকে তার সাধ্যমতো বাঁচিয়ে রাখতে চান। আবদুর রউফ চৌধুরীর এ-গল্পে এ-ধরনের বিষয়ই প্রকাশ পেয়েছে। পিতার অসহায়ত্ব কীভাবে প্রকাশ পায় মুক্তিযুদ্ধকে ঘিরে তারই এক অনুপঙ্খ চিত্র অঙ্গন করেছেন লেখক। এ-গল্পের বিশ্লেষণে যে বৈশিষ্ট্যগুলো দৃশ্যমান হয় সেগুলো হচ্ছে : (ক) বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের শেষ দিকের সিলেট বিভাগের পল্লী অঞ্চলের একটি স্বচ্ছ ছবি পাঠকের দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করে; (খ) আঞ্চলিক পরিবেশ সৃষ্টিতে সিলেট বিভাগের মুখের ভাষার ব্যবহার ঘটনাকে ঔজ্জ্বল্য দান করেছে; (গ) যুদ্ধ চলাকালীন সময়ের একটি হিন্দু দারিদ্র্যকিষ্ট পরিবারের সরস অভিব্যক্তির এক রূপ প্রকাশ করা হয়েছে; যেমন, পোশাক-পরিচ্ছদ, সামাজিক আচার-রুচি ইত্যাদি। এসব বিষয় অবলম্বন করে আবদুর রউফ চৌধুরী গল্পের রসকে ঘনীভূত করতে সক্ষম হয়েছেন।

এ-গল্পে সন্তানের কাছে দায়গ্রস্থ পিতার বিপন্ন-বিস্ময়কে উন্মোচিত করা হয়েছে কয়েকটি উপমা যোগে, যেমন 'সোনালি ধানের ঝিলিক', 'পূবালী ঠাণ্ডা হাওয়া', 'তেলমাখা ও রঙজ্বলা গামছা', 'কালাচাঁন্দ অঞ্চল এখন শ্মশানঘাট', 'শয়তানের ত্রিশূল' ইত্যাদি। এছাড়াও সন্ধান মিলে: ১. যুদ্ধ কীভাবে মানুষের জীবনকে ধ্বংস করে দেয়; ২. যুদ্ধের কারণে কীভাবে একটি কৃষক পরিবার নিঃস্ব হয়, তার মর্মন্তুদ চিত্র; ৩. শারীরিক দুর্বলতা, যুদ্ধের প্রচণ্ড দাবদাহ, স্ত্রীর মৃত্যু, গৃহ-স্বদেশ ত্যাগ—সবকিছুর পরিণতিতে পিতার মন কীভাবে বিদ্রোহ করে; ইত্যাদি। তবে গল্পের মূল আবেদনটি সৃষ্টি হয়েছে গল্পের শেষাংশে। গল্পের করুণ সুরের মধ্যেও বীররসের ধ্বনি প্রবহমান। পিতার উক্তি এক্ষেত্রে স্মরণীয়:

> ক্ষোভে, দুঃখে, অন্তঃগ্লানিতে দিশেহারা পিতা দৌড়ে গেল তার পিতৃভিটের দিকে, একইসঙ্গে তার কণ্ঠে ধ্বনিত হতে লাগল, 'ইতারেই কিতা স্বাধীনতা কয়?' কেঁপে উঠল বাংলার বিষণ্ন বাতাস; প্রকৃতি রোষ-বিষ্ট, উষ্মান্বিত যেন; একচমকে শতাব্দীসুপ্ত ভীতু পিতার শরীরে শক্তি সঞ্চয় হল, সঙ্গে সঙ্গে তার মনে জেগে উঠল এক নতুন স্পৃহা—সন্তানকে রক্ষা করা যেমনি তারই কর্তব্য ঠিক তেমনি স্বাধীনতা রক্ষা করা তার মতো পিতারই দায়িত্ব।

সমাজ-বাস্তবতার শিল্পী হিশেবে আবদুর রউফ চৌধুরীর যে প্রতিভা, তার আভাস পাওয়া যায় এ-গল্পে। যুদ্ধ দূরীকরণের প্রয়াসে লেখক শিল্পীর সততার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন। এ-গল্পের ঘটনাতে আছে সহজ স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দ গতি। পরিবেশের বর্ণনাও কাহিনীকে উজ্জ্বল করেছে। এরসঙ্গে যুক্ত হয়েছে আত্মবিশ্লেষণ। এ-গল্পে ঘটনার ক্রমবিকাশে এমন প্রবহমানতা আছে, যাতে অনিবার্যভাবে এসেছে নাটকীয় সংশয়দ্বন্দ্ব, যা গল্পের আঙ্গিককে করেছে ঐশ্বর্যমণ্ডিত। কাহিনী উপস্থাপনার কলাকৌশল, গঠনকৌশল—ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্যকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে। গল্পটির নামও গভীর অর্থবহ।

ঙ. বাৎসল্য রস

বাৎসল্য রস বাঙালি চেতনার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বাংলা ছোটগল্পের সূত্রপাত থেকেই এই শ্রেণীর গল্পের পরিচয় পাওয়া যায়। বাৎসল্য রসের সঙ্গে মিশে আছে বাঙালি জীবনের অশ্রুসিক্ত করুণ দিকটিও। আবদুর রউফ চৌধুরী এ-ধরনের একাধিক গল্প লিখেছেন; যেমন 'নেশা', 'উপোসী' প্রভৃতি।

উপোসী

এ-গল্পের পরিবেশ গ্রামীণ। নিটোল, স্নিগ্ধ পল্লীর রূপ আবদুর রউফ চৌধুরীর অন্য-গল্পে থাকলেও এতে আছে এক শ্রীময় হাতের স্পর্শ। আর একটি বিষয় এ-গল্পে পরিস্ফুটিত, যে-অঞ্চলের পটভূমিতে গল্পটির প্রাণকেন্দ্র নির্মিত তা হচ্ছে নদীর তীর-সংলগ্ন একটি অঞ্চল, যেখানে ধান-ক্ষেতের চেয়ে ঝিঙের জমিই বেশি। এ-গল্পের নায়ক, স্ত্রী ও সন্তান নিয়ে এক কুঁড়ে ঘরের বসিন্দা, তরমুজ। সে তার স্ত্রীকে ভালোবাসে গভীরভাবে। তার অপর যে পরিচয় লেখক দিয়েছেন তা হচ্ছে :

> [...] সে নিজের স্বার্থ ছাড়া এ-জগতে আর কিছুই বুঝে না। দুটো পয়সার জন্য কিনা করতে পারে। অলস-অকর্মণ্য জীবনযাপন করে বলে হয়তো সে নিজেকে একান্ত অসহায় ভাবে। স্বীয় পন্থায় উপার্জিত অর্থ নিঃশেষ না-হওয়া পর্যন্ত সে নিজেকে নতুন কাজে সম্পৃক্ত করতে পারে না, হয়তো-বা করতে রাজিও না; যদিও কিছুদিন পরের জমিতে হাড়ভাঙা

> পরিশ্রম করেছিল, তবুও না, তবে সে জানে দশ-টাকার কাজ না-করলে পাঁচ-টাকার মজুরি পাওয়া সম্ভব নয়। কিছুদিন দালালিও করেছে বটে, হোক না সে গরুর দালালি বা জমির দালালি বা মাটির দালালি, কিন্তু এসব কাজে সে নিজের মনে শান্তি পায়নি, বরং তার সামনে মানুষের নিষ্ঠুর চেহারাই নানাভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ক্রমে সে হাড়ভাঙা শ্রমকাজে উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। তারপর বৈধ উপায়ে টাকা উপার্জনের ধান্দা ছেড়ে গোপন ও অপ্রকাশ্য যত প্রকার নীতিবিগর্হিত পন্থা তার জানা আছে সেসব পথেই অগ্রসর হয়।

এ-গল্পে আবদুর রউফ চৌধুরী এক জয়-দীপ্ত-দৃপ্ত অন্তরের চিত্র অঙ্কন করেছেন। সুস্থ সমাজে অস্বীকৃত চুরি, প্রতারণা প্রভৃতি কাজে সিদ্ধহস্ত তরমুজ। শুধু উপযুক্ত শারীরিক কাঠামো ও সাহসের অভাবে সে দস্যুবৃত্তিতে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পারেনি, তবুও অন্যায় পথে জীবিকা নির্বাহ করতে তার কোনও সমস্যা নেই। আলস্য স্বভাবের তরমুজ উর্পাজিত অর্থ নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত সে নিজেকে নতুন কর্মে সম্পৃক্ত করতে চায় না। অসহায়তা কিংবা অস্তিত্ব জিজ্ঞাসার পীড়ন তার জীবনের নিত্য সঙ্গী। সহধর্মিনীর সঙ্গে তরমুজের সৌহার্দ্য ও মমতাপূর্ণ সম্পর্ক। সে বারুখানের ভোগ থেকে তার বউকে ভাগিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু তার বউয়ের রূপের মোহে সময় পেলেই বারুখান তার কাছে যাওয়া-আসা করে; ব্যবসায় ঝুঁকি নিয়ে টাকা কর্জ দেয়, তরমুজের অতিরিক্ত কোনও আবেদন অনাগ্রহ থাকা সত্ত্বেও পূরণ করে। তরমুজ খাটলে তার রোজগার বৈধ ও আরও নিয়মিত করতে পারত, তবে তার ভালোবাসা তার স্ত্রীর প্রতি খুবই গভীর, সে বলে, 'চাইছলাম বউটারে লইয়া সুখর এক সংসার বানাইতে। বউটার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা তো আর পথ তুকাইয়া পাওয়া প্রেমট্রেম না, যে আতখা আইল আবার আতখা পলাইয়া গেল।' তবে সে তার প্রচণ্ড রাগের সময় চোখ রাঙ্গালেও কখনও তার স্ত্রীর গায়ে হাত তুলে না। এই সংযম প্রদর্শনই তার রূপমুগ্ধ রুচিস্নিগ্ধ মার্জিত মনেরই প্রকাশ। স্ত্রীর চোখে জল দেখা দিলে তার অন্তর গলে যায়; কিন্তু তরমুজ এক রৈখিক চরিত্র নয়, সে দ্বন্দ্বময় চরিত্র। সে তার অপরাধবোধ সম্পর্কে সচেতন। আজন্ম সে যে পেশায় অভ্যস্থ সেই চৌর্যবৃত্তি নিয়েই তার মন দ্বন্দ্বময়। 'সে মন্দ হতে চায়নি, তবে বাঁচতে হবে। চারদিকের অবিরাম ক্ষয়ের মাঝে নিজেকে ডুবিয়ে রাখতে চায়নি, কিন্তু...।' আত্মগ্লানিতে পীড়িত তরমুজ নেতিবাচক জীবন পরিত্যাগ করে সুস্থ-সুন্দর জীবনে উন্নীত হওয়ার বাসনায় দীপ্ত হলেও সে তার পুরনো অভ্যাসের কাছে পরাভূত হয়। 'হে আল্লাহ মানসম্মানএ আমারে ফিরাইয়া আইন্অ। আমার তাকদির তোমার লেখা মোতাবেক কাম করতাছে। আমার দোষ নিও না হে খোদা। তোমার হুকুম ছাড়া গাছ'র পাতাও লড়তে পারে না। তোমার হুকুমঐ চল্লাম।' এ-গল্পে চোরের দুটো কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। একটি ছেলেমেয়ের উপোস আর অন্যটি অর্থের অভাবে তার স্ত্রী যেন বারুখানের সঙ্গে চলে না যায় সেজন্য ব্যবস্থা নেওয়া।

তরমুজের অনৈতিকের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার স্বভাব এবং তার স্ত্রী-র প্রতি ভালোবাসার প্রকাশ দুটো বিষয়ই অসাধারণ নৈপুণ্যের সঙ্গে ব্যক্ত করেছেন লেখক। তরমুজ হয়ে উঠেছে সর্বার্থে বিশ্বাসযোগ্য একটি মানুষ। তরমুজের স্ত্রীর চরিত্রও সুচিত্রিত। তরমুজের ভালোবাসা সে গ্রহণ করে এবং প্রতিদানও দেয়। সন্তানের জন্ম দিয়েছে। সে অপেক্ষাকৃত মধ্যবিত্ত বাবরুখানের বাড়িতে কাজ করে তার স্বামীকে সাহায্য করার চেষ্টা করে। স্বামীকে ভালোবাসে বলেই সে চৌধুরী-বাড়ি থেকে তরমুজ চুরি করার পর সাফল্য নিয়ে ঘরে ফিরে এলে নিজেকে ছুঁড়ে দেয় তার আশ্রয়ে; এরকম চৌর্যবৃত্তি অসমর্থন করা সত্ত্বেও। তরমুজ ও তার স্ত্রীর চরিত্রের স্বাভাবিকতা, তাদের আচরণ-বৈকল্যের সূক্ষ্ম বর্ণনা চরিত্রগুলোর মনস্তত্ত্বকে ফুটিয়ে তুলেছে। এরসঙ্গে লেখক প্রথম সারির চলচ্চিত্র-পরিচালকের মতোই তাঁর কলমের রেখায় এই গল্পের কাহিনীকে দৃশ্যমান করেছেন।

স্নান

আবদুর রউফ চৌধুরী ঘটনা নির্মাণে সুদক্ষ। একইসঙ্গে তাঁর প্রাঞ্জল বর্ণনার গুণে একটি ক্ষুদ্র স্থানও হয়ে উঠেছে রূপময়। এ-গল্পের প্রধান আকর্ষণ এই বর্ণাঢ্যতা। লেখক যেন কলরব মুখরিত জনপদের চেয়ে একটি নিস্তব্ধ স্নানাগারের ছবি আঁকতে অনেক বেশি স্বচ্ছন্দ। মানুষ যেখানে আশ্রয় নেয় স্নানের জন্য সেখানের বর্ণনাটি এত স্বচ্ছ যে পাঠকের অনুভূতি একাত্মতা খুঁজে পায়। কাকলীর সুর-ছন্দ গদ্যময় পৃথিবীর অস্তিত্বকে ভুলিয়ে দেয়। প্রবাসী বাঙালি লেখকদের মধ্যে আবদুর রউফ চৌধুরী প্রথম সক্ষম শিল্পী যিনি ক্ষণিকের ঘটে-যাওয়া ঘটনার আবরণে একটি বলিষ্ঠ চিন্তাকে প্রস্ফুটিত করতে সফল হয়েছেন। গল্পটির আবহ তৈরিতে লেখক সার্থক। পরিবেশ সরস। গল্পরীতির গুণে প্রবাসী মেজাজটি পাঠককে আন্তরিকভাবে আকৃষ্ট করে। একটি বিষয় এ-গল্প পাঠে প্রতীয়মান হয় যে, বাঙালি তখনও পাকিস্তানের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী। বিশেষ করে পাঠান-পাঞ্জাবি ও বাঙালির মধ্যে যে অসৌহার্দপূর্ণ সর্ম্পক ছিল এটি তারই নিদর্শন। প্রবাসে বাঙালির সামাজিক পটভূমিতে যে জীবনাদর্শের উন্মোচন ঘটে তিনি তার অন্তর্নিহত সমস্যাকে তত্ত্বগতভাবে নয়, সরেজমিনে বিচরণ করে সার্থকভাবে রূপদান করতে সক্ষম হয়েছেন। যেমন :

> ১. পাশ থেকে একটি নারীর চঞ্চল সুর ভেসে এল, এর মধ্যে যেন একটি পুরুষহীন জীবনের হাহাকার প্রকাশ পেল।
>
> ২. আমি চার বছর পর দেশে ফিরে ছ-মাসও থাকতে পারিনি। যাওয়ার আগেই আমার একমাত্র ভাই একখণ্ড জমি খরিদের সর্বাঞ্জাম করে রেখেছিলেন। এমতাবস্থায় আমি গ্যাঞ্জাম করলে ভাইটি আমার মানবে কেমন করে! [...] একান্নবর্তী পরিবারের সুখ-সুবিধা আর গুণগাথাকীর্তন করতে করতে গাজীর বয়ানের মতো আমি আম্মার সুরে সুর মিলাতে না-

> পেরে পালিয়ে এলাম একপ্রকার অতিষ্ট হয়ে।
>
> ৩. [...] তার দেহ—বিলাতি কষ্টিপাথরের ধাক্কা খেতে খেতে কেমন যেন ঝরে পড়েছে।
>
> ৪. [...] পাঞ্জাবিকে দিগম্বর বেশে দেখতে পেয়ে আমার চোখ ছানাবড়া হয়ে যায়। [...] ইংরেজের সংস্পর্শে এসে হয়তো পাঞ্জাবিরা এভাবে নাঙ্গা হয়ে স্নান করার স্বাদ পেয়েছে।
>
> ৫. পাঞ্জাবি এয়ারম্যানদের সঙ্গে পাঞ্জাবিতে গল্প করে, আমাদের কাছে আসতেই কর্পোলটির মেজাজ বিনা কারণে বিগড়ে গেল। পাঞ্জাবির প্রতি যেমন ছিল তার অগাধ আশা-ভরসা, তেমনি ছিল বাঙালির প্রতি অপরিসীম সন্দেহ আর ভয়। তার ধারণা ছিল, অপদার্থতায় নিখিল পাকিস্তানে বাঙালির সমকক্ষ আর কেউ নেই; তাই মনে মনে বাঙালির সদগতির উপায় নির্ধারণ করত; [...]।

আবদুর রউফ চৌধুরী এ-গল্পে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের একটি খণ্ড মুহূর্তকে চিত্রিত করেছেন। যেখানে আছে সমস্যা, সংকট, আত্মজিজ্ঞাসা সব মিলে পরিপূর্ণ জীবনকে জানার প্রয়াস। এ-গল্পে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র ছবি আছে, কিছু সুখের কিছু দুঃখের; তবে সচল জীবনধারার একটি সুগীত ধ্বনি গল্পের আবহে ক্রিয়াশীল। এখানে আবদুর রউফ চৌধুরীর দ্রোহ সত্তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না, বরং সাধারণ জীবনাচরণে মমতার বন্ধন যেখানে উচ্চারিত তারই সন্ধান পাওয়া যায়। স্মৃতিচারণে আছে লেখকের দেশকে জানার দুর্দমনীয় ইচ্ছার প্রকাশ।

৩.

আবদুর রউফ চৌধুরীর গল্পে, প্রায়ই দেখা যায়, চরিত্রগুলোর বহিঃসংঘাত ও অন্তঃসংঘাতে যে আবহ টানটান হয়ে ওঠে সমগ্র বয়নে, তারই পরিণাম হিশেবে এসেছে একটি শেষ আলোড়ন—অনেক ক্ষেত্রেই গল্পের শেষে। তাই বলা যায় যে, আবদুর রউফ চৌধুরীর গল্পে একটি 'শেষ মোচড়' আছে। কখনও এসেছে দাম্পত্য জীবনের জটিলতায়, বিচ্ছেদে, কখনও-বা একটি অস্ফুট-উচ্চারিত বাক্যের সূক্ষ্মতায়। কিন্তু 'শেষ মোচড়'-এ পৌঁছনোর জন্য আবদুর রউফ চৌধুরী যে-পথ অবলম্বন করেছেন, তা হচ্ছে অজানাকে জানার আবহ গড়ে তোলা। আর অজানাকে জানার আবহ গড়ে তুলেছেন পরিবেশ-বর্ণনায়, চরিত্র-বিন্যাসে ও সংলাপ সৃষ্টিতে। সবকিছুরই দক্ষ প্রয়োগ তিনি জানতেন।

আবদুর রউফ চৌধুরীর 'শেষ আলোড়ন' নির্মাণের উপজীব্য হচ্ছে মানুষ, বিশেষ দেশ

ও কালের মানুষ। তিনি দেশ ও কালের বিশেষ পটের মানুষকে দেখেছেন, ভেবেছেন; তারপর সেই মানুষের সমকালের নানা সমস্যা-আকাঙ্ক্ষা-জীবনযাত্রা, তার বাস্তবতা ও কল্পনাকে নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে আলোকিত করে সচেতন প্রযত্নে তাঁর গল্পের প্রতিমায় গড়ে তুলেছেন। তাঁর সময়টায় বাংলাদেশের রুদ্ধগৃহের দরজা-জানালা খুলে যাচ্ছিল ক্রমশ। বাংলাদেশের ব্যক্তি-পরিবার-সমাজ নানামুখী সংঘাতে আন্দোলিত হচ্ছিল এবং বদলে যাচ্ছিল অনিবার্যভাবে। বাঙালি জীবনের সেই রূপান্তরের পর্বই আবদুর রউফ চৌধুরীর ছোটগল্পের কাহিনী নির্মাণের উপাদান। তিনি তাঁর কাহিনী নির্মাণে সংস্কারবাদের প্ররোচনায় একান্ত শিল্পীর মতোই পরিবর্তনশীল সমাজের ছবি এঁকেছেন। তাই তাঁর ছোটগল্পে কৃষক ও কৃষিমজুর, গ্রামীণ ও শহরের মধ্যবিত্ত, নিম্নবর্ণ, নিম্নবিত্ত ও শ্রমিক, উদ্ভিদসুলভ জনগণ নিরঙ্কুশ আধিপত্য পেল। তিনি তাদের সমস্যার তল খুঁজে খতিয়ে দেখতে চেয়েছেন সহানুভূতির সঙ্গে। যে বাঙালি সমাজের ভিতর থেকে জন্ম নিচ্ছিল ভবিষ্যৎ (স্বাধীন দেশের সৃষ্টি, রাজনীতি ও জীবনযাত্রার পরিবর্তন), জন্মযন্ত্রণায় যার সর্বাঙ্গ কম্পিত হচ্ছিল সেই দেশ ও কালের মানুষই তাঁর ছোটগল্পের উপাদান। সেখানে প্রধান হয়ে উঠেছে ব্যক্তি ও সমাজের দ্বন্দ্ব, বাঙালি ও অবাঙালির বিদ্বেষ, সাধারণ মানুষ ও মৌলভির বিরোধ। যেমন 'নেশা', 'স্নান', 'রানী', 'সৃষ্টিতত্ত্ব', 'জিন' প্রভৃতি। কাহিনী-বিন্যাস নিয়ে আরও কথা আগেই বলা হয়েছে।

'শেষ মোচড়'-এর একমুঠো উদাহরণ:

১. কথাটি শোনামাত্রই আমেনা রক্তজবা চোখে তাকাল তার স্বামীর দিকে। আমেনার চোখ-দুটো যেন । তারপর মুখ ভেংচে বলল, 'গেছি তো ভালাই করছি। তুমি অত ভাবীর কথায় নাচ কিয়র লাগি কওছান হুনি?' [জিন]।

২. ভদ্রলোকটি একপলকে সুগভীর-তীব্র আবেগপূর্ণ বেদনা প্রকাশ করে, ঘাড় বাঁকিয়ে, ঠোঁটের ফাঁকে অস্ফুট ভাষার প্রলেপ মেখে, দেহে গোধূলিলগ্নের অস্তে-যাওয়া সূর্যের বঞ্চিত বাসনার স্ফুলিঙ্গ ধারণ করে দৃঢ় পদক্ষেপে বেরিয়ে গেলেন। তবে তার ব্যর্থজীবনের শ্রান্তির ও দুর্বলতার দীর্ঘনিশ্বাসটি স্নানাগারের দরজায় লেপটে রইল। এই লেপটে থাকা ব্যর্থতার মাঝেই অমল অনুসন্ধান করতে লাগল তার বৌদিকে আবার। [স্নান]।

৩. আর দু-দিন পরই ২৫শে মার্চ ১৯৭১ সন। [অপেক্ষা]।

৪. একচমকে শতাব্দীসুপ্ত ভীতু পিতার শরীরে শক্তি সঞ্চয় হল, সঙ্গে সঙ্গে তার মনে জেগে উঠল এক নতুন স্পৃহা—সন্তানকে রক্ষা করা যেমনি তারই কর্তব্য ঠিক তেমনি স্বাধীনতা রক্ষা করা তার মতো পিতারই দায়িত্ব। [পিতা]।

৫. মদচ্ছির আলীর মন্তব্যে তার আহতান্তরে নব জীবন রচনা করার স্পৃহা জেগে না উঠলেও ঠিকই তার হৃদয়ের একাংশ নবদীপ্তিতে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হতে লাগল। [নীলা]।

প্রত্যক্ষত আত্মজীবনীমূলক সবসময়ে না-হলেও আবদুর রউফ চৌধুরীর গল্পে আত্মজীবনের উপাদান-ব্যবহার অনেক সময়ে বিশেষ এক-ধরনের শিল্পের জন্ম দিয়েছে। 'আত্মব্রত' গল্পটির মতোই 'নীলা' গল্পেও লেখক-ব্যক্তিত্ব স্বপ্রকাশিত। গল্প-দুটো বর্ণনামূলক রীতির—কিন্তু স্বীয় অভিজ্ঞতা, স্মৃতি, মনোবিশ্লেষণ ইত্যাদির ব্যবহারে গল্পগুলো কিছুটা আত্মজীবনীমূলক হয়ে উঠেছে। তবে আবদুর রউফ চৌধুরী গল্পবৃত্ত থেকে ঈষৎ বহির্ভূত কোনও কথক-চরিত্রের উক্তি ব্যবহার করেননি, বা নিমগ্ন আত্মকথনও না, অথবা আশ্রয় নেননি সাধারণ বিবৃতিমূলক রীতির—সর্বক্ষেত্রেই গল্পে বর্ণিত ঘাটনার সঙ্গে সচেতন শিল্পীর মতো যে মমত্ব ও নিরাসক্তি সমন্বিত সঠিক অবস্থান থাকা প্রয়োজন তা তিনি করেছেন। চরিত্র উদঘাটনে তিনি পারদর্শী। দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছ মুহূর্তগুলো যেমনি তেমনি চরিত্রগুলোও অনির্বচনীয় রূপে প্রতিভাত হয়েছে তেমনি মাটি ও জলের সঙ্গে বাঙালির যে নাড়ীর যোগ তাও তাঁর গল্পে ওতপ্রোতভাবে প্রকাশ পেয়েছে। সাধারণ পল্লীজীবনে বা প্রবাসজীবনে যে অতল রহস্য ও সম্ভাবনা থাকে তা লেখকের অনুভূতিকে বারবার নাড়া দিয়েছে। সমস্যা কণ্টকিত জীবনে যে বেঁচে থাকার প্রেরণা আছে, দীপ্তি আছে তিনি সে উপাদান প্রত্যক্ষ করেছেন। কোনও কোনও গল্পে নারীসমাজের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছেন; তবে নারীদের তিনি প্রধানত পুরুষের চোখেই দেখেছেন। আবদুর রউফ চৌধুরীর গৃহিণীরা গৃহবাসিনী ও গৃহকর্মে নিরত। সেইসঙ্গে নারীর উপর পুরুষ কোথাও কোথাও অনুশাসন আরোপ করেছে, তাকে সর্বতোভাবে অধীনে রাখতে চেয়েছে। আবার কোথাও কোথাও নারীর রূপের এবং ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে মুগ্ধ হয়ে গেছে এবং ঘুরে ঘুরে আবর্তিত হয়েছে নারীকে ঘিরেই। আবার কোথাও কোথাও নারী সচেতন, সক্রিয় এবং প্রতিবাদী। সৃষ্টির নিরন্তর প্রেরণায় আবদুর রউফ চৌধুরী শিল্পীর মতোই চরিত্র উদঘাটন করেছেন। সহজ, সরল জীবনচর্যায় যে একপ্রকার লালিত্য ও বর্ণসুষমা থাকতে পারে তিনি তাঁর ছোটগল্পে সেই সাক্ষ্যই বহন করেছেন।

নারী প্রসঙ্গে একমুঠো উদাহরণ:

১. চোখ বুঁজে পুরুষগুলো যেন অনুভব করতে চাইল সুন্দরীর গভীরে অনুপ্রবেশ করে বীর্যস্খলনের আনন্দ, আর যখন তারা একে একে চোখ খুলল তখন দেখা গেল রমণীর সর্বস্ব লুটে খাওয়ার আকাঙ্ক্ষা তাদের চোখে ঝিলিক মারছে শুধু। [রানী]।

২. সব নারীই তো চায় সংসার ও সুখ, টাকাওয়ালা পুরুষ! হয়তো সবই ভুল। [উপোসী]।

৩. যৌনস্বাদ উপভোগ করার জন্য একজন পুরুষ পাবে সত্তরজন হুরী, তাহলে একজন বেহেশতি নারী কতজন তাগড়া মরদ পাবেন তার যৌনকামনা চরিতার্থ করার জন্যে? [সৃষ্টিতত্ত্ব]।

৪. দুটো বখাটে ছোকরা কৃষক-বৌয়ের লাল পোশাকটি নিয়ে হাসি-তামাশা শুরু করেছে। পটপট বুট ভাঙছে আর মাঝেমধ্যে খিলখিল করে হেসে উঠছে। একইসঙ্গে অস্পষ্ট অশ্লীল গান, ফাঁকে ফাঁকে মৃদু শিসও। কৃষক-বৌ অবলার ভঙ্গিতে নিজের হাত নিজে ডলছে। মুখ টিপে চোখের ইশারায় তার পাশে বসা লোকটিকে কী যেন অনুরোধ করার চেষ্টা করছে; হয়তো-বা তাকে এখান থেকে অন্য বগিতে নিয়ে যাওয়ার জন্য বলছে। [অপেক্ষা]।

৫. নারীকে বন্ধুর আসনে বসানোর পরিবর্তে ভোগ্যপণ্য মনে করা হচ্ছে। নারীকে শুষে, জুলুম করে ক্রীতদাসীর চেয়ে অধম ও হীন ভূমিকায় নামিয়ে পুরুষ শাসিত সমাজ আনন্দ উপভোগ করছে। পুরুষ শাসিত সমাজ-ব্যবস্থা যেন মানবিকতার উপর ধর্ষণ চালিয়ে নারীকে কিছুটা আর্থিক ও সম্পত্তির অংশ দিয়ে কেড়ে নিয়েছে তার অধিকার; এরইসঙ্গে একজন স্বামীকে, টাকার বিনিময়ে, স্ত্রী লাভের সহজ পন্থাটি বাতিয়ে দিয়েছে। পুরুষরা নারীকে পরিণত করেছে পশুতর জীবে। নারী তো আর পুরুষের ক্রীতদাসী নয়। [আত্মব্রত]।

আবদুর রউফ চৌধুরী জাতশিল্পী, তাই তাঁর ছোটগল্পে গল্পের নিরাভরণ রূপ ও রসে সমৃদ্ধ। প্রতিটি গল্পই শিল্পোত্তীর্ণ। তিনি এমন একজন গল্প-লেখক যাঁর এক-একটি গল্পের কৃৎ-কৌশল পাঠকের সামনে বহুসম্ভাবনার দরজা খুলে দেয়। ছোটগল্পের অন্যতম লক্ষণ 'ঐক্য-সংকট' নির্ভুলভাবে পাওয়া যায় তাঁর গল্পে। উপকরণের মাধ্যমে উচ্চ-মধ্য-নিম্নবিত্ত শ্রেণীভুক্ত মানুষের জীবনযাপনের বহুস্তরান্বিত কৃত্রিমতাকে, আত্মছলনাকে, স্বার্থপরতাকে পরতে পরতে লেখক উন্মোচন করেছেন। এইসব গল্পের বক্তব্যে ঋজুভাব, পরিমিতি বোধ, ছোটগল্পের কাঠামোতে নিটোল পারিপাট্য তার শিল্পচেতনার বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করেছে। তাঁর গল্পে যে পরিবেশ ও চরিত্র সৃষ্টি হয়েছে তা গল্পের ভাবসম্পদের অনুসারী। আর প্রবাসী গল্পগুলোতে স্বদেশভূমির প্রসঙ্গটা এনেছেন সুদূরপ্রসারী চিন্তাপ্রবাহের অনুসঙ্গে। এখানে বাংলাদেশের প্রকৃতি, মাটি, মেঘ, কুয়াশা, জল বিশ্বভুবনের সঙ্গে একাত্মতা সৃষ্টি করেছে। তিনি একজন মুক্তচিন্তার অনুসারী মানুষ ছিলেন। ধর্ম সম্পর্কে কোনও রকম গোঁড়ামী তাঁর ছিল না। এজন্যই তিনি ব্যতিক্রমী, আর এই ব্যতিক্রম তাঁর ব্যক্তিত্বের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত। তাঁর গদ্যরীতির যে

সাবলীলতা তা-ও এসেছে তাঁর বিশিষ্ট জীবনধারার অনুসঙ্গে। সৌন্দর্য-দর্শনের কথাও এসেছে তাঁর গল্পে; যেমন– 'রানী' একটি সৌন্দর্য-দর্শনের কাহিনী, আবার অন্যদিক থেকে একটি প্রবাসী নারীর প্রতি তার স্বামীর অবহেলারও এক আখ্যান। 'জিন' যেমন একটি নারীর প্রতি সামাজিক নির্যাতনের গল্প, তেমনি কুসংস্কার-বিরোধী গল্পরূপেও মর্মস্পর্শী। সব গল্পই অবশ্য এমন নানা রঙের আলোর বিচ্ছুরণ ঘটায় না, তবুও আবদুর রউফ চৌধুরীর এমন গল্প আছে একাধিক—যাদের একটিকে বিভিন্ন দিক থেকে দেখতে দেখতেই লেখা হয়ে যেতে পারে আর একটি স্বতন্ত্র পূর্ণাঙ্গ রচনা। খুব বেশি লেখক সম্পর্কে এমন দাবী করা চলে না। স্বচ্ছ জলধারার মতোই তাঁর চিত্রণ, ব্যঞ্জনাবহুল, রসসমৃদ্ধ। তিনি চরিত্র ব্যাখ্যায়, ঘটনা বিবরণে এবং সর্বোপরি দ্বন্দ্ব বিশ্লেষণে যে ভাষা প্রয়োগ করেছেন তা যথাযথ।

পরিবেশ প্রসঙ্গে একমুঠো উদাহরণঃ

১. সিন্ধুপাড়ে সুখের নীড় বাঁধলেও কী গঙ্গা-পদ্মা-ব্রহ্মপুত্রের কথা ভোলা যায়! হয়তো-বা তাও নয়, হয়তো বিষাদ ফুটে উঠেছে অন্য কারণে—স্বামীর সঙ্গে একা একা সন্ধ্যাটি কাটিয়ে দেওয়ার আনন্দের শির-শিরানি, অন্তরে জেগে-থাকা বাসনাটি অকারণে অস্ত গেছে বলে, কোথা থেকে এক বন্ধু এসে সুসময়টুকু নষ্ট করে দিল। [রানী]।

২. অকালের বাতাস যত চমকে ওঠে বৃষ্টিও তত ঝুমুর ঝুমুর তাল তুলছে, তারপর বৃষ্টি ও বাতাস একসঙ্গে মাটির ঘরের ঝুঁটি ধরে প্রলয়তাণ্ডবনৃত্য শুরু করল। পাশের বাড়ির মরচে ধরা টুটোফুটো টিনের ওপর আছড়ে পড়া অসংখ্য বৃষ্টিকণার অসহ্য আওয়াজে ছনের ঘরের মধ্যে বসেও বোবা-কালার মতো কা-কা করা ছাড়া উপায় কী! চিৎকার করে কথা বললেও মনে হয় কানের কাছে কে যেন শুধু ফিসফিস করছে, তবুও সিদ্দিক আলীকে কথা বলতে হচ্ছে, 'মাতছ না ক্যানে?' [জিন]।

৩. তার হেঁটে-যাওয়া পথের পাশে, ডুবে-যাওয়া খালের ভেতর থেকে, আকাশের ডাক শোনার লোভে ভেসে উঠেছে কই-মাগুর, উজাই যেন। ভেসে ওঠা মাছগুলোর পাশ দিয়ে কোঁচড়হীন পথিকের মন্থরগতিতে চলে-যাওয়া পায়ের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। অন্ধকারের মধ্যেও তরমুজ বিস্মিত চোখে দেখতে পাচ্ছে পথিকের চোখ-দুটো কই-মাগুর ধরার লোভে যেন বড় বড় হয়ে উঠেছে, তার পুতলির মধ্যে যেন শয়তানের আস্তানা। [উপোসী]।

৪. এক শনিবার অমল এই আধমাইল পথ পেরিয়ে, নিশ্চুপে ব্রিকলেনের

বাঙালির মুখের দিকে একটু তাকিয়ে, পুরাতন একটি ফ্যাক্টরির পাঁচিল ঘেঁষে, মাথাভাঙা ওক গাছটিকে পাশ কাটিয়ে, জুতোর শব্দের সঙ্গে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলা পত্রিকার পাতাগুলো শীতের ঠাণ্ডা বাতাসের সঙ্গে এলোমেলোভাবে উড়িয়ে, তার বন্ধুর দেওয়া ঠিকানায় এসে উপস্থিত হল। [স্নান]।

৫. নদীর উভয় কূল প্লাবিত। ঢেউয়ের তালে নৌকা দোলছে বিষম বেগে। তুফান নৌকার ছাদ ও বর্গার ঝুঁটি ধরে প্রলয়তাণ্ডব নৃত্যে মত্ত। ঝরে-ছিঁড়ে-ভেঙে পড়ছে বর্গা সব। ছাদ ভেঙে ছইয়ের হাড়গুলো বেরিয়ে পড়েছে, যেন পেতনীর দাঁত, এরই মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে একটি নারী, কোলে তার কম্পমান বছর দেড়েক শিশু; মা'র বুকে দুধ নেই, শুকনো; ফানুস ফেটে বায়ু বেরিয়ে গেছে যেন। [অপেক্ষা]।

পরিবেশ বর্ণনার বাস্তবগুণ ও বাস্তবতার অভ্যন্তরণে প্রবাহিত লেখকের প্রবাসজীবন, স্বাভাবিক বর্ণনার মধ্য দিয়েই বৃহত্তর সামাজিক ও গভীরতর মনস্তাত্ত্বিক ইঙ্গিতের সন্ধান পাওয়া যায় তাঁর কোনও কোনও গল্পে। উদাহরণগুলো পরিবেশ বর্ণনায় লেখক কী পরিমাণ সফল হয়েছেন তার সাক্ষ্য বহন করে। 'রানী' গল্পে আফসারের বাসস্থানের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা এরকম:

'চা আনি'—বলে পর্দা সরিয়ে রানী চলে গেল রান্নাঘরে, আর তার পিছনে দুলতে লাগল পর্দার প্রতিটি ভাঁজ; সেখানে ইস্ত্রির কোনও নিটোল চিহ্ন নেই, সেলাইয়ের পরতে পরতে শুধু জমে আছে ধুলোর তারকাঁটা, সুতোর মাঝে মাঝে যেন দুর্বোধ্য ও দুঃস্বপ্নের ভগ্নস্তূপের উপর জমে ওঠা বেদনার একরকম রহস্যময়ী জীবনগাঁথা সগর্বে আত্মপ্রকাশ করছে। [রানী]।

আবদুর রউফ চৌধুরী তার পারিপার্শ্বিক জগৎ সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন, তাই তিনি তাঁর গল্পে তাঁর অতিচেনা ভুবনটিকে অন্তরের সঙ্গে গেঁথে নিয়েছেন। শুধু মানুষ নয়, পশুদেরও যে একটি রূপ আছে, বর্ণ আছে—তিনি তাও বর্ণনা করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় :

১. তরমুজ কিছুক্ষণের জন্য নিজের মধ্যে ডুবে থেকে দোকানের বারান্দায় ঝুলন্ত আলোটি দেখতে লাগল। সে যেন গাঢ় অন্ধকারের অপেক্ষায়, তবে ভাঙা দাওয়ায় আশ্রয় নেওয়া কুকুরটির কাছে ঝাপসা অন্ধকারই প্রিয়। সে এই আলো-অন্ধকারে লেজ গুটিয়ে সামনে ছড়ানো তার পা-দুটোর ওপর মুখ পেতে চোখ বুজে ঝিমোচ্ছে; কিন্তু তরমুজের চোখে তা ধরা পড়ল না, সে আকাশের গায়ে ভেসে বেড়ানো মেঘের ভেলার দিকে তাকিয়ে রইল। কাশির

শব্দে কুকুরটি মুখ তুলে কান-দুটো খাড়া করল, তার শ্রবণশক্তি তীক্ষ্ণ, কিন্তু ঘ্রাণশক্তি আরও প্রবল, তবে দৃষ্টিশক্তি একেবারেই অস্পষ্ট, তাই শব্দের সন্ধান করতে সে হাই তুলে উঠে দাঁড়াল। [উপোসী]।

২. হঠাৎ জানালার পাশ থেকে একটি বিড়াল ঝাঁপিয়ে পড়ল টেবিলের ওপর, পাতাঝরার মতো নিঃশব্দে। তারপর পা টিপে, সন্তর্পণে এগিয়ে এল গোরার দিকে। ফিকে-নিকষ-হিমেল আলো ভেঙে গোরা হাত বাড়িয়ে বিড়ালের পিঠ ছোঁয়াতেই সে যেন কেমন নড়ে উঠল; পশমে ছোট ছোট তরঙ্গ, মৃদু কম্পন সৃষ্টি হল। ক্ষণিকের জন্য সে নিশ্চল দাঁড়িয়ে থেকে গোরার হাত ও বাহু বেয়ে টেবিলের নিচে লুকিয়ে যাওয়ার মতলব খুঁজতে লাগল। [স্নান]।

৩. এ-ধরনের বিড়াল বাসা-বাড়িতে থাকার কথা নয়, আর যদি-বা থাকে তবে গম্ভীর ভঙ্গিতে করিডোরের মাঝখানে নিশ্চুপ বসে থাকার কথা নয়। কিন্তু এই পাহাড়ি বিড়ালটি সেরকম নয়। [আত্মব্রত]।

৪.

আবদুর রউফ চৌধুরীর গদ্যশৈলীতে যে বিশিষ্টতা আছে তা পাঠক মনকে সহজেই আকৃষ্ট করে; তাঁর ভাষা নির্মাণ ও শব্দ ব্যবহারের বিশেষ গুণগুলো কী বা তার সম্প্রসারণ ঘটিয়েছেন কীভাবে তা উল্লেখ করা আবশ্যক। আবদুর রউফ চৌধুরীর ভাষা নির্মাণ ও শব্দ ব্যবহার তাঁর বক্তব্যকে শাণিত ও অর্থবহ হতে সাহায্য করেছে। প্রধানত তিনি বাস্তব জীবনের রূপকার। বাস্তবতার এই রূপ পরিগ্রহ করেছে তাঁর ভাষা নির্মাণ। তিনি প্রধানত চলিতভাষাই ব্যবহার করেছেন। তাঁর কোনও কোনও গল্পে সংস্কৃতাশ্রীয় অলঙ্কার-শব্দ ব্যবহার করা সত্ত্বেও গদ্যে এসেছে আটপৌরে লালিত্য। কোনও কোনও গল্পে সাধারণ শব্দ ব্যবহার করে পরিবেশ ও চরিত্রের একটি অন্তরঙ্গ পরিচয় উদ্ধার করেছেন। শোষক ও শাসকের মধ্যে বর্তমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবধানটি সাধারণ বাক্য ব্যবহারে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছেন। বর্ণনাতে পারিপাট্য আছে, সহজ স্বাভাবিক সাবলীল তার প্রকাশ ভঙ্গি। বর্ণনায় পরিমিতিবোধ, বাক্য ব্যবহারে সংযম, ভাষা ও গতি রক্ষিত হয়েছে। আবদুর রউফ চৌধুরীর ভাষা ঋজু, স্বচ্ছন্দ, গতিময় হওয়ার পিছনে আছে তিন শ্রেণীর ভৌগোলিক পটভূমি—সিলেটের গ্রামঞ্চল, করাচি ও বিলাত। ভাষা দিয়ে গদ্যরীতিরও পরিক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। তাঁর সৃজনশীল ভাষা ব্যবহারে একদিকে আছে ঔজ্জ্বল্য, প্রখরতার দীপ্তি, অন্যদিকে স্বাভাবিক স্নিগ্ধপ্রলেপ। আবদুর রউফ চৌধুরী মোটামুটিভাবে বাঙালি সমাজে ব্যবহৃত

দেশজ ও আঞ্চলিক আবহ নির্মাণে সিলেট অঞ্চলের কথ্যভাষা ব্যবহার করেছেন। 'জিন', 'উপোসী', পিতা' গল্পে যে বাক্যালাপ হয় লেখক তা আঞ্চলিক ভাষাতেই প্রকাশ করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় :

১. 'গেছি তো ভালাই করছি। তুমি অত ভাবীর কথায় নাচ কিয়র লাগি কওছান হুনি?' [জিন]।

২. 'সেন্ডেল আত নিলেঐ অইত।'/ 'ডর লাগতাছে।'/ 'আয় অখন উঠি। বাপ ঠাকুরদা'র ভিটর সন্ধান তো করন লাগব।' [পিতা]।

৩. 'কিতা চাও তরমুজ?' / 'গরিবর আর কিতা চাইবার আছে।' / 'ধার-টার চাউ না কিতা?' / 'ধার কেটাই-বা দিব।' [উপোসী]।

অন্য গল্পগুলোতে বাক্যালাপ হয় শুদ্ধ চলিত বাংলায়। আবদুর রউফ চৌধুরী নিজেকে অসাম্প্রদায়িক সাম্যবাদী লেখক হিশেবেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বাংলা শব্দ চয়নে তাই বাঙালির প্রতিদিনকার ব্যবহারিক শব্দ, তাঁর গল্প রচনায়, প্রধানত অবলম্বন করেছেন; তবুও কিছু মুসলমানি শব্দ অনিবার্যভাবেই এসেছে, এতে ঘটনা, চরিত্র এবং পটভূমির একটি স্বাভাবিক গতি সঞ্চরিত হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ্য :

যৌনস্বাদ উপভোগ করার জন্য একজন পুরুষ পাবে সত্তরজন হুরী, তাহলে একজন বেহেশতি নারী কতজন তাগড়া মরদ পাবেন তার যৌনকামনা চরিতার্থ করার জন্যে? [সৃষ্টিতত্ত্ব]।

শব্দের প্রয়োগে উপমা ব্যবহারের ক্ষেত্রে অসামান্য দক্ষতা দেখিয়েছেন আবদুর রউফ চৌধুরী। কয়েকটি উদাহরণ :

১. তার বাহুলগ্ন প্রেম-অপরিবর্তন হরিণাক্ষী একটি নারী, সে এক শিশুর স্নিগ্ধপ্রজ্ঞাসম্পন্না জননী, যার অপরূপ সৌন্দর্য যেন পঞ্চমহাভূত প্রকৃতির গর্ভজাত সৃষ্টি, জ্যোতিষ্কমণ্ডলের প্রথম সূর্যের স্বতঃস্ফূর্ত শিশিরসিক্ত আলো, তৃষিত পৃথিবীর একপশলা বারিসিক্ত বৃষ্টি, রাত শেষে উদিত নক্ষত্রকুলের সুন্দরতম ধ্রুবতারা, ঊষালগ্নের স্থির উজ্জ্বল জ্যোতির দ্যোতিত, শাশ্বত অন্তবিরামহীন পূর্ণিমার চাঁদ, অপরূপ ও সৌন্দর্য সুষমামণ্ডিত একটি মূর্তি, তবে ভীতু মূর্তপ্রতীক যেন। [রানী]।

২. আমেনার দেহখানা যেন আখনপাতার মতো বিধ্বস্ত।/ [...[যেন তেলসিক্ত লাল মরিচ—শয়তানের ত্রিশূল; [...]। [জিন]।

৩. খরায় চৌচির হয়ে যাওয়া মৃতপ্রায় ফসলক্ষেতে যদি অনর্গল বৃষ্টিপাতে প্রাণ ফিরে পায় তাহলে চাষীর মনে যেরকম আনন্দ সৃষ্টি হয় সেরকম

অবস্থাই তার। [উপোসী]।

৪. বৌদির গাল-দুটো ফাগমাখা হয়ে উঠল, যেন অমাবস্যা পা পিছলে আগ্নেয়গিরির মধ্যে গিয়ে পড়েছে। [...] তারপর বৌদি কিছুক্ষণ অসমাপ্ত কবিতার হিজিবিজি অক্ষরে কলম থেমে থাকার মতো ভঙ্গিতে বসে রইল। [স্নান]।

৫. ক্লাইভের খঞ্জর তারা উত্তরাধিকারের সূত্রে পেয়েছে বলেই হয়তো এমন করছে! [অপেক্ষা]।

৬. এই কান্না যেন অপরাজিতের গায়ে প্রজাপতি উড়ে বেড়ানোর মতো ঝিলিক দিয়ে বরফগলা নদীর মতো গড়িয়ে পড়তে চাচ্ছে তার গাল বেয়ে। [পিতা]।

৭. মেঘযুক্ত আকাশের মতোই আবছা, স্যাঁতস্যাঁতে একটি নিঃসঙ্গভাব বাড়ির দেওয়ালে নকশি কাটে। [নেশা]।

৮. নিঃসঙ্গ প্রদীপের মতো নিস্তব্ধে দাঁড়িয়ে আছে, [...]। [আত্মব্রত]।

৯. চাউনি যেন অপহৃত গৃহস্থের গৃহের মতো শূন্য, তবে এলোমেলো; [...]।/ [...] তার যন্ত্রণাময় জীবন যেন এক কাঁটাওয়ালা বিষাক্ত ফুল, পৃথিবীর পরিত্যক্ত বস্তু। [নীলা]।

এরকম সাধারণ উপমা-নির্মাণে তিনি জীবনের অম্লমধুর চিত্রই উন্মোচন করেছেন। তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তা তাঁর নিজস্ব নির্মিতি। তাঁর প্রতীক ব্যবহারও দৃষ্টিগ্রাহ্য ও সৌন্দর্যসৃষ্টিতে সফলতা অর্জন করেছে। প্রতীক ব্যবহারের কয়েকটি উদাহরণ :

১. [...] বিক্ষুব্ধপ্রকৃতির প্রতিশোধাত্মকরোষের একটি চিহ্ন—প্রকৃতির বিরুদ্ধে প্রতারণা ও ছলনামূলক সর্বগ্রাসী কংক্রিটের তৈরি ***রেলস্টেশন***টি। [রানী]।

৩. [...] ছোট টেবিলে সযত্নে রাখা বেশখানিক দুধ পড়ে থাকা ***বোতল***টি নিঃশব্দে তরমুজের কর্মকাণ্ড দেখছে। [উপোসী]।

৪. ভদ্রলোকটি ধীরস্থির পায়ে একটি ***মেশিনে***র দিকে এগিয়ে গেলেন, ওর গায়ে লেখা আছে—'ব্রিলক্রিম। আমাকে ব্যবহার কর।' [স্নান]।

৫. যে-***রাস্তা*** তাঁর বাসা থেকে বেরিয়ে মূলসড়কে গিয়ে মিলেছে তার খালবাকল উঠে গেছে। [সৃষ্টিতত্ত্ব]।

৬. ***রেলগাড়ি*** ছুটে চলেছে [...] নানারকম গাছগাছালি, ভাঙা ঘরবাড়ি,

ফসলের ক্ষেত-মাঠ পিছনে ফেলে। [অপেক্ষা]।

৭. [...] নদীর চরে, দুপুরের আকাশে, যে লুব্ধ ***গৃধ্রের দল*** অধীর আগ্রহে উড়ছিল [...]। [পিতা]।

৮. [...] ***টেপ*** দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা করে জল গড়াচ্ছে। [নেশা]।

৯. হাজী মজনু তার দৃষ্টি সরিয়ে স্থাপন করলেন বেঞ্চের পায়ে জড়িয়ে থাকা একটি জং-ধরা পুরোনো টিনের ***কৌটো***র ওপর; সমস্ত পৃথিবীর সমস্ত জঞ্জালই যেন এর মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে। [আত্মব্রত]।

১০. ***অন্ধকার*** হচ্ছে মহাসত্যের সোপান, শৃঙ্গের অবারিত প্রহরীমুক্ত দ্বার। [নীলা]।

আবদুর রউফ চৌধুরীর গল্পে জীবনদর্শন আছে, আছে মননশীল চিন্তার অবকাশ, তবুও তিনি পাঠকের কাছ থেকে দূরে অবস্থান করে দার্শনিক হতে চাননি। তিনি জীবনের রূপকার। জীবনের রহস্য, সমস্যা, দ্বন্দ্বকে চিত্রিত করেছেন মানবতাকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছে। তিনি মানুষের চেতন ও অবচেতন মনের গভীরে অবগাহন করেছেন। এই রহস্য সৃষ্টিতে তিনি যে ধারাক্রম নির্মাণ করেছেন তা একটি বিশ্বস্ত ভুবন রচনার সহায়ক হয়েছে। সম্ভাব্য ঘটনা এবং বিশ্বস্ত চরিত্রায়নের মধ্যে এসেছে এই সফলতা। তাঁর সৃষ্ট গল্পের আবহে আছে একধরনের প্রখরদীপ্তি, যার সমন্বয়ে নির্মিত হয়েছে তীক্ষ্ণ, জীবনঘনিষ্ঠ ও অর্থগাঢ় তাঁর এই আলেখ্যরাজি।

ড. মুকিদ চৌধুরী

লণ্ডন।